ওঁ

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা।

শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী।

কলিকাতা,

৪৭ নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার হইতে

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৮৩৩।

 [মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

ওঁ হরিঃ।

শ্রীশ্রীশ্রীসনকাদিপ্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীশ্রীনিম্বার্কাখ্য-ঋষিকুলধুরন্ধর

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীস্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী

ব্রজবিদেহী মহান্ত মহারাজের

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীচরণকমলে ভক্তি ও প্রীতি-পূর্ব্বক

প্রণত শিষ্য শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী

কর্ত্তৃক

এই গ্রন্থ অর্পিত হইল।

শ্রীশ্রীশ্রীগুরুদেব! ক্ষুদ্র বালক যেমন মাতৃক্রোড়ে নিঃশঙ্কিত-চিত্তে উপবিষ্ট হইয়া, অনন্ত আকাশে প্রদীপ্ত পূর্ণচন্দ্রের শোভা-দর্শনে বিমুগ্ধ হয়, এবং তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, হস্তপ্রসারণ করে, তদ্রূপ কলিকলুষদুষ্ট মন্দমতি আমিও তোমার কৃপায় 'ঋষি'-সমাজের ক্রোড়ে ব্যবস্থাপিত হইয়া, ব্রহ্মনামমাহাত্ম্য এবং ব্রহ্মবিদিগের যশোগুণগাথাশ্রবণে পুলকিতকলেবর হইয়া, তাহা প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হই; তোমারই

নাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এই গ্রন্থরচনায় বলপ্রাপ্ত হই, এবং তোমারই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তোমারই প্রেরণায় এই গ্রন্থ সমাপন করিয়াছি। এক্ষণে প্রীতিপূর্ব্বক তোমার শ্রীচরণে উপহারস্বরূপ ইহা সমর্পণ করিতেছি। তুমি ইহা গ্রহণ করিলেই, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব। বালকের অর্থশূন্য অস্ফুট বাক্যাবলিও যেমন পিতামাতার আনন্দ-বর্দ্ধন করে, তদ্রূপ ব্রহ্মমহিমাবর্ণনে এবং ব্রহ্মর্ষিগুণগানে অসমর্থ এই বালকের বালচেষ্টিত যদি কিঞ্চিৎপরিমাণেও তোমার আনন্দ উৎপাদন করে, তবে তাহার আনন্দের আর সীমা থাকিবে না। বাহ্য দৃষ্টিতে যদিও সম্প্রতি তোমার স্থূলদেহসম্বন্ধ রহিত হইয়াছে, তথাপি তুমি সনাতন ব্রহ্মর্ষি; দেহধারণ ও অন্তর্দ্ধান তোমার লীলামাত্র। অদ্যাপি তুমি পূর্ব্ববৎ আমার সম্বন্ধে নিকটে অবস্থিত বলিয়া, আমি নিশ্চিতরূপে জানিতেছি; অতএব তোমার এই বালকের প্রীতি-উপহার গ্রহণ করিয়া, তাহাকে চরিতার্থ কর।

ওঁ হরিঃ ওঁ তৎসৎ ।

নিবেদন।

"প্রুফ" দেখা বিষয়ে আমার অনভিজ্ঞতা ও সময়াভাববশতঃ, আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রোফেসার কুঞ্জলাল নাগ এম. এ. মহাশয় সময় সময় এই বিষয়ে আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন; তন্নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি। মেট্‌কাফ্ প্রেসের অধ্যক্ষ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়া, "প্রুফ" গুলি প্রায় সমস্তই সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তন্নিমিত্ত তিনিও আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। পরন্তু আমাদের বহু চেষ্টায়ও মুদ্রাঙ্কন-বিষয়ে অশুদ্ধি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। তন্নিমিত্ত সহৃদয় পাঠকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বিচক্ষণ পাঠক গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনিই তৎসমস্ত সংশোধন করিয়া লইবেন। পরন্তু ৫৯ পৃষ্ঠায় ২১শ পঙ্‌ক্তির "দেশীয় লোক তাহা লাভ করিতে পারেন নাই।" ইহার পরে—"জ্যোতির্মণ্ডলের পরিদর্শনের নিমিত্ত ৺কাশীধামে যে মানমন্দিরটি বর্ত্তমান আছে, তাহা যদিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্ম্মিত হইয়াছে, তথাপি ইহাদ্বারা উত্তমরূপে প্রমাণিত হয় যে, জ্যোতির্মণ্ডল অবলোকনের জন্য যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেও ভারতবাসী অনভিজ্ঞ ছিলেন না।" এই কয়েক পঙ্‌ক্তি যোগ করিয়া পাঠ করিবেন।

শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা।

ভূমিকা।

১। মঙ্গলাচরণ।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ হরয়ে নমঃ॥
ওঁ নমোঽস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়ত-পত্র-নেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥

প্রথমে শ্রীগুরুচরণে আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রণত হইতেছি, এবং তৎসহ পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীসনকাদি ঋষি, মহামুনি নারদ, সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক চক্রাবতার শ্রীভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্য, এবং 'দ্বারা'-প্রবর্ত্তক অবধূতবর শ্রীমন্ নাগাজি মহারাজের শ্রীশ্রীচরণকমল স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণতি করিতেছি। অতঃপর

পরমাত্মা শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়া দেবতা ঋষি গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ মানব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, পণ্ডিত অপণ্ডিত পাপী পুণ্যাত্মা, স্থাবর জঙ্গমাদি তাঁহার সর্ব্ববিধ বিভূতির সহিত তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে প্রণিপাত করিতেছি। সকলে এই অধীন জনের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ব্রহ্মর্ষিদিগের গুণগান এবং ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণনা করিব মনস্থ করিয়াছি। একে ঘোর বিষয়ী, তাহাতে আমি বিদ্যাহীন—সাধারণ পাণ্ডিত্যও আমার নাই—,তথাপি কেন যে এই কার্য্যে আমার মতি স্বভাবতঃ ধাবিত হইয়াছে, তাহার রহস্য সর্ব্বদর্শী শ্রীগুরুদেবই অবগত আছেন। তবে আমি জানি যে শ্রীগুরু গোবিন্দ প্রসন্ন হইলে কোন কার্য্যই কাহারও পক্ষে অসম্ভব হয় না, পঙ্গু ব্যক্তিও গিরিলঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়। অতএব ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীগুরুগোবিন্দপদ স্মরণ করিয়া এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

শ্রীভগবৎপ্রসন্নতা লাভ হইলে যে অসম্ভব কার্য্যও সম্ভব হয়, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। পরন্তু সর্ব্বঘটেই পরমাত্মা বিরাজিত আছেন, জগৎই তাঁহার বিভূতি; অতএব সাধু অসাধু ধনী দরিদ্র পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলের চরণে আমি প্রণত হইয়া বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, আমি মঙ্গলময় ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মর্ষিগুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিয়াছি, আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে আমার অভিপ্রায় পূর্ণ হয়। আপনাদের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলে অবশ্যই আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। আর বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধুগণ! আপনাদের সামর্থ্যের ত অন্তই নাই; জগৎপতি জগৎকর্ত্তা শ্রীভগবান্‌ও আপনাদের বাসনা পূর্ণ করিতে নিজে সর্ব্বদা

ব্যস্ত আছেন বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব আপনাদের চরণে আমি বারবার প্রণিপাত করিতেছি; আপনারা প্রসন্ন হইয়া এই দীনজনকে এই বর প্রদান করুন যে গ্রন্থরচনা বিষয়ে তাহার অভীষ্টপূরণ হয়, এবং এই গ্রন্থ অভীপ্সিত ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়।

অতঃপর শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের চরণে প্রণতিপূর্ব্বক, তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। কলিপ্রভাবদুষ্ট জীবের নিমিত্ত যিনি অভাবনীয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সর্ব্ববিধ জীবের উপযোগী ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, যাঁহার বাক্যামৃত এযাবৎ ভারতভূমিতে সর্ব্বসাধারণ জনগণের জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতেছে, সেই পরমকারুণিক ভগবান্ বেদব্যাস আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া যেন আমি অভীপ্সিত সাধন করিতে সমর্থ হই

ইতি মঙ্গলাচরণম্।

ওঁ তৎসৎ ॥

ওঁ হরিঃ।

২। শুভসংবাদ ও গ্রন্থের স্থাননির্দ্দেশ।

১৮০৩ শকাব্দে আমার নিকট এই সত্য প্রকাশিত হয় যে ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা পুনরায় প্রকটিত হইয়া পৃথিবীতলস্থ সমগ্র মানব-জাতিকে উদ্দীপিত করিবে, এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ পুনরায় এই ভারতভূমিতে দর্শনযোগ্য হইবেন। তৎকালে উচ্চসাধন-সম্পন্ন আমার জনৈক বন্ধুর নিকট এই কথা আমি প্রকাশ করিলে, তিনি তৎ-শ্রবণে অতিশয় প্রফুল্লচিত্ত হইয়া আমাকে বলিলেন যে তিনিও কোন সাধু মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়াছেন; পরন্তু তিনি আরও বলিলেন যে তিনি এইরূপও শ্রবণ করিয়াছেন যে সেই শুভদিন প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দীর্ঘকালব্যাপী মহামারীপ্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া ভারতবাসীকে প্রপীড়িত করিবে এবং তদ্দ্বারা ভারতভূমির পাপমালিন্য অনেক পরিমাণে বিদুরিত হইয়া যাইবে। বিগত দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ ভারতবর্ষ অদৃষ্টপূর্ব্ব মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প,অনাবৃষ্টি,অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অবিচ্ছেদে খিন্ন হইয়া আমার নিকট আমার বন্ধুর উক্ত বাক্যের সম্পূর্ণ সত্যতাই প্রমাণিত করিতেছে। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে যে এই শোধনকার্য্য শেষ হইবার আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। আমি সাধুমুখে শুনিয়াছি যে ইহার আর অল্প কয়েক বৎসর মাত্র অবশিষ্ট আছে; অতঃপর জগতের পক্ষে মঙ্গলময় দিন উপস্থিত হইবে।

ভারতবাসিগণ জানিবেন যে পাশ্চাত্যপ্রদেশবাসী যে এই দেশে আগমন করিয়াছেন, তাহা একটী আকস্মিক ঘটনা নহে। আমি ঋষিমুখে

শ্রবণ করিয়াছি যে, জনকনন্দিনী যখন অপহৃতা হইয়া লঙ্কাধিপতি-কর্ত্তৃক অশোককাননে স্থাপিতা হইয়াছিলেন, তখন রাজকুটুম্বিনী ত্রিজটা তাঁহার অতিশয় যত্ন ও সেবা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্না করেন। পরে লঙ্কাদ্বীপে শ্রীরামচন্দ্রের অভ্যুদয় হইলে জনসমাজের সৌভাগ্য-বিধায়িনী জনকনন্দিনী ত্রিজটাকে কলিযুগে ভারতবর্ষের আধিপত্য-লাভের বর প্রদান করেন; এবং সেইবরপ্রভাবে ইংরাজগণ এই দেশের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের এতদ্দেশে আগমনের দ্বারা জগতের কল্যাণই সাধিত হইয়াছে ও হইবে। (১)সমদর্শনই যাঁহা-

(১) ইংরাজের আগমনে ভারতবর্ষের অকল্যাণ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ এক্ষণে মনে করিতেছেন সত্য; কিন্তু নিবিষ্ট হইয়া যাঁহারা চিন্তা করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রবলপরাক্রমশালী বিদেশীয় রাজ এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সমভাবে শাসনাধীন হইয়া পরস্পরের প্রতি বৈর পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং প্রবল শাসনবলে সাধারণ জীবনযাত্রা শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়াতে, এক্ষণে একত্রিতভাবে সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সাধারণ বিষয়ে লোকের চিন্তাস্রোত প্রবর্ত্তিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ অপরাপর অনেক উপকারও হইয়াছে। বিদেশীয় ইতিহাসপাঠে ভারতবাসীর চিত্ত প্রসারিত হইয়াছে; বিদেশীয়বিজ্ঞানপাঠে ভারতবাসী পুনরায় জগত্তত্ত্ব আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং বিদেশ-বাসীদিগের স্বজাতিনিষ্ঠাদর্শনে ভারতবাসী পুনরায় জাতীয়ভাবে সম্মিলিত হইতে প্রয়াস করিতেছেন। পাশ্চাত্য "থিয়সফিষ্ট" সম্প্রদায়ের এবং ম্যাক্স্ মুলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রযত্নে ভারতবাসীর প্রাচীন জ্ঞানগৌরব স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াছে; এবং অনেক শিক্ষিত লোকের হৃদয় আর্য্য নামে উচ্ছ্বসিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পরন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ এবং উপকারসাধক বস্তু ইহ জগতে কিছুই নাই। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বিদেশীয় রাজ প্রবর্ত্তিত হওয়াতে এতদ্দেশে অনেক বিষয়ে দুঃখেরও কারণ উপজাত হইয়াছে; কিন্তু কেবল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অপর মহান্ উপকারের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা উচিত নহে।

দের ভূষণ, সেই ঋষিগণ, এতদ্দেশে ইংরাজের আগমন উপলক্ষ করিয়া, পৃথিবীস্থ সমগ্র মানবজাতিতেই ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ বপন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভারতবাসিগণ আপনারা চক্ষু প্রসারিত করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এক্ষণই জানিতে পারিবেন যে এই বাক্য একান্ত অলীক বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ইয়োরোপ অঞ্চলে দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে বেদান্তচর্চ্চা বিষয়ে যে প্রবল আগ্রহ অধুনা উপস্থিত হইয়াছে,তাহা এই বাক্যের সত্যতার একটি বিশেষ প্রমাণ। আমেরিকা খণ্ডে ভারতবর্ষীয় জ্ঞানালোচনার যেরূপ প্রভা সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও এই বাক্যেরই যথার্থতার পরিচয় দিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের পূজ্যপাদ পরমহংস দেবের একজন বিখ্যাত শিষ্য ৺বিবেকানন্দ, আমেরিকায় গমনপূর্ব্বক পৃথিবীর সমগ্র ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিনিধিগণের সভায় উপস্থিত হইয়া, কিঞ্চিন্মাত্র বেদান্তবাক্যাভাস প্রচার করিয়া সভ্যমণ্ডলীকে যেরূপ চমৎকৃত করিয়াছিলেন, তাহাও এই বাক্যের সত্যতার একটী বলবৎ প্রমাণ। বাস্তবিক আমরা জানি ভারতবর্ষে বিবেকানন্দ অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক শক্তিশালী সাধক অদ্যাপি অনেক স্থলে দৃষ্ট হইতেছেন। বিবেকানন্দ তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় সামান্য বালকমাত্র। কিন্তু বালক হইলেও তিনি সিংহশাবক; সুতরাং অপরে তাঁহারও বলের যে সমকক্ষ হইতে পারে নাই, ইহা বিচিত্র নহে। অতএব সেই নরসিংহগণ যথার্থই আপনাদিগকে প্রকটিত করিলে যে পৃথিবীমণ্ডলস্থ সম্যক্ মানবজাতির ভাবান্তর উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কি কারণ হইতে পারে?

কিন্তু ঋষিগণ যে প্রকটিত হইবেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? এক্ষণে কলিকাল প্রবর্ত্তিত, অধর্ম্মেই লোকের স্বাভাবিক মতি; তাহাতে এই কালে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ হইবে এবং ব্রহ্মবাদী

ঋষিগণ আপনাদিগকে প্রকটিত করিবেন—ইহা কিরূপে আশা করা যাইতে পারে? এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতঃ লোকের মনে উদয় হইতে পারে,সন্দেহ নাই। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে এই কলিকালেও এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে। যে কালে তমোগুণ অভ্যুদয়সম্পন্ন হয়, তাহাকেই কলিকাল বলা যায়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ কোন কালে বর্ত্তমান থাকে না; সত্ত্ব এবং রজোগুণ কলিকালেও তমোগুণের সহিত বিমিশ্রিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে যেমন মূল দশা যে গ্রহের থাকে, তদ্ভিন্ন অপর গ্রহেরও ভোগ অল্প অল্প কালের নিমিত্ত ঐ মূল দশার মধ্যেই হইয়া থাকে, তদ্রূপ তমঃপ্রধান কলিকালেও মধ্যে মধ্যে অল্প কালের নিমিত্ত সত্ত্বগুণপ্রধান সত্যযুগের এবং রজোগুণান্বিত ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেরও ভোগ হইয়া থাকে। সত্যপ্রভৃতি যুগেও এইরূপ কোন কোন সময়ে কলিস্বভাব হিরণ্যকশিপুপ্রভৃতি দৈত্যগণ প্রবল হইয়া সত্যাদিযুগের ভোগকাল খর্ব্ব করিয়াছিল।

পৌরাণিকগণ বলিয়া থাকেন যে সত্যের অবধারিত রাজ্যভোগ-কাল অতীত হইয়া ত্রেতার ভোগকাল উপস্থিত হইলে, শ্রীভগবানের নিকট সত্য আপত্তি করিলেন যে তাঁহার ভোগকালের অনেকাংশে কলিস্বভাব অসুরগণই রাজ্যবিস্তার করিয়াছে, সুতরাং তৎকালে সত্য আপনার স্বাভাবিক ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন; অতএব ত্রেতার ভোগারম্ভকাল আরও বিলম্বে প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। তাহাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন যে সত্যের ভোগকাল যে পরিমাণে অসুরগণ কর্ত্তৃক খর্ব্ব করা হইয়াছে, সেইপরিমাণ কালের ভোগ কলিকালের মধ্যে সত্য প্রাপ্ত হইবেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে এই বিধান তিনি স্বয়ংই করিয়াছেন, কারণ কলিকালে জীবের কষ্ট

ও অজ্ঞানতা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; তখন মধ্যে মধ্যে সত্যের ভোগ না দিলে কলির জীবের কষ্ট একেবারে অসহনীয় হইয়া পড়িবে। সেই নিমিত্ত তিনিই সত্যের মধ্যে কখন কখন কলির ভোগ দিয়া, কলির মধ্যে কখন কখন সত্যের ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের কলিকালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও এই বাক্যের সত্যতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অভিমন্যুপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ এবং তৎপুত্র জনমেজয়ের রাজ্যাবসানে কলিস্রোত পৃথিবীমণ্ডলে অতিশয় বেগের সহিত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া জনসমাজকে একেবারে অধর্ম্মপঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে; এবং বৈদিক কর্ম্মানুশীলন কেবল বাহ্য আড়ম্বরে পরিণত হয়। তৎকালে শ্রীভগবান্ শাক্যসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া কালোপযোগী ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পৃথিবীমণ্ডলে পুনরায় শান্তি স্থাপন করেন। কিছু দিনের জন্য পুনরায় ভারতের গৃহে গৃহে আনন্দধ্বনি উত্থিত হয়, এবং ভারতের জ্ঞানালোক পুনরায় সর্ব্বত্রব্যাপী হইয়া জনসমাজকে আনন্দিত করে। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে পুনরায় কলিপ্রবাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে নাস্তিক সর্ব্বশূন্যবাদ এবং বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতিতে পরিণত করিয়া বেদান্তচর্চ্চার প্রায় লোপসাধন করে এবং জীবের ধর্ম্মবুদ্ধিকে মলিন করিয়া ফেলে; এবং জনসমাজ হইতে পুনরায় কষ্টের হাহাকারধ্বনি উত্থিত হয়। এই রূপে কিছুকাল গত হইলে যখন জীবের কষ্ট ও অজ্ঞানতা অতিশয়বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ভারতভূমিতে পুনরায় শঙ্করাংশে শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হয়েন, এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার বিচারশক্তিপ্রভাব ও যশোরাশি বিস্তৃত হইয়া নাস্তিক বৌদ্ধ মতকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করে। * (১)

* (১) অপরাপর স্থলেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রশক্তিধারী পুরুষসকল তৎপূর্ব্বে

কিন্তু কালের গতিতে শাঙ্করিক মত ও অবশেষে শুষ্ক তার্কিকতা-মাত্রে পরিণত হয়, এবং কালশক্তি পুনরায় অতিপ্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, জীবের ধর্ম্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, দেশান্তর-বাসিগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া আধিপত্য সংস্থাপন করেন, এবং ভারতবর্ষীয় জীবের কষ্টধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূরিত হয়। তৎকালে শ্রীগৌরাঙ্গদেব এবং গুরুনানক নাভাজি প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবিশেষে অবতীর্ণ হইয়া এই অবস্থার মধ্যেও জন-সমাজে কতক পরিমাণে শান্তি ও নির্ম্মল জ্ঞান পুনরায় ব্যবস্থাপিত করেন। কিন্তু প্রবল কলিপ্রবাহে তাঁহাদের উপদেশসকল ও অন্তঃ-সারশূন্য হইয়া এক্ষণে অনেক স্থলে নানাপ্রকার অসার মতামত-বিচার এবং অভিনয়মাত্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় জীব কষ্টের ও অধর্ম্মের একশেষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ভারত-ভূমি এক্ষণে স্বজনদ্রোহী, পরপীড়ক, পরনিন্দক, ব্যভিচারী, হীনমতি, কপটাচারী জনগণের আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছেন। গো-জাতিকে দেবতাস্বরূপ দর্শন করা উচিত বলাতে যে হিন্দুজাতি তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের গৌরব করিয়া থাকেন, সেই হিন্দুজাতীয় লোকসকলই গোজাতির উপর অনেক স্থলে যেরূপ ভীষণ অত্যাচার ব্যাপার সর্ব্বজনসমক্ষে প্রতিদিন সংঘটিত করিয়া থাকেন, পৃথিবীতে অপর কোন জাতীয় লোক এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন কিনা সন্দেহ। এই কলিকাতা নগরীতেই শকটবাহী বৃষভদিগের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় যে অনাহারে থাকিয়া অবিশ্রান্ত তোত্র-তাড়নাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই বুঝি বিধাতা ইহাদিগকে ভারত-

---

ও পরে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষরূপ বর্ণনা করা এই গ্রন্থের অভিপ্রেত নহে। পরন্তু সর্ব্বত্রই নিয়ম একই জানিতে হইবে।

ভূমিতে জন্ম দান করিয়াছিলেন। এই একটি সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারাই ভারতবাসীর অন্তঃকরণের হীনতা এবং ধর্ম্মদ্রোহ বর্ত্তমানকালে কি পরিমাণে হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বস্তুতঃই ভারতবর্ষ এক্ষণে অজ্ঞানতা ও কষ্টের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে লোকসকল যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে বস্তুতঃই বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি যেরূপ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও অধিক শক্তি প্রকাশ করিতে অভিলাষযুক্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব ভিন্ন যে জীবের আভ্যন্তরিক মলিনতা দূর হইতে পারিবে, তদ্রূপ আশা করা যায় না। এবং এই মলিনতা দূর না হইলে হিন্দুজাতির পৃথিবীতে আর অধিক কাল অবস্থিতিও সম্ভবপর নহে; কারণ হিন্দুজাতির প্রকৃতিগত গুণ ধর্ম্মনিষ্ঠতা; * (১) তাহা বিনষ্ট হইলে এই জাতির পৃথক্ রূপে অস্তিত্বের বিলোপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এইরূপ ঘটনা সম্ভবপর নহে। হিন্দুজাতি বিলুপ্ত হইলে এই পৃথিবীমণ্ডলে বিধাতার একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনাকৌশল বিলুপ্ত হইয়া যায়। অপর সকল বিষয়ে হীন হইয়া পড়িলেও ভারতবর্ষে হিন্দুজাতিতে সর্ব্ববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবিদ্যা অদ্যাপি কোন কোন স্থলে এত অধিক পরিমাণে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া আছে, যে তাহার উপমা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুজাতির বিনাশে এতৎ সমস্তই পৃথিবী হইতে লোপ প্রাপ্ত হইবে; ইহা বিধাতার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

এই দিকে ভারতবর্ষের অবস্থা এইরূপ। অপর দিকে পাশ্চাত্য-প্রদেশবাসিগণের মধ্যে যেরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনার বৃদ্ধি হইয়াছে,

* (১) এতৎসম্বন্ধে মূলগ্রন্থপ্রারম্ভে বিশেষ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

তাহাতে তত্তৎ-দেশ-প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেশসকল আর তাঁহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে না; ধর্ম্মবিপ্লব সর্ব্বত্রই উপস্থিত। অতএব ভারতবর্ষীয় সনাতন ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার ভিন্ন এক্ষণে জীবের জ্ঞানতৃষ্ণানিবৃত্তির ও শান্তিলাভের কোন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু সাধারণতঃ ভারতীয় দেহই আদিকালহইতে এই বিদ্যা সম্যক্ ধারণ করিতে সমর্থ; এবং বিধাতার কৌশলে বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষেই পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের বিশেষ সম্মিলনও সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতে পাশ্চাত্য শাসন উপলক্ষ করিয়াই সমদর্শী ঋষিগণ ভারতবাসীকে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিবেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা পাশ্চাত্য ও অপরদেশবাসী জনগণকে ব্রহ্ম-বিদ্যায় দীক্ষিত করিবেন। সেই শুভ সময় উপস্থিত হইতে আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। অতএব ভারতবাসিগণ পরস্পরের প্রতি এবং পাশ্চাত্য জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবশূন্য হইয়া, অসূয়াবিহীন নির্ম্মল অন্তঃকরণে সেই শুভ অভ্যুদয়কালের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে থাকুন; ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের নিমিত্ত সংযম অবলম্বন করিতে অভ্যাস-শীল হউন। ভারতের কল্যাণবিধানের নিমিত্ত যে সনাতন আদি ঋষি বদরিকাশ্রমে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি শীঘ্র আপনাকে প্রকটিত করিয়া জগতের দুঃখ ও অজ্ঞানরাশি বিদূরিত করিবেন।

বণিক্ মহাজন বহুমূল্য পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া কোনও দেশে আগমন করিতে ইচ্ছুক হইলে, যেমন প্রথমে তাঁহার আগমন-সংবাদ ঘোষণা করতঃ জনসমাজকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত চর প্রেরণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার চরসকল যেমন দুন্দুভিনিনাদে

তাঁহার শুভাগমন বার্ত্তা নগরের দ্বারে দ্বারে প্রকাশিত করে; আমিও সেই প্রকার এই গ্রন্থরূপ বাদ্য বাদন করিয়া ঋষিদিগের আগমন এবং তাঁহাদের অর্জ্জিত অমূল্যনিধি ব্রহ্মবিদ্যার সংবাদ জনসমাজে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মহাজনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না দেখিলে, যেমন কেবল চরগণের বাহ্য কাল্পনিক বর্ণনা-দ্বারা, মহাজনের নিকটে সযত্নে রক্ষিত মহামূল্য মণিমাণিক্যের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না, তদ্রূপ আমার এই গ্রন্থের অনেক পরিমাণে বাহ্য ব্যাখ্যা দ্বারাও সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। তবে ইহাদ্বারা যদি কেহ ঋষিদিগের গতি অনুসন্ধান করিতে উৎসাহিত হয়েন, এবং তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তবেই আমার এই প্রয়াস সফল হইয়াছে মনে করিব।

আর ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এই দেশ তাঁহাদের অধিকারে আসিয়াছে বলিয়া, তাঁহারা যেন গর্ব্বিত হইয়া ভারতবাসীকে ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি না করেন; এবং নিষ্কপটভাবে প্রজারঞ্জন হইতেই যে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহা যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হয়েন। বহুকাল পরাধীনতাতে থাকা হেতু এবং অপর নানাবিধ কারণে বর্ত্তমান ভারতবাসীর চরিত্রে এমন অমানুষিক দোষসকল পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা স্বভাবতঃই সঞ্জাত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি বিশেষ নিবিষ্ট হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, এই সকল দোষরাশির মধ্যেও, ভারতবাসীর আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন অসাধারণ সদ্গুণসকল বর্ত্তমান আছে যাহা অন্যত্র

সুদুর্লভ। যদি ইহা লক্ষ্য করিতে কেহ সমর্থ না হয়েন, তথাপি রাজপুরুষদিগের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে স্বার্থপর ও অহঙ্কৃত ব্যক্তি কাহারও শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারে না, এবং প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে না পারিলে প্রভূত রাজশ্রীও কখনই সুখোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, বরং অচিরকাল মধ্যে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম। আর বিশেষ কথা আমি এই বলিতেছি যে, ইংরাজজাতি ভারতবর্ষের অধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে, যেমন ইংলণ্ড এবং ন্যুনাধিক পরিমাণে সাধারণতঃ সকল পাশ্চাত্য প্রদেশই বহুল পরিমাণে বিষয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তদ্রূপ এই ভারতবর্ষে অবস্থানদ্বারা তাঁহাদের অধ্যাত্ম-জ্ঞানালোকও অচিরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং ভারতবাসীর প্রতি এতদ্দেশীয় রাজপুরুষদিগের সৌহার্দ্দ পোষণ করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কপটতা পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসীর প্রতি যথার্থ সুহৃদ্‌ভাব পোষণ করিতে শিক্ষা করিলে, অচিরে যে আনন্দের দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে বলিয়া আমরা শ্রবণ করিয়াছি, তাহার ফল রাজা ও প্রজা উভয়ে অক্ষুন্ন ভাবে দীর্ঘকাল ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং কেহ কাহারও দুঃখ-ভোগের হেতু হইবেন না।

ওঁ হরিঃ।

৩। গ্রন্থের প্রয়োজন ও বিষয়বর্ণনা।

ভারতভূমি এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবের ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদিগের সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি এক্ষণে ক্রমশঃ একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সহস্রসহস্র বর্ষব্যাপী বিপ্লবের পর ভারতীয় সমাজশৃঙ্খলার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা এক্ষণে সাংসারিক অভ্যুদয়সম্পন্ন বিদেশীয়দিগের সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষে একেবারে হীনপ্রভ ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রসূত রাজনৈতিক অশান্তিতে ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গ এক্ষণে কম্পিত হইতেছে। ভারতীয় যুবকগণ কর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং দিশা-হারা হইয়া কেহ কেহ আর্য্যধর্ম্ম ও রীতিনীতিকে একেবারে পদাঘাত-পূর্ব্বক বর্জ্জন করিয়া সর্ব্ববিষয়ে পাশ্চাত্যপ্রদেশানুকরণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন; কেহ বা পাশ্চাত্য জাতিসকলের ন্যায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত উন্মত্তপ্রায় হইয়া, দস্যুবৃত্তিদ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া দেশের উদ্ধার সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইতেছেন, এবং অবশেষে রাজপুরুষকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে-ছেন; কেহ বা সমাজধর্ম্ম এবং মনুষ্যত্ব বিষয়ে একেবারে চিন্তা-বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জানিয়া, বৈধ উপায়েই হউক অথবা অবৈধ উপায়েই হউক, কেবল আপনার সাংসারিক অভ্যুদয় সাধনে অহর্নিশি

যত্নবান্ হইয়াছেন; মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশ লোক চতুর্দ্দিকের বিপ্লবময় অবস্থা দৃষ্টে বুদ্ধিহারা হইয়া কোন প্রকারে নির্ব্বিঘ্নে গ্রাসাচ্ছাদনলাভ করিয়া কিরূপে আপন জীবিতকাল অতিবাহিত করিয়া যাইতে পারিবে সেই ভাবনায়ই দিবা রাত্রি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে।

এই অবস্থায় ভারতীয় যুবকবৃন্দের অন্তরে যথার্থ ধর্ম্মানুরাগবৃদ্ধি করা এবং প্রচীন আর্য্যদিগের উপদিষ্ট সনাতনধর্ম্মবিষয়ে তাহাদিগের চিন্তাস্রোতকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করাও এইগ্রন্থরচনার একটি উদ্দেশ্য। হিন্দুজাতির অভ্যুদয়সময়ে ধর্ম্মই ভারতবাসীর প্রাণস্বরূপ ছিল; ইহাদ্বারাই ভারতবাসী এক কালে পৃথিবী-মণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতাও এককালে প্রচুর পরিমাণে ছিল, সন্দেহ নাই; তাহা এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে প্রথমেই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসমস্তই তাঁহাদের ধর্ম্মোৎকর্ষের ফল-স্বরূপ ছিল; সাংসারিক সুখ ভারতবাসীর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়াতেই ভার-বাসীর অধঃপতন ঘটিয়াছে, সাংসারিক সুখও তাঁহাদের বিদূরিত হইয়াছে; এবং এই যে পরা-ধীনতা, যাহা ভারতীয় যুবকগণ এক্ষণে অসহনীয় বলিয়া বোধ করিতে-ছেন, তাহাও এই ধর্ম্মচ্যুতিরই ফল। আমি কোন যোগীশ্বর মহাপুরুষের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, পঞ্চ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যখন শত শত প্রধান ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের সমক্ষে পতিপ্রাণা অসহায়া অশৌচাবস্থাপ্রাপ্তা একবস্ত্রা দ্রৌপদী দুঃশাসনকর্ত্তৃক কেশাকর্ষিত হইয়া সবেগে কৌরবরাজসভায় আনীতা হইয়াছিলেন, যখন সমবেত ক্ষত্রিয়রাজন্যবর্গের সাক্ষাতেই কলিস্বভাব দুঃশাসন সেই কুলবতী

লক্ষ্মীস্বরূপা রাজকন্যাকে বিবস্ত্রা করিতে প্রয়াস করিয়াছিল, এবং তদবস্থায় পতিত হইয়া সেই ধর্ম্মপ্রাণা রাজনন্দিনী যখন ধর্ম্মেরই দোহাই দিয়া বারংবার কুরুসভায় বিচারপ্রার্থনা করাতেও কলি-স্বভাবপ্রাপ্ত সেই ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ তাঁহার বাক্যের উত্তর প্রদান করিলেন না, তখন সভাস্থলে উপস্থিত কোন কোন মহর্ষি এই আর্য্য-ভূমিতে ধর্ম্মের এবংবিধ অপলাপ দর্শনে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, ভারতীয় ক্ষত্রিয়কুলের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করেন যে ভারতীয় ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তি স্থানান্তরবাসী মানবগণের আশ্রয় গ্রহণ করুক। ইহার অব্যবহিত পরেই সেই অভিসম্পাতের ফলে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতীয় ক্ষত্রিয়কুল বিধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং অদ্যাবধি ভারতবর্ষে প্রাচীন সৌর ক্ষাত্র বীর্য্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ধর্ম্ম হইতে চ্যুতিই ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূলহেতু। কোন কোন পুরুষের অভ্যুদয় অধর্ম্মাচরণদ্বারাও বিনষ্ট হয় না, ইহা অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, সত্য; কিন্তু স্বভাবতঃ যে পুরুষ ধার্ম্মিক, অধর্ম্মাচরণ তাহার কখনই সহ্য হয় না। ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ মলিন, তাহাকে অপর মলিন বস্তু সহজে মলিন করিতে পারে না; কিন্তু স্বভাবতঃ যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ তিনি সহজেই অপবিত্রবস্তুসংসর্গে মলিন হইয়া পড়েন। ভারতবাসীর প্রকৃতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মানুকূল; বিধাতৃপুরুষের ভারতবাসীর প্রতি এইটী বিশেষ কৃপা। ঈশ্বরপ্রদত্ত এই বিশেষ কৃপার অসম্মান যতদিন ভারতবাসী করিবেন, ততদিন যে তিনি নিদারুণ বিধিনিগ্রহ প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? বিধাতৃপুরুষ যে আমাদিগকে স্বাধীনতা অর্পণ পূর্ব্বক অভ্যুদয়সম্পন্ন করিবেন,

তাহার উপযুক্ত ধর্ম্মপ্রাণতা ও নৈতিক উৎকর্ষ আমাদের এক্ষণে কোথায় আছে, তদ্বিষয়ে প্রথমে বিচার করা উচিত। ঘরে ঘরে আমাদের এক্ষণকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই জাতি যে কোন কালে কোন উচ্চকার্য্যের অধিকারী ছিল বা হইবে এইরূপ আপাততঃ মনে ধারণাই হয় না। অধিকাংশস্থলে দরিদ্রের প্রতি ধনীর এবং ধনীর প্রতি দরিদ্রের, প্রজার প্রতি ভূস্বামীর এবং ভূস্বামীর প্রতি প্রজার, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের এবং ভৃত্যের প্রতি প্রভুর—এবং সাধারণতঃ ক্ষমতাহীনের প্রতি ক্ষমতাশালীর এবং ক্ষমতা-শালীর প্রতি ক্ষমতাহীনের, যে ব্যবহার এইদেশে এক্ষণে দৃষ্ট হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ধর্ম্ম এইদেশে কোন কালে ছিলেন বলিয়া বোধ হয় কি? অপরদেশের অবস্থার সহিত তুলনা করিবার কথা আমি বলিতেছি না; তদ্বিষয়ে আমরা অধিকাংশ লোকই বিশেষ কিছু অবগত নহি। কিন্তু আমরা এই দেশের লোকের প্রকৃতি এক্ষণে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে তাহাদিগকে কি বিধাতৃ-পুরুষের বিচারে আমরা কোন প্রকার সুখ ও অভ্যুদয়সম্পন্ন হইবার যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারি? রাজনৈতিক স্বাধীনতা সকলেই বাঞ্ছা করে ইহা সত্য, এবং পরাধীনতা যে অশেষবিধ দুঃখের হেতু ইহাও সত্য। কিন্তু পরাধীনতা আমাদের কর্ম্মের ফলে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এবং আমরা এক্ষণে যেরূপ স্বার্থপর, পরস্পরবিদ্বেষী, এবং সঙ্কীর্ণহৃদয় ও কপটাচারী, তাহাতে স্বাধীনতা হঠাৎ পাইলেও যে আমরা তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিব তাহাও বিশ্বাস করা সুকঠিন। এক্ষণে যে জাতি আমাদের উপর রাজত্ব করিতেছে, তাহারা দুর্ব্বল নহে এবং আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তিবিষয়ে বাধা দিতে তাহারা সম্পূর্ণ সমর্থ ও ইচ্ছুক। এইরূপ

রাজ্য সহজে কেহ কখন পরিত্যাগ করে না। আমাদের মধ্যেই যদি কেহ কখন কোন বিষয়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন, তবে সেই ক্ষমতা ইচ্ছা-পূর্ব্বক কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে সচরাচর দেখা যায় কি? তবে বিদেশীয়গণ তাহাদের এই প্রভূত ক্ষমতা সহজে পরিত্যাগ করিবে ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? আমাদের চরিত্রের এমন আকর্ষণ নাই, যাহা দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইবে; আমাদের এমন কোন প্রকার বল নাই, যাহা দেখিয়া তাহারা ভীত হইবে। আমরা দুর্ব্বল ও ধর্ম্মচ্যুত হওয়াতে কেহ কাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র হইতে অনেকেই বাস্তবিক অযোগ্য; সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় একতা আমাদিগের মধ্যে অসম্ভব। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে পাশ্চাত্য প্রদেশে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার নাম শুনিয়া যেরূপ ধনী দরিদ্র সকল লোকই মাতিয়া উঠে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক তদ্রূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতার নামে মাতিয়া উঠে না। ভাল হউক অথবা মন্দ হউক, ইহাই আমাদের দেশের অবস্থা। অতএব রাজনৈতিক আন্দোলন যে প্রকারে এদেশে এক্ষণে চলিয়াছে, তাহাতে যে ইহা দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দৃষ্ট হইতেছে না। পক্ষান্তরে এই আন্দোলন এক্ষণে কোন কোন স্থলে দস্যুতায় পরিণত হইয়া দেশের অশান্তি অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছে মাত্র।* পরন্তু এত

* আমি এইরূপ বলিতেছিনা যে রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা দেশের কোন উপকারই সাধিত হয় নাই। প্রত্যেক কার্য্যেরই শুভ এবং অশুভ এই উভয়বিধ ফল থাকে; এবং এই অন্দোলনের ফলেও অনেক শুভফল উৎপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। যেমন ইহার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি এক্ষণে লোকের অধিকতর দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পরন্তু এই সকল ফল অবান্তর ফল মাত্র, সাক্ষাৎ ফল নহে।

দুর্গতির সময়েও এক ধর্ম্মের নামেই ভারতবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে অদ্যাপি উৎসাহান্বিত হইতে দেখা যায়। এই উৎসাহ আসুরিক উৎসাহ নহে। অপরের সহিত শত্রুতা কর, তাহাকে বলক্রমে বশীভূত কর, তাহার ধন রত্ন স্ত্রী কন্যা অপহরণ কর, এইরূপ উৎসাহ সাধারণ হিন্দুদিগের মধ্যে এযাবৎ উপজাত হয় নাই। অতএব বুঝিতে হয় যে হিন্দুজাতি এক্ষণে অতিশয় দুরবস্থাপন্ন হইলেও, ইঁহাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মচর্চ্চারই অনুকূল। অতএব যাহাতে এতদ্দেশীয় যুবকবৃন্দ সন্দিগ্ধফল রাজনৈতিক আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দুদিগের ঐহিক ও পারলৌকিক গৌরব ও অভ্যুদয়ের মূলীভূত ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপাদন করাও এইগ্রন্থ রচনার একটি উদ্দেশ্য। কর্ম্মের প্রতি অনাস্থা স্থাপন করা এই গ্রন্থের অভিপ্রেত নহে; পরন্তু শাস্ত্রীয় উপদেশ অনুসারে বিহিত কর্ম্মকরণে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে হিন্দুজাতি নির্ম্মলতা লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে জনসমাজকে উৎসাহিত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তপস্যাভিন্ন এই ভারতভূমিতে কখন কেহ স্থায়ী উন্নতি লাভ করে নাই; তপস্যাদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে বিধাতৃ-পুরুষের প্রসন্নতা লাভ করা যায়; তিনি প্রসন্ন হইলে জীবের অপ্রাপ্তব্য কিছুই থাকে না। এইক্ষণে সেই সনাতন পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদের চরিত্র গঠিত না করিয়া, জনসমাজের চিত্ত নির্ম্মল করিতে প্রযত্ন না করিয়া, বলপূর্ব্বক রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের যে প্রয়াস ও আশা, তাহা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছেনা। সকল কার্য্যেরই পন্থা আছে, এবং একদেশে যে প্রণালী ফল দানে সমর্থ, অপর দেশে তাহা ফল দানে সমর্থ হয় না, ইহা মনে রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

ধর্ম্মসাধনই ভারতবাসীর প্রকৃতিগত বিশেষত্ব। এই দেশে প্রাচীন কাল হইতে আধুনিককালপর্য্যন্ত যখন যিনি কোন মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তখন তিনি ধর্ম্মবলেই তাহা সম্পাদন করিয়াছেন; রাজনৈতিক ব্যাপারসকলও এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। বেদব্যাস স্বয়ং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, শ্রীভগবদবতার কৃষ্ণার্জ্জুনও স্বয়ং তপশ্চরণ করিয়া বরলাভান্তে অভীপ্সিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। মহারথী ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধৃগণকে পরাভূত করা বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ অসমর্থ জানিয়া অর্জ্জুন হিমালয়-শিখরে সুমহৎ তপস্যা অবলম্বন পূর্ব্বক দৈববল সঞ্চয় করতঃ যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং সমরে শত্রুদলকে পরাভূত করেন। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং দেবীর আরাধনা করিয়া বরলাভান্তে রাবণ বধ করিতে অগ্রসর হয়েন। এইরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই প্রাচীন হিন্দু-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই প্রণালীই চির প্রচলিত; ইহার ফল এই যে, অপরের অসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেও তন্নিবন্ধন অহঙ্কার উপজাত হয় না; কারণ কর্ম্ম-কর্ত্তা জানেন যে ইহা তাঁহার নিজ ক্ষমতায় সিদ্ধ হয় নাই। সামাজিক ব্যাপারে অনহঙ্কৃত চিত্তে বৈধ কর্ম্ম করাই সুর ও আর্য্য ভাব,ইহাই ভারতীয় আদর্শ। এই আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া আসুরিক ভাব অবলম্বনে এই দেশের ইষ্ট সাধিত হইবে না। আসুরিকভাবসম্পন্ন হইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করাও বাঞ্ছনীয় নহে। যেমন দুর্ব্বৃত্ত পুরুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলে, সে তাহার নিজের ও প্রতিবাসীর অকল্যাণসাধনের হেতু হয়; তদ্রূপ অসুরভাবাপন্ন অধর্ম্মনিরত জাতিও স্বাধীনতা লাভ করিলে, ইহা তাহার ও অপরের কল্যাণসাধনের হেতু না হইয়া বরং অকল্যাণের হেতু হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে আমাদের প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মানুষ্ঠান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,

চরিত্র নির্ম্মল হয়, অন্তঃকরণ উদার ও প্রশস্ত হয়,তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রযত্ন করা এক্ষণে কর্ত্তব্য। পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দুধর্ম্ম অনেক স্থলে বিপরীতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া কেবল ক্ষণিক ভাবুকতায় অথবা শুষ্ক মায়াবাদে পরিণত হইয়াছে। অপর দিকে প্রাচীন ব্রহ্মর্ষিগণ— যাঁহাদিগের অপরিসীম জ্ঞানবলে ভারতবর্ষ এককালে জগতীমণ্ডলে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল,—তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি এক্ষণে অনেকস্থলে ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের মধ্যেও এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে। ঋষিগণকে আমরা "পণ্ডিত" বিশেষ বলিয়া গণ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই নিমিত্ত এই গ্রন্থে প্রথমেই ঋষিদিগের সর্ব্বোৎকর্ষ স্থাপন করিতে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস ভক্তির উদয় হইলে, তাঁহাদের উপদিষ্ট সাধন অবলম্বন করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছার উদয় হইবে, ইহাই আমার আশা। মূল ব্রহ্মবিদ্যা যাহা অপর সকল বিদ্যার যোনিস্বরূপ, তাহাও গুরূপদেশে যতদূর অন্তরে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ এই গ্রন্থে বিবৃত করা হইয়াছে। এবং অবশেষে দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা নামক দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে ষড়্দর্শন (বিশেষতঃ সাংখ্য বেদান্ত ও পাতঞ্জল দর্শন) প্রাচীন ভাষ্য প্রভৃতি অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিয়া, দর্শনসকলের অধিকারনির্দ্দেশ পূর্ব্বক কল্পিত বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে প্রযত্ন করা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্বসকল বেদান্তদর্শন, পাতঞ্জলদর্শন এবং সাংখ্যদর্শনে মহর্ষিগণ স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ঐ সকল দর্শনপাঠেই ব্রহ্মবিদ্যা যথার্থরূপে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডকে "দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা" নামক খণ্ড সকলের উপক্রমণিকা স্বরূপও গণ্য করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থ পাঠে যদি জনসমাজে আর্য্য 'ঋষিদিগের প্রতি এবং তাঁহাদিগের উপ-

দিষ্ট ধর্ম্মের প্রতি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হয়, এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি আস্থা জন্মে, তবে পরিশ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব।

---

৪ উপসংহার।

যাঁহারা পাশ্চাত্যপ্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং, এতদ্দেশীয় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের দুর্গতি ও হীনাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং কেবল স্বীয় তর্কবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, হিন্দুদিগের সনাতন ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা সম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যে সমস্ত তর্কজাল সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম্মের এবং অপরাপর ধর্ম্মের প্রতি এক্ষণে প্রয়োগ করা হয় তৎসমস্ত আমি ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমহইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল অতি স্বাধীন ভাবে সমালোচনা করিয়াছি; তৎফলে আমিও দীর্ঘকাল ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাসম্পন্ন হইয়াছিলাম। পরন্তু দৈবশক্তি ও ঋষিশক্তি প্রভাবে আমি ধর্ম্মের বহুবিধ প্রত্যক্ষ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে তৎ-প্রতি আস্তিকবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছি, এবং স্বয়ং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আচরণ করিয়া তাহার যথার্থতাও অনুভব করিতেছি। বস্তুতঃ আচার দ্বারাই ধর্ম্মের সারবত্তা যথার্থরূপে অনুভবকরিতে পারা যায়, কেবল বাহিক যুক্তিতর্কদ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য করা অতিশয় কঠিন। আহার করিলে যে শরীরে রক্তসঞ্চার হয় তাহা প্রত্যেক মনুষ্যই কার্য্যতঃ অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে নানাবিধ বর্ণ ও নানাবিধ গুণ বিশিষ্ট আহার্য্য বস্তু হইতে

কিরূপে শরীরে রক্ত, দুগ্ধ, শুক্র, অস্থি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা বিচার দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া না দিলে তিনি আহার করিবেন না, তবে কেবল বিচার দ্বারা সেই ব্যক্তিকে তাহা বোধগম্য করাইয়া আহারে প্রবৃত্তি জন্মান কতদূর কঠিন, ইহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলে সকলেরই বোধগম্য হইবে। তৎসহ তুলনায় জীবতত্ত্ব জগৎতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব যে অতিশয় কঠিন বিষয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের উপরপ্রতিষ্ঠিত তর্কবিচার দ্বারা এই সকল অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিশ্বাস উৎপাদন করা যে সহস্র-গুণে অধিক কঠিন তদ্বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। অতএব জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাসাধনের ন্যায় যদি সাধারণ তর্কবিচার দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্বসকলের মীমাংসা সাধন করিতে কেহ আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা হউক আমি নিজে ঋষিদিগের যে সমস্ত অলৌকিক শক্তি পরিদর্শন করিয়াছি এবং ধর্ম্মের যে সকল প্রমাণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাভ করিয়াছি, তাহা এই গ্রন্থে কিছুই লিপিবদ্ধ করি নাই; কারণ তাহাতে সাধারণ ইংরাজি প্রণালীতে শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস স্থাপনকরা সম্ভবপর নহে; সুতরাং তদ্দ্বারা মঙ্গল সাধিত না হইয়া বরং এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের প্রতি অনাস্থা ও অশ্রদ্ধারই উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা। অতএব যুক্তি ও বিচার দ্বারাই সাধারণতঃ বক্তব্য বিষয়সকল ব্যাখ্যা ও প্রতিপন্ন করিতে প্রযত্ন করিয়াছি। তদ্দ্বারা যদি অন্ততঃ ভারতবর্ষের লুপ্ত বিদ্যা কি ছিল, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছার উদ্গম জনসমাজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও আমি কৃতার্থম্মন্য হইব।

আর ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতসমাজের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি পণ্ডিত নহি, ওকালতীব্যবসায়ী বিষয়ী লোক; সুতরাং

পণ্ডিতসমাজের কাহারও সহিত আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। আমার পাণ্ডিত্যের অভাব এতই অধিক যে সাধারণ ব্যাকরণ শাস্ত্রেও আমার ব্যুৎপত্তি অতি অল্প। তবে আমার ভাগ্য অতি অসাধারণ, কারণ আমি মহৎকৃপা লাভ করিয়াছি; সেই কৃপাবলে, অতি দুর্ব্বোধ্য দর্শন শাস্ত্রসকলও, স্নেহময়ী জননীর ন্যায়,তাঁহাদের গোপনে রক্ষিত জ্ঞানামৃত আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমিই স্থানে স্থানে বিস্মিত হইয়াছি। হিন্দু পণ্ডিত সমাজে অবশ্য ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস, মহর্ষি কপিল, পতঞ্জলি এবং গৌতম প্রভৃতি সিদ্ধর্ষিগণ ভ্রমপ্রমাদশূন্য "আপ্ত" পুরুষ ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত মতবিরোধ থাকা অসম্ভব। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে আপাততঃ যে সকল বিরোধ তাঁহাদের উপদিষ্ট গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহার অবশ্য কোন না কোন মীমাংসা আছে। আমার হৃদয়ে শ্রীগুরু কৃপায় দর্শনশাস্ত্রসকলের সামঞ্জস্যস্থাপনসমর্থ একপ্রকার মীমাংসা প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা পণ্ডিতসমাজে প্রকাশিত হইলে, তদ্দ্বারা মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহা এই গ্রন্থে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দেশ কাল পাত্র অনুসারে ধর্ম্মশিক্ষা ও প্রচারপ্রণালীরও অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে; সুতরাং, যদিচ অজিজ্ঞাসিত হইয়া এবং অপাত্রে বিদ্যা অর্পণ করা বিষয়ে শাস্ত্রে নিষেধ আছে জানি, তথাপি পূর্ব্বের সামাজিক গঠণপ্রণালীর এক্ষণে বহুল পরিমাণে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; এক্ষণে আর ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন সিদ্ধর্ষি-দিগের আশ্রমসকল প্রকটিত নাই; সুতরাং জিজ্ঞাসু হইয়া যে লোকে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিবে এমন সুব্যবস্থাও এক্ষণে নাই। বিশেষতঃ কিছুকাল যাবৎ ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম লুপ্ত হইবারই উপক্রম দৃষ্টতঃ বোধ হইতেছে। অতএব হিন্দুধর্ম্মের ও শাস্ত্রের পক্ষে আপৎ-

কালই এক্ষণে উপস্থিত বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা সাধারণ সমক্ষে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত করিলাম বলিয়া পণ্ডিত মহোদয়গণ যেন আমার প্রতি অক্রপ না হয়েন। আপৎকাল উপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ ও অপাত্রের দান গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব পণ্ডিত-সমাজের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমি অপণ্ডিত বিষয়ী লোক হইলেও,জাতীয় বিদ্যার এই আপৎকালে,গ্রন্থকার অযোগ্য লোক বলিয়া এই গ্রন্থের আলোচনা করিতে যেন তাঁহারা কুণ্ঠিত না হয়েন। ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্রের এক প্রকার সামঞ্জস্য মীমাংসা আমি এই গ্রন্থে করিয়াছি ; তাঁহাদের চিন্তাশক্তি এই বিষয়ে স্বাধীনভাবে প্রবর্ত্তিত হইলে হয়ত ইহা অপেক্ষা উত্তম মীমাংসা তাঁহারা ভগবৎ কৃপায় আবিষ্কার করিতে পারিবেন। অতএব আমার সহিত বিরোধের কোন বিষয় নাই। আমি পণ্ডিত নহি এবং অভ্রান্ত নহি, সুতরাং আমার কোনস্থলে ভ্রমে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে; অতএব পণ্ডিত মহোদয়গণ অনুকম্পাপূর্ব্বক আমার ভ্রম প্রমাদের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, গ্রন্থোক্ত বিষয়ালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা।

আর সর্ব্বসাধারণ হিন্দুজনগণের নিকট আমার বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থে ভারতীয় আর্য্যসমাজের শিরোমণি ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের গুণ এবং ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে; সুতরাং, লেখকের লিখিবার শক্তি যেরূপই হউক না কেন, এই গ্রন্থে বিবৃত বিষয়সকল অবশ্যই তাঁহাদের আনন্দ উৎপাদন করিবে। আর চন্দনবৃক্ষসংসর্গে যেমন অপর কাষ্ঠও সৌরভযুক্ত হয়, স্পর্শমণি-সংস্পর্শে কদাকার লৌহও যেমন সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সাধুসংসর্গে অতি পাপিষ্ঠ পুরুষও যেমন উদারতা লাভ করে, তদ্রূপ গ্রন্থকার

অপণ্ডিত মন্দমতি বিষয়ী লোক হইলেও, এই গ্রন্থে বিবৃত ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগের গুণে এবং ব্রহ্মবিদ্যার নিজ শক্তির প্রভাবে এই গ্রন্থও আনন্দোৎপাদিকা শক্তি লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আমি পরমারাধ্য ব্রহ্মর্ষিতে এই গ্রন্থ প্রথমেই সমর্পণ করিয়াছি ;তাঁহার প্রসাদ স্বরূপ ইহা প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক জনসমাজের নিকট এক্ষণে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ইহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি ; ভরসা করি তদ্দ্বারা তাঁহারা অবশ্য আনন্দ লাভ করিবেন।

ভূমিকা সমাপ্ত।

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ।

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়।

উদ্বোধন

প্রথম পাদ—ভারতভূমি পুণ্যভূমি

এই ভারতভূমি পুণ্যক্ষেত্র। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের পাদস্পর্শে ইহার ধূলিকণাসকল পবিত্র হইয়াছে। জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়বিষয়ক জ্ঞান, জীবের স্বরূপ, এবং সর্ব্ববিধ দুঃখনিবৃত্তির হেতুভূত পরব্রহ্মতত্ত্ব (যাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলে, তাহা) এই ভূমিতেই ব্রহ্মবেত্তা ঋষিগণ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবিদ্যা ভারতবাসিগণের বিশেষ বিদ্যা; বর্ত্তমান দুর্দ্দশাপন্ন অবস্থায় ও ভারতবাসী হিন্দুগণই এই ব্রহ্মবিদ্যা কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু সন্তানগণের বিশেষ অধিকার।

জগন্নিয়ন্তা বিধাতার সম্বন্ধে এতদ্দ্বারা পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা হয় না। কারণ বিচিত্রতাই জগতের নিয়ম; বৈচিত্র্যহইতেই জগতের প্রকাশ; বিচিত্রতাবিহীন হইলে জগতের অস্তিত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহজগতে এমন দুইটী বস্তু দৃষ্ট হয় না, যাহা সর্ব্বাংশে তুল্য, কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব প্রত্যেক বস্তুতেই আছে; সেইবিশেষত্ব বিহীন হইলে সেই বস্তুর প্রকাশ থাকা কোন প্রকারে সম্ভব হয় না। একদেশে যেরূপ বৃক্ষলতা উপজাত হয়, একদেশজাত জীবজন্তুর যেরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি; অপর দেশজাত বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুর ঠিক তদ্রূপ অবয়ব ও প্রকৃতি কখনও হয় না। ইহাই জগতের সনাতন ও স্বাভাবিক নিয়ম।

বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের যেমন বিশেষ বিশেষ আকৃতি ও প্রকৃতি আছে, তদ্রূপ বিশেষ বিশেষ দেশবাসী বিশেষ বিশেষ জাতীয় মনুষ্যেরও অপর দেশীয় এবং অপর জাতীয় মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র আকৃতি ও প্রকৃতি আছে। সুতরাং যে কার্য্য এক জাতীয় মনুষ্যের প্রকৃতির অনুকূল তাহা অপর জাতীয় মনুষ্যের প্রকৃতির তদ্রূপ অনুকূল নহে।

যেমন নিম্নদিকেই জলের গতি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, বিশেষ বাধা না থাকিলে জল নিম্নদিকেই স্বভাবতঃ গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিশেষ বাধা না থাকিলে মনুষ্যও স্বভাবতঃ স্বীয় প্রকৃতির অনুকূল কার্য্যেরই অনুধাবন করিয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ মনুষ্যগণের সম্বন্ধে যে নিয়ম, বিশেষ বিশেষ জাতি সম্বন্ধেও ঠিক সেই নিয়ম। ভারতবাসী আর্য্যগণের প্রকৃতি স্বভাবতঃ পরমার্থ চিন্তনের অনুকূল; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা এই ভারতভূমিতে যদ্রূপ আলোচিত হইয়াছে, তদ্রূপ অন্য কোন স্থানে হয় নাই; অতএব এই ভূমিতেই এই বিদ্যা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপরাপর দেশেও ধর্ম্মানুশীলন হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্ম জীবের স্বভাবগত বস্তু ; সুতরাং ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল শ্রেণীর জীবেই কোন না কোন প্রকার ধর্ম্মানুশীলন আছে। কিন্তু অপর সকল জাতিতে ধর্ম্মাচরণের চরম ফল কোন না কোন প্রকার স্বর্গ লাভ মাত্র। কোন বিশেষ প্রকার স্বর্গাধিপতি রূপেই "ঈশ্বর" অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন এবং অপরদেশবাসীকর্ত্তৃক পূজিত হয়েন। পরন্তু কেবল ভারতভূমিতেই পূর্ণ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে, এবং অদ্বৈতব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষই যে জীবের চরম আদর্শ তাহা কেবল ভারতভূমিতেই ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে; এই বিদ্যা অন্যত্র নাই।

জগৎতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব নিঃশেষরূপে পরিজ্ঞানার্থে ধ্যাননিমগ্ন ঋষিগণের নিকট অশরীরবাণীসকল আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ক তত্ত্বসকল প্রথমে উপদেশ করেন ; সেই সকল আকাশবাণী "শ্রুতি" নামে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ। শ্রুতিমুখে তত্ত্বসকল অবগত হইয়া ঋষিগণ তদুপদিষ্ট সাধন অবলম্বন পূর্ব্বক জগৎকারণ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের আয়ত্তীকৃত এই বিদ্যা অনুগত শিষ্যদিগকে তাঁহাদের অধিকার অনুসারে নানা প্রকারে উপদেশ করিয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষে তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। ঋষিগণ সাধারণ জনসমাজের উপকারার্থে শ্রুতিবাক্যসকল অনুবাদ ও বিস্তার করিয়া ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসকলও রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় শাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ। তন্মধ্যে বর্ত্তমান কালে প্রচলিত অধিকাংশ পুরাণ ও ইতিহাস মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রণীত।

পরন্তু ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যগণ শিষ্যদিগকে

শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে উপদেশযোগ্য বিষয় সকল সন্নিবেশিত করিতেন। শিষ্যদিগের অন্তরে সেই সকল উপদেশ গাঢ়রূপে অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত এই প্রণালী অবলম্বিত হইত। এই প্রকারের সূত্র পরে "দর্শন" শাস্ত্র নামে আখ্যাত হয়। তন্মধ্যে ছয় খানি দর্শনই প্রধান, এবং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহাদের নাম (১) পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন (২) বৈশেষিক দর্শন (৩) ন্যায় দর্শন (৪) সাংখ্য দর্শন (৫) পাতঞ্জল দর্শন অথবা যোগসূত্র এবং (৬) ব্রহ্মমীমাংসা; উত্তর মীমাংসা, বেদান্ত দর্শন, এবং ব্রহ্মসূত্র, এই তিনটী ব্রহ্ম মীমাংসারই নামান্তর।

পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের উপদেষ্টা মহর্ষি জৈমিনি, বৈশেষিক দর্শনের উপদেষ্টা মহর্ষি কণাদ, ন্যায়দর্শনের উপদেষ্টা মহর্ষি গোতম, সাংখ্য দর্শনের মূল উপদেষ্টা মহর্ষি কপিল, পাতঞ্জল যোগসূত্রের উপদেষ্টা মহর্ষি পতঞ্জলি, এবং বেদান্ত দর্শনের উপদেষ্টা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। যোগাবলম্বিসাধকদিগের পক্ষে পাতঞ্জল দর্শন অতি উপাদেয়; মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং ইহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; তৎকৃত ভাষ্য অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এই ভাষ্য স্বয়ং মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রণীত হওয়াতে ইহা মূলগ্রন্থের ন্যায় আদরণীয়।*

যোগসূত্রের এই ভাষ্য অতি গভীর মীমাংসাপূর্ণ গ্রন্থ; ইহা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারিলে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম সকল সুস্পষ্টরূপে

* বস্তুতঃ যোগসূত্রাধ্যয়নপ্রার্থী একটি বিদ্যার্থীকে অধ্যাপনোপলক্ষেই এই গ্রন্থরচনা প্রথমে আরম্ভ করা হয়। পরে বিষয়ের গুরুত্ব নিবন্ধন গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া ইহাকে সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং অপর সকল দর্শনও ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

বোধগম্য হয়। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, বেদব্যাস (অথবা সংক্ষেপে ব্যাস) শব্দটি উপাধিপ্রকাশক মাত্র, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে; সুতরাং ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি যে এই সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে মীমাংসিত হয় না। অন্য কোনও ব্যাস-উপাধিধারী ব্যক্তি এই ভাষ্যের প্রণেতা হইতে পারেন।

বেদব্যাস যে একটি খ্যাতি মাত্র, তাহা সত্য; কিন্তু এই খ্যাতি এই যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি ভিন্ন অন্য কাহারও নাই; এবং যুগান্তরে যখন যিনি এই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপ অভ্রান্ত ছিলেন। এই খ্যাতি যুগযুগান্তরে যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম দেবীভাগবত পুরাণে, প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে, বিশদরূপে বর্ণিত আছে; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

সূত উবাচ।

মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে।
প্রাদুঃকরোতি ধর্ম্মার্থী পুরাণানি যথাবিধি॥
দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণু র্ব্যাসরূপেণ সর্ব্বদা।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিতকাম্যয়া॥
অল্পায়ুষোঽল্পবুদ্ধীংশ্চ বিপ্রান্ জ্ঞাত্বা কলাবথ।
পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং কুরুতেঽসৌ যুগে যুগে॥
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ন বেদশ্রবণং মতম্।
তেষামেব হিতার্থায় পুরাণানি কৃতানি চ॥
মন্বন্তরে সপ্তমেঽত্র শুভে বৈবস্বতাভিধে।
অষ্টাবিংশতমে প্রাপ্তে দ্বাপরে মুনিসত্তমাঃ॥

ব্যাসঃ সত্যবতীসূনু গুরুর্মে ধর্ম্মবিত্তমঃ।
একোনত্রিংশৎ সংপ্রাপ্তে দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি॥
অতীতাস্ত তথা ব্যাসাঃ সপ্তবিংশতিরেব চ।
পুরাণসংহিতাস্তৈস্ত কথিতাস্ত যুগে যুগে॥

ঋষয় ঊচুঃ।

ব্রূহি সূত! মহাভাগ! ব্যাসাঃ পূর্ব্বযুগোদ্ভবাঃ।
বক্তারস্ত পুরাণানাং দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে॥

সূত উবাচ।

দ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা।
প্রজাপতির্দ্বিতীয়ে তু দ্বাপরে ব্যাসকার্য্যকৃৎ॥
তৃতীয়ে চোশনা ব্যাস শ্চতুর্থে তু বৃহস্পতিঃ।
পঞ্চমে সবিতা ব্যাসঃ ষষ্ঠে মৃত্যুস্তদাপরে॥
মঘবা সপ্তমে প্রাপ্তে বশিষ্ঠস্বষ্টমে স্মৃতঃ।
সারস্বতস্ত নবমে ত্রিধামা দশমে তথা॥
একাদশেহথ ত্রিবৃষো ভরদ্বাজস্ততঃ পরম্!
ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষো ধর্ম্মশ্চাপি চতুর্দ্দশে॥
ত্রয্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
মেধাতিথিঃ সপ্তদশে ব্রতী হ্যষ্টাদশে তথা॥
অত্রিরেকোনবিংশেহথ গৌতমস্ত ততঃ পরম্।
উত্তমশ্চৈকবিংশেহথ হর্য্যাত্মা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
বেণো বাজশ্রবাশ্চৈব সোমোহমুষ্যায়ণস্তথা।
তৃণবিন্দুস্তথা ব্যাসো ভার্গবস্ত ততঃ পরম্॥

ততঃ শক্তি র্জাতুকর্ণ্যঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতিসংখ্যেয়ং কথিতা যা ময়া শ্রুতা॥

অস্যার্থঃ—সূত বলিলেন ধর্ম্মার্থী (বেদব্যাস) সকল মন্বন্তরেই, প্রতি দ্বাপরযুগে, যথানিয়মে, পুরাণসকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বয়ং বিষ্ণু, জগতের হিতকামনায়, প্রতি দ্বাপরযুগেই ব্যাসরূপে এক বেদকে বহুধা বিভক্ত করেন। কলিকালের ব্রাহ্মণগণকে অল্পায়ুঃ এবং অল্পবুদ্ধি জানিয়া, ভগবান্ প্রতিদ্বাপরযুগে পবিত্র পুরাণসংহিতা প্রকাশ করেন। স্ত্রী, শূদ্র এবং অধম দ্বিজদিগের পক্ষে বেদশ্রবণ সঙ্গত নহে (তাহারা বেদপাঠে অধিকারী নহে); তাহাদিগেরই হিতার্থে (বেদার্থসমন্বিত) পুরাণসকল রচনা করেন (অর্থাৎ কলিকালে ধর্ম্ম ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং ব্রাহ্মণগণ, পাপবুদ্ধিযুক্ত হওয়াতে, বেদবাক্যসকলের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ ও ধারণ করিতে অযোগ্য হয়েন, এবং সকল জাতিই বহুলপাপসংসর্গনিবন্ধন শূদ্রবৎ মূঢ়বুদ্ধি হয়েন। তন্নিমিত্তই তাঁহাদের বোধোপযোগী পুরাণ শাস্ত্র প্রণীত হয়)। বর্ত্তমান বৈবস্বতনামক শুভ সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে মুনিপ্রবর সত্যবতীনন্দনই ব্যাস, ইনিই আমার গুরু এবং ইনি ধর্ম্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একোনত্রিংশৎ দ্বাপরে (অর্থাৎ ইহার পরবর্ত্তী দ্বাপরে) দ্রোণপুত্র ব্যাস হইবেন। এক্ষণে সপ্তবিংশতি ব্যাস গত হইয়াছেন, তাঁহারাও যুগে যুগে (অর্থাৎ বিগত সপ্তবিংশতি দ্বাপরযুগে) পুরাণসংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ঋষিগণ বলিলেন ঃ—হে মহাভাগ সূত! পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বাপরযুগে উদ্ভূত পুরাণবক্তা ব্যাসগণের নাম কীর্ত্তন কর।

সূত বলিলেন ঃ—প্রথম দ্বাপরে স্বয়ং ব্রহ্মা বেদবিভাগকর্ত্তা অর্থাৎ ব্যাস; দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি ব্যাসকার্য্য করিয়াছিলেন;

তৃতীয় দ্বাপরে ব্যাস উশনা (শুক্র), চতুর্থে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সূর্য্য, ষষ্ঠে যম, সপ্তমে ইন্দ্র, অষ্টমে বশিষ্ঠ, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিবৃষ, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দশে ধর্ম্ম, পঞ্চদশে ত্রয্যারুণি, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে মেধাতিথি, অষ্টাদশে ব্রতী, একোনবিংশে অত্রি, বিংশে গৌতম, একবিংশে উত্তম (যিনি হর্য্যাত্মা নামে পরিকীর্ত্তিত হয়েন), দ্বাবিংশে বাজশ্রবা বেণ, ত্রয়োবিংশে তদ্বংশীয় সোম, চতুর্ব্বিংশে তৃণবিন্দু, পঞ্চবিংশে ভার্গব, ষড়বিংশে শক্তি, সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ্য, এবং অষ্টাবিংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। আমি যদ্রূপ শ্রুত হইয়াছি তদ্রূপ এই অষ্টাবিংশতি ব্যাসের কথা বলিলাম। *

---

* সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই যুগ-চতুষ্টয়-ব্যাপী কালের নাম মহাযুগ। গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ষড়্ঋতুব্যাপী কালের নাম যেমন সংবৎসর, এবং এই সংবৎসর যেমন ষড়্ঋতুযুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে, তদ্রূপ, যুগচতুষ্টয় সমন্বিত হইয়া, মহাযুগ ও পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে। একসপ্ততিমহাযুগপরিমিত কালকে এক মন্বন্তর বলে, এবং সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়; সুতরাং প্রতিকল্পে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর আছে। কল্পান্তে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রকাশিত জগৎ আদি-কারণে লীন হয়; এইরূপ এক কল্পকাল লীন থাকিয়া, পুনরায় সৃষ্টি প্রকাশ পায়। এক মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং পুনরায় মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত সহস্র মহাযুগ এইরূপে পুনঃপুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়। যেমন প্রতি বৎসর গ্রীষ্মঋতু উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক জগৎ সাধারণতঃ একরূপই ভাব ধারণ করে, এবং শীত ঋতু উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের শীত ঋতুর ন্যায় অপর এক ভাব প্রাকৃতিক জগতে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ প্রতি মহাযুগেই সত্যযুগাখ্য কালের প্রাদুর্ভাবসময়ে প্রাকৃতিক জগতের এবং জীব জন্তুর মানসিক ও শারীরিক ভাবের এক বিশেষ অবস্থা প্রাদুর্ভূত হয়। যেমন শীতাপগমে প্রাকৃতিক জগতের ও জীবজন্তুর এক বিশেষ অবস্থা প্রাদুর্ভূত দেখিলে বসন্ত ঋতুর আগমনের উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ প্রাণিসমূহের এবং প্রাকৃতিক জগতের এক বিশেষ অবস্থা আবির্ভূত দেখিয়া সত্য যুগের আগমন ঋষিগণ জ্ঞাত হইয়া থাকেন। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি সম্বন্ধেও এইরূপ। কিন্তু যেমন এই বৎসরের শীত ঋতু ও পূর্ব্ব ২ বৎসরের শীতঋতুর অনেক সাদৃশ্য আছে, পরন্তু কোন কোন সামান্য বিষয়ে প্রভেদও দৃষ্ট হয়, যেমন গত বৎসর যে সময়ে

এতৎ সম্বন্ধে মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণেও এইরূপই প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান মন্বন্তরে একমাত্র সত্যবতীসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষিই বেদব্যাস বলিয়া সিদ্ধ আছেন, অন্য কাহারও ব্যাসত্ব সিদ্ধ নহে। বেদব্যাস শব্দের অর্থ,—শাখাভেদে বেদবিভাগপূর্ব্বক বিস্তারকর্ত্তা। "বিব্যাস বেদান্ যস্মাৎ স তস্মাদ্ ব্যাস ইতি স্মৃতঃ" (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৩ অধ্যায়, ৮৮ শ্লোক)। এই মন্বন্তরে বেদ একবারই বিভক্ত হইয়াছে, ব্যাসও সুতরাং একজনই। পরন্তু যদি এই যোগসূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন না হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্বন্তরের ব্যাস কেহ হইয়া থাকেন, তাহাতেও এই ভাষ্যের প্রামাণিকতার অভাব হয় না ; যে কোন ব্যাস দ্বারাই এই ভাষ্য রচিত হউক, ইহাকে বেদার্থসম্মত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আধুনিক

আমার বাটীস্থ আম্রবৃক্ষ ফলবান্ হইয়াছিল এই বৎসরও প্রায় তৎকালেই ফলবান্ হইয়াছে, কিন্তু ফল ও পত্র ধারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষও অবশ্য হইয়াছে ; তদ্রূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাযুগের দ্বাপরপ্রভৃতি যুগে জীবসমূহ ও প্রকৃতিবর্গের যেরূপ সাধারণ অবস্থা হইয়াছিল, এই মন্বন্তরেও তাহাদের তদ্রূপই সাধারণ ধর্ম্ম হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; কিন্তু কতক কতক বৈষম্যও প্রত্যেক মন্বন্তরের যুগে যুগেই অবশ্যম্ভাবী। তন্নিমিত্ত ব্যাসত্ব ও মন্বন্তরে মন্বন্তরে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করা বিচিত্র নহে।

এস্থলে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে বৎসরের পুনরাবৃত্তি আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, কিন্তু কল্প বা মন্বন্তর অথবা মহাযুগের দূরে থাকুক, এক এক যুগ পরিমিত কালেরই পরিবর্ত্তন, আয়ুর অল্পতা নিবন্ধন, আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয় না ; তাহাতে কল্প কিংবা মন্বন্তরের এবং মহাযুগের এইরূপ পুনরাবৃত্তি কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে ? তাহার উত্তরে আমরা এক্ষণে এইমাত্র বলিতে পারি যে এই মহাযুগসকলের জ্ঞান যোগমার্গাবলম্বী পুরুষের পক্ষে অসম্ভব নহে, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যোগমার্গাবলম্বী ব্যক্তিগণ লাভ করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান কালেও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ লাভ করিতেছেন ও করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে এস্থলে অধিক আলোচনা করা হইল না, কারণ পরপর পাদে ব্রহ্মর্ষিদিগের জ্ঞানোৎকর্ষের বিষয় বিশেষ সমালোচনা করা হইয়াছে।

কালে কোন কোন পণ্ডিত ব্যাস উপাধি গ্রহণ করিতেছেন সত্য, কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্য অতি প্রাচীন। প্রাচীন কালে কোনও পণ্ডিত ব্যাস উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু অপর কোনও ব্যাস-উপাধিধারী পণ্ডিত এই অপূর্ব্ব ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া থাকিলে, তাঁহার স্বীয় নাম গোপন করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না; প্রাচীন কালে এইরূপ নাম গোপন করিবার রীতি থাকাও দৃষ্ট হয় না। এই ভাষ্য কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে; অতএব কোনও সাম্প্রদায়িক মত প্রচলিত করিবার অভিপ্রায়ে কেহ, 'ব্যাস' নাম অবলম্বনপূর্ব্বক, এইগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াও মনে করিবার কোনও কারণ নাই। যিনি এই ভাষ্যের প্রণেতা, তাঁহার নাম সর্ব্বতোভাবে ধন্য হইবার যোগ্য; ইহা গোপন করিয়া রাখিবার কোনও হেতু দৃষ্ট হয় না। যোগসূত্রের ভাষ্যের বর্ণিত উপদেশসকল দ্বারাও মহর্ষি বেদব্যাসই ইহার প্রণেতা বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়েন, কারণ তৎসমস্ত উপদেশই বেদব্যাস মহাভারতাদি গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ভারতভূমি পুণ্যভূমি নামক প্রথম পাদ সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ।

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা।

প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ।

সংশয়।

এই স্থলে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যের প্রণেতাকে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়োজন কি? যিনিই প্রণেতা হউন না কেন, গ্রন্থে কি লিখা হইয়াছে, তাহাই জানা প্রয়োজন; তাহা সঙ্গত বোধ হইলে, তাহা অবশ্য গ্রহণোপযোগী; যদি অসঙ্গত হয় তবে, যিনিই কেন গ্রন্থকার হউন না, তাঁহার মীমাংসা সকল গ্রহণীয় নহে। এইরূপ বিতর্ক কেবল এইভাষ্যসম্বন্ধে নহে, মূলসূত্রসম্বন্ধেও উপস্থিত হইতে পারে; এবং এইক্ষণকার শিক্ষাপ্রণালীনিবন্ধন, ব্রহ্মসূত্র, সাংখ্যসূত্র প্রভৃতি অপরসকলগ্রন্থ সম্বন্ধেই বিদ্যার্থীদিগের মনে এইরূপ সংশয় সততই উদয় হইতেছে। অতএব তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ আমাদের কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক :—

অধুনা যেসকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে ভূগোল প্রভৃতি শ্রেণীর গ্রন্থ ব্যতীত অপরাপর গ্রন্থ গ্রন্থকারের অনুমানের উপর নির্ভরে রচিত হইয়া থাকে। এই অনুমান নিজের

যৎসামান্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জন্য জ্ঞান এবং অপরেরও তদ্রূপ জ্ঞান অবলম্বনে স্থাপিত। কিন্তু সাধারণ জীবের প্রত্যক্ষজ্ঞান, প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়ের কার্য্যোপযোগী শারীরিক যন্ত্রসকলের গঠনদোষে দুষ্ট। যেমন গৃহের গবাক্ষদ্বার হরিদ্বর্ণ কাঁচের দ্বারা আবৃত থাকিলে, তাহার ভিতর দিয়া যদি সূর্য্যালোক গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তবে ঐ আলোক হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত বলিয়াই গৃহাভ্যন্তরস্থ পুরুষের প্রতীতি হয়; তদ্রূপ স্থূল চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রসকল যেরূপ শক্তি ও গুণ-সম্পন্ন হইয়া গঠিত হইয়াছে, সেইসকল গুণ ও শক্তি দ্বারা চাক্ষুষ ও শ্রাবণিক-প্রভৃতি প্রত্যক্ষসকলও অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে। ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয় যে, কোন কোন ব্যক্তির চক্ষুতে একপ্রকার দোষ জন্মে, যাহাতে তাহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষীভূত সকল বস্তুই সে হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া বোধ করে। কেহ কেহ প্রত্যেক বস্তুকে, চক্ষের বিকার নিবন্ধন, একই কালে, দুই দুই, তিন তিন করিয়া প্রত্যক্ষ করে। কাহারও কাহারও কর্ণনামক যন্ত্র এইরূপ বিকারপ্রাপ্ত যে, কখন কখন হয়ত সে ব্যক্তি কোন ধ্বনিই শুনিতে পায় না, অথবা কোন প্রকার বিকৃতধ্বনিমাত্র শ্রবণ করিয়া থাকে। এই সকল বিকারপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু শারীরিক যন্ত্রদোষে যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের তারতম্য হয়, তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। পরন্তু যাহাদিগের চক্ষুরাদি যন্ত্রসকল পূর্ব্বোক্ত-রূপে বিকারপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদেরও ঐ সকল যন্ত্রের স্বাভাবিক গঠনদোষে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান দুষ্ট হয়, তাহা কিঞ্চিৎ অবহিত চিত্তে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে। একটি সরলগামী প্রশস্ত রাজপথের মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, ঐ পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন তাহার উভয় পার্শ্ব ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া

অবশেষে এক স্থানে মিশিয়া গিয়াছে ; কিন্তু ঐ রাজপথ দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে প্রকাশ পায় যে ইহা চক্ষের ভ্রান্তিমাত্র। প্রথমে যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দৃষ্টি চালনা করা হইয়াছিল, তথায় পন্থার উভয়পার্শ্ব যতদূরে অবস্থিত, অন্যত্রও তদ্রূপ ; কিন্তু চক্ষুর্যন্ত্রের দোষেই, উভয়পার্শ্ব ক্রমশঃ সমীপবর্ত্তী হইয়া দূরে একত্র মিলিত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। পরন্তু এই ভ্রান্তি, ভ্রান্তি বলিয়া, পরে প্রকাশিত হইলেও, পুনরায় ঐরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যে ইহা অপনীত হয়, তাহা নহে। সুতরাং সর্ব্ব সাধারণের চক্ষুর্যন্ত্রের যে স্বাভাবিক গঠনদোষ আছে তাহা এতদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যায়। আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ঃ—কোনও ব্যক্তি, মাঠের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া, দূরবর্ত্তী গ্রামের দিকে চক্ষু চালনা করিলে, তাহার বোধ হয় যে ঐ গ্রামস্থিত বৃক্ষ, প্রাচীর, প্রাসাদ-প্রভৃতি সমস্ত বস্তু তাহা হইতে সমদূরে একখানি চিত্রপটের উপর অঙ্কিত বৃক্ষ লতাদির ন্যায় বিরাজমান রঁহিয়াছে। পরন্তু পরে সেই ব্যক্তি যতই গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই ঐ গ্রামস্থিত বৃক্ষাদির অবয়ব বিষয়ে, ও তাহা হইতে পরস্পরের দূরত্বসম্বন্ধে, তাহার ভিন্নরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তলস্থ বৃক্ষ, লতা, গো, মনুষ্যপ্রভৃতি সকল বস্তুই অতি ক্ষুদ্রাকৃতি এবং ভূমিসম বলিয়া বোধ হয়। মরুভূমিতে জলহীন স্থানে জলপ্রত্যক্ষ এবং বৃক্ষাদিরহিত স্থানে বৃক্ষাদিপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ আছে। রামধনুকে আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গমস্থলে অদূরে অবস্থিত দেখিয়া, বালক তাহা স্পর্শ করিয়া সুবর্ণকুণ্ডল প্রাপ্ত হইতে প্রয়াস পায়। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহা করেন না বটে ; কিন্তু বালকের যেরূপ

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষও ঠিক তদ্রূপই হয়; তবে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ইহা ভ্রম বলিয়া অবগত আছেন, এই মাত্র প্রভেদ। বালক মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া চন্দ্রমা গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারণ করে; তাহার চক্ষু আমাদের চক্ষুরই ন্যায়, সন্দেহ নাই; পরন্তু দূরত্ব বিষয়ে আমাদের যে বোধ আছে, তাহার সেইপ্রকার বোধ নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেবল যে চক্ষু-র্যন্ত্রের স্বাভাবিক গঠনে এই প্রকার দোষ আছে তাহা নহে, বিচার করিয়া দেখিলে অপরাপর যন্ত্রেরও এই প্রকার গঠনদোষ থাকা প্রকাশ পায়। আমার হস্ত উত্তপ্ত থাকিলে অপরের শরীরস্পর্শে তাহা শীতল বলিয়া বোধ হয়, আমার হস্ত শীতল থাকিলে সেই শরীরই উত্তপ্ত বলিয়া বোধ হয়। আমার জিহ্বা স্বভাবতঃ একপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে খাদ্যবস্তু সকলই তিক্ত বলিয়া বোধ করি, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে তদ্রূপ বোধ করি না। অতি অম্ল আম্রও বালকের জিহ্বায় মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, পরে অধিক বয়সে আর তদ্রূপ হয় না। এক ব্যক্তির অল্পলবণাক্ত বস্তু উৎকট বলিয়া বোধ হয়, তদপেক্ষা অধিক লবণাক্ত বস্তুও অপরের নিকট তদ্রূপ বোধ হয় না। অদ্য যাহাকে অতি সুশ্রী বলিয়া বোধ করিতেছি, কল্য ভাবান্তর উপস্থিত হইলে তাহাকেই কুশ্রী দেখিতেছি। অদ্য যে ধ্বনি অতি মধুর বলিয়া বোধ করিতেছি, কল্য তাহাই অতি অপ্রীতিকর বোধ হইতেছে; অথচ সকল সময়েই তাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বলিয়া ধারণা করিতেছি। এই অবস্থায় আমরা যে জ্ঞানকে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বলিয়া বলি তাহার নিশ্চয়তা ও অভ্রান্তত্ব কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, আরও কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া বিচার করিলে ইহাও

বোধগম্য হইবে যে, আমরা সচরাচর যাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলি, তাহার একাংশমাত্র বাস্তবিক প্রত্যক্ষ, এবং অপর দুই অংশ স্মৃতি ও অনুমান। একটী চতুষ্পদবিশিষ্ট বস্তু দেখিয়া আমি বলিলাম যে ইহা 'গো' বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পরন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে ঐ চতুষ্পদবিশিষ্ট পদার্থ, আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে, আমি প্রথমে তাহার অবয়ব ইন্দ্রিয়প্রণালীদ্বারা গ্রহণ করি, এই মাত্র ইন্দ্রিয়জনিত প্রত্যক্ষের কার্য্য। এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে, আমার পূর্ব্ব স্মৃতি উপস্থিত হইয়া আমাকে জ্ঞাত করায় যে, এইরূপ অবয়ব ও ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ আমি পূর্ব্বে আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং তাহা 'গো' এই সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত বলিয়া জানিয়াছি। এইটি স্মৃতির ব্যাপার। তৎপর অনুমানশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া, আমাকে এই মীমাংসায় উপনীত করায় যে বর্ত্তমান প্রত্যক্ষীভূত অবয়ববিশিষ্ট পদার্থটি গো। পরন্তু এই তিন প্রকার কার্য্য—ইন্দ্রিয়ব্যাপার, স্মৃতি ও অনুমান—বুদ্ধির জড়তাবশতঃ আমি পৃথক্ করিতে না পারিয়া, বলিয়া থাকি যে আমি গো প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার এই জ্ঞানের ইন্দ্রিয়ব্যাপার-জনিত প্রত্যক্ষাংশ শারীরিক যন্ত্রদোষহেতু দুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, ঐ অংশ, আমার মনের চঞ্চলতা অথবা জড়তাবশতঃ, সম্যক্ আয়ত্তাধীন না হইয়া থাকিতে পারে। একটি ইন্দ্রিয়ব্যাপার, চিত্তে স্থিরভাবে গৃহীত হইয়া সম্যক্ ধারণা হইতে না হইতেই, অন্য ব্যাপার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মন যে অন্য দিকে ধাবিত হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এবং চিত্তের জড়তাবশতঃও যে সময়ে সময়ে ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের ধারণাই মনে উপজাত হয় না, তাহাও সকলেরই বিদিত আছে। পরন্তু মনের চাঞ্চল্য এবং জড়তা হেতু, স্মৃতিশক্তি ও সম্যক্ উদ্দীপিত হইয়া পূর্ব্বানুভূত বস্তুর রূপ সম্যক্ প্রকাশ করিয়া না

থাকিতে পারে ; এবং অনুমান কার্য্যে যে সাম্য-বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আবশ্যক, তাহাও, মনের পূর্ব্বোক্ত দোষহেতু, যথার্থরূপে না হইতে পারে। বস্তুতঃ একই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, একই কালে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করা অনেক সময়ে শ্রুত হওয়া যায়। রজ্জুতে সর্পভ্রম, অন্ধকারস্থলে বৃক্ষেতে মনুষ্যভ্রম সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধআছে। দিগ্‌ভ্রম ব্যাপার ও সকলেরই বিদিত আছে ; আমি যাহাকে পূর্ব্বদিক্ বলিতেছি, আপনি তাহাকেই পশ্চিমদিক্ বলিয়া দেখিতেছেন। পরন্তু আপনার ও আমার চাক্ষুষ ইন্দ্রিয়ব্যাপারের এই স্থলে কোন তারতম্য নাই ; আপনি যে যে বস্তু দেখিতেছেন, আমিও সেই সেই বস্তুই দেখিতেছি ; কিন্তু, পূর্ব্বস্মৃতি ও অনুমান বিষয়ে বিভিন্নতা হেতু, আমাদের এইরূপ বিপরীত প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেছে যে, আমি যাহাকে পূর্ব্বদিক্ বলিয়া বোধ করিতেছি আপনি তাহাকে তদ্বিপরীত পশ্চিমদিক্ বলিয়া বোধ করিতেছেন। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা যাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া মনে করি, ইন্দ্রিয়প্রণালীর দোষ এবং মূল প্রত্যক্ষের সহিত স্মৃতি ও অনুমানের বিমিশ্রণ বিষয়ে বিভিন্নতা হেতু, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না ; এবং প্রত্যক্ষাংশকে স্মৃতি ও অনুমান অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতেও সকলের ক্ষমতা নাই।

তৃতীয়তঃ, জগতের অতি অল্পাংশই আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। এক স্থানে অথবা কালে যেরূপ প্রত্যক্ষ হয়, তাহার উপরেই অনুমানসকল স্থাপিত হইয়া থাকে। পরন্তু অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সহিত পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের ব্যভিচার সচরাচরই বাহির হইয়া পড়ে, সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্তসকলও ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে থাকে।

অতএব, নানা কারণেই, এই ভ্রান্ত ও সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর

নির্ভর করিয়া যেসকল অনুমান স্থাপন করা যায়,এবং তন্মূলে যে সকল সিদ্ধান্ত আধুনিক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়, তাহা নিশ্চিত সত্য বলিয়া অবিতর্কিতরূপে গ্রহণ করা যায় না। পরন্তু ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের প্রণীত গ্রন্থ এরূপ নহে; কারণ ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ, যোগবলে অভ্রান্তজ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত, ব্রহ্মবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন নাই এবং মীমাংসক আচার্য্যদিগের স্থান অধিকার করেন নাই। তাঁহারা সমাধিবলে অভ্রান্ত দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া যখন সৃষ্টিবিষয়ক সর্ব্ব বস্তুর স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইতেন, তখনই সচরাচর ব্রহ্মবাদী আচার্য্য পদবী লাভ করিয়া, শিষ্যদিগকে তাহাদিগের অধিকার অনুসারে তত্ত্ব সকল উপদেশ করিতেন। পরন্তু সর্ব্ববিষয়ে সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিয়াও অনেকে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হইতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত বর্ত্তমান উপদেষ্টৃগণের প্রভেদ এই যে, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যতদূর নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিতেন তিনি ততটুকু মাত্রই উপদেশ করিতেন, কল্পনা করিয়া অতিরিক্ত উপদেশ করিতেন না। পরন্তু কেবল ব্রহ্মবাদী ঋষিগণকেই "আপ্ত" পদবী দেওয়া হইয়াছে, এবং তাঁহাদের উপদেশ সকলকেই 'আপ্তবাক্য' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই এই আপ্তবাক্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু আচার্য্য ঋষিগণের জ্ঞানোৎকর্ষবিষয়ে, তাঁহাদের সঙ্গাভাব হেতু, এক্ষণকার কালে অনেকের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথমাধ্যায়ে সংশয়নামক দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ॥

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ।

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা।

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ।

সংশয় ভঞ্জন ও ভারতীয় প্রাচীন গৌরব বর্ণনা।

আচার্য্য ঋষিগণ যে প্রকৃত প্রস্তাবে অভ্রান্ত "আপ্ত" হইয়াছিলেন, তাহা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিব? এই প্রশ্ন অনেকের মনে এক্ষণে উদিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে আমরা প্রথমে এই বলিতেছি যে, আমি বঙ্গদেশে থাকিয়া, ইংলণ্ডনামক স্থান না দেখিয়াও যে কারণে ঐ স্থান আছে বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস করি, সেইরূপ কারণে আচার্য্য ঋষিদিগের অভ্রান্ততাও আমাকে বিশ্বাস করিতে হয়। ইংলণ্ডনামক দেশ আছে বলিয়া ইংলণ্ডবাসী কোন কোন ব্যক্তি আমাদের নিকট প্রচার করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশীয় লোক কেহ কেহ, তাঁহাদের বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়, তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ-পূর্ব্বক গমন করিয়া, ইংলণ্ডবাসিগণের বর্ণনানুরূপ ইংলণ্ডনামক দেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কেহ ফিরিয়া আসিয়া বলেন নাই যে ইংলণ্ডের অস্তিত্ববিষয়ক উক্তি সত্য নহে। যখন যিনি যাইতেছেন, তখনই তিনি ইংলণ্ডের সত্যতার বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। ইংলণ্ডহইতে আগত লোকের ভাব ভঙ্গী আচার-প্রভৃতিদ্বারাও বোধ হয় যে তাঁহারা এদেশবাসী হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির জনসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে সাধরণতঃ এইরূপ লোক বলিয়া আমরা জানি যে তাঁহারা ঈদৃশ বিষয়ে

অকারণ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। অতএব আমি ইংলণ্ড দেশ না দেখিলেও ইংলণ্ডের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকি। আচার্য্য ঋষিদিগের অভ্রান্ততাও এইরূপ প্রমাণদ্বারাই সিদ্ধ হয়। তাঁহারা প্রথমে, জনসমাজের মধ্যে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ত্যাগী, এবং সজ্জন রূপে পরিচিত ছিলেন; বহু সাধন অবলম্বন করিয়া যখন তাঁহারা সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সাধনাবশেষে যে অবস্থা লাভ হইয়াছিল তাহার সমাচার জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন; এবং যে মার্গ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সেই অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহারা উপযুক্ত শিষ্যদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন; এবং এই উপদেশকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া যখন যিনি তাঁহাদিগের প্রদর্শিত মার্গে গমন করিয়াছেন, তিনিই উপদেশের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন; উপদিষ্ট পথে সম্যক গমন করিয়া কেহ কখনও প্রত্যাগমন করিয়া বলেন নাই যে উপদেশ মিথ্যা। যিনি যতদূর গিয়াছেন, তিনি ততদূরপর্য্যন্ত উপদিষ্ট পথের চিহ্নসকল প্রত্যক্ষ করিয়া, উপদেশের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ শক্তিপ্রভৃতি ও সাধারণ জনগণ হইতে বহুল পরিমাণে পৃথক্। এইরূপ নহে যে, কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালেই লোক, উপদিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া, ফল লাভ করিয়াছেন; অদ্যাপিও এই ভারত ভূমিতে অনেক লোক পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন-পূর্ব্বক কৃতকৃত্যতা লাভ করিতেছেন।* এক্ষণকার কালের গুণে, লোকসকল

*উপদিষ্ট বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিবার নিমিত্ত এবং তদ্বিষয়ে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ সহজ সহজ সাধন অবলম্বন করিয়া তাহার ফলস্বরূপ অতীন্দ্রিয়জ্ঞান কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ করিবার কথা যোগসূত্রে গ্রন্থকার উপদেশ করিয়াছেন। এই সকল সহজ সহজ সাধন প্রণালীও গ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে।

অতিশয় আলস্যপর এবং আত্মম্ভরি হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং আচার্য্য-পদবী অথবা উচ্চসাধনাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের বিষয়ে কোন অনুসন্ধানই তাঁহারা করিতে ইচ্ছা করেন না; এবং ভারত ভূমিতে যে অদ্যাপি এইরূপ শ্রেণীর লোক বহুসংখ্যক আছেন, তাঁহারাইহা জ্ঞাতও নহেন, এবং জ্ঞাত হইতে প্রয়াসও করেন না। কেহ কেহ এইরূপ আপত্তিও করিয়া থাকেন যে এইরূপ লোক কেহ আছেন বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না; কারণ, যদি এইরূপ কোন পুরুষ থাকিতেন, তবে তিনি অবশ্য জনসমাজে আসিয়া সেই শক্তির পরিচয় দিতেন। এই সকল আপত্তিকারীকে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে তাঁহারা অতিশয় ভাগ্যহীন; কারণ দেশে অমূল্য নিধি বর্ত্তমান থাকিতেও তাঁহারা কেবল আলস্য ও অহঙ্কার হেতু তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। প্রথমতঃ, তাঁহাদিগের জানা আবশ্যক যে প্রয়োজন তাঁহাদেরই; যাঁহারা কৃতকৃত্য হইয়াছেন, সমাজে আসিয়া উপদেশ দিবার কোনও প্রয়োজন তাঁহাদিগের নিজের নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও জানা আবশ্যক যে,মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যসম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা আছে, আচার্য্যদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তাহা খাটে না। পুরাণে বহুস্থলে উল্লেখ আছে যে, বিধাতার নিয়মানুসারে ঋতুগণের পরিবর্ত্তনের ন্যায়, দ্বাপরযুগ অতিক্রান্ত হইয়া কলিকাল প্রাদুর্ভূত হইলে, ভগবৎপ্রেরিত হইয়া দেবতা এবং ঋষিগণ আপনাদিগকে জনসমাজ হইতে লুক্কায়িত করিয়াছিলেন। তবে এই কালেও পরোক্ষতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী লোক সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন কখন জনসমাজে আসিলেও, নানা আবরণে আপনাদিগকে এইরূপ আচ্ছাদিত করেন যে কলিশক্তিবশীভূত সাধারণ লোক তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয় পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয় না। তাঁহা-

দের ব্যবহার তন্নিমিত্ত দূষণীয় নহে; কারণ বদ্ধজীবের কর্ম্মনীতিসম্বন্ধীয় বিধান তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরসত্তায় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই বাক্যের যথার্থতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভগবান্ যে সর্ব্বশক্তিমান্, ইহা সকল ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন; তবে তিনি কেন সাংসারিক লোকের পাপ দুঃখ হরণ করেন না? যখন তিনি তাঁহার সত্তা প্রকট করিলেই সমস্ত নাস্তিকতা দূর হইয়া যায়, তখন তিনি কেন তাহা করিতেছেন না? যে সকল কারণ তাঁহার সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করা যায়, যাঁহারা তৎপদবী লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের ভগবদিচ্ছার অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, সেই আচার্য্য ঋষিগণের সম্বন্ধেও তৎসমস্তই সম্পূর্ণরূপ প্রযোজ্য হয়। কিন্তু এক্ষণে অপেক্ষাকৃত শুভ সময় উপস্থিত; সুতরাং দেবতা এবং ঋষিগণ এক্ষণে কথঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই শুভ সময়ে, যাহারা আলস্য বর্জ্জন করিয়া, যত্নবান্ হইবেন, তাঁহারা সন্দেহ-বিনাশক তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি; কারণ এক্ষণে যাঁহারা এইরূপ যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগের কল্যাণজনক সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

পরন্তু আচার্য্য ঋষিগণের অলৌকিক জ্ঞানের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তৎসম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, আচার্য্য ঋষিগণের অভ্রান্ততাপ্রতিপাদনের নিমিত্ত যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইল, তাহা সমীচীন নহে; কারণ ইংলণ্ডদেশ না দেখিয়াও তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে যে আমি বিশ্বাস করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, আমার প্রত্যক্ষীভূত ভূমিখণ্ডদ্বারা পৃথিবীমণ্ডল পর্য্যাপ্ত হয় নাই; তদতিরিক্ত আরও যে অনেক দেশ আছে, তাহা আমি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

সুতরাং ইংলণ্ডনামক আর একটি দেশ যে আমার প্রত্যক্ষীভূত ভূমিখণ্ডের বহির্দ্দেশে, দূরস্থানে, অবস্থিত আছে, ইহাতে কিছু মাত্র বিচিত্রতা নাই; অতএব ঐ দেশ কেহ দর্শন করিয়াছেন বলিলে, তাঁহাকে আপাততঃ অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। কিন্তু আচার্য্য ঋষিগণের যেরূপ অলৌকিক দর্শনশ্রবণাদির কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাহা আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিপরীত। সুতরাং তৎসম্বন্ধে অনুকূল অনুমান কিছুই হইতে পারে না; অতএব তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এইরূপ যুক্তি অধুনা অনেক লোকের মনকে অধিকার করিয়াছে; সুতরাং আচার্য্য ঋষিগণের যেরূপ অলৌকিক শক্তির বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, তাহা মনুষ্যের পক্ষে একদা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, অনেকেই তাঁহাদের অনুসরণ করিতে নিবৃত্ত হয়েন, এবং যাহারা অনুসরণ করে, তাহাদিগকে বিকৃতমনাঃ অথবা অল্পবুদ্ধি অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া পরিহার করেন।

এই আপত্তি সম্বন্ধে প্রথমতঃ আমাদিগের বক্তব্য এই যে, মনুষ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি কিপরিমাণ আছে, তাহা আপত্তিকারিগণ পরিজ্ঞাত নহেন এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ প্রণিধানও করেন নাই। আকাশে উড্ডীন হওয়া যে মনুষ্যের পক্ষে কথনও সাধ্যায়ত্ত, তাহা পূর্ব্বে কথন কেহ কল্পনাও করেন নাই। শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া, সহস্র সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে, লঙ্কাদ্বীপ হইতে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া যে রামায়ণে উক্তি আছে, তাহা আরব্য উপন্যাসের ন্যায় অলীক বলিয়াই অনেকের ধারণা ছিল। কিন্তু এই অসম্ভব ঘটনা, এক্ষণে, মনুষ্যবুদ্ধির উন্নতিসহকারে, সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। ভূতগ্রামের শক্তিজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে, এক্ষণে নানা স্থানের লোকেরা, এমন কি বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ বেলুন,—এবং অপর আকাশ-

গামী যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে উড্ডীন হইতেছেন। জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, ও ফরাসীদেশের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা, দেশহইতে দেশান্তরে, সহস্র সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে যাইবার উপযোগী বায়বীয় যান নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং এইরূপ যান নির্ম্মাণ করা অসম্ভব বিবেচনা করিতেছেন না। স্থূল চক্ষুদ্বারা আমি সম্মুখস্থিত প্রাচীর ভেদ করিয়া, তদভ্যন্তরস্থ অথবা বহিঃস্থিত বস্তু দর্শন করিতে পারি না; কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এমন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তৎসাহায্যে এই অসম্ভব কার্য্যও সম্পাদিত হইতেছে। বৈদ্যুত শক্তির প্রভাবে সংবৎসরের পথ একদিনে অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে। দূরবীক্ষণযন্ত্র-সাহায্যে দূরস্থিত চন্দ্রমণ্ডলও অনেক পরিমাণে মনুষ্য-দৃষ্টিপথের গোচর হইয়াছে, অণুবীক্ষণযন্ত্র-সাহায্যে নব্য তর্কশাস্ত্রের উল্লিখিত পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মবস্তু নয়নগোচর হইতেছে। এইরূপ নিত্য নিত্যই, পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ ছিল, তাহা সম্ভব বলিয়া গণ্য হইতেছে। সুতরাং আচার্য্য ঋষিদিগের যদ্রূপ জ্ঞানের উল্লেখ আছে এবং যাহা এস্থলে উল্লেখ করা হইল, তাহা এক্ষণে জনসাধারণের মনে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও, এইরূপ জ্ঞান লাভ করা যে মনুষ্যের পক্ষে একদা অসাধ্য, তাহা বলিতে পারা যায় না।

পরন্তু এইস্থলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, এক্ষণে পাশ্চাত্য প্রদেশে, ভূতগ্রামের শক্তিনিচয়ের বিশেষ পর্য্যালোচনা হেতু, অনেক অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হইয়াছে সত্য; কিন্তু ভারতবর্ষে অথবা অন্য কোন স্থানে এইরূপ ভূত-বিজ্ঞানের উন্নতি যে পূর্ব্বে কখনও সংসাধিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং এইরূপ জ্ঞানোদয়, ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কখনও হইয়া থাকিলে, তাহা এক্ষণে লুপ্ত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ নানাপ্রকার ভৌতিক যন্ত্রের

সাহায্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোল্লিখিত অসম্ভব কার্য্যসকল সংসাধিত করিয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য ঋষিগণের যেসকল শক্তির উল্লেখ আছে, তাহাতে এইরূপ কোনও যন্ত্রসাহায্যের উল্লেখ নাই; পক্ষান্তরে তাঁহারা নিজেই, কোন যন্ত্রসাহায্য বিনা, দূরস্থ লোক ও স্থান সকল দর্শন করিতেন, দূরস্থ স্থানে ইচ্ছামাত্র গমন করিতেন এবং তথাহইতে অন্তর্হিত হইতেন, ইত্যাদি নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এইরূপ শক্তি কোনও মনুষ্যের হইতে পারে বলিয়া দেখা যায় না; সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতির দৃষ্টান্তে ঋষিদিগের অভাবনীয় শক্তিমত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

এই আপত্তির উত্তর সংক্ষেপতঃ নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে:—

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষ অপেক্ষা পাশ্চাত্য প্রদেশে ভৌতিক বিজ্ঞানের আলোচনা ও উন্নতি অধিক। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, চিরকালই ভারতবর্ষের এইরূপ অবস্থা ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। এক্ষণে ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা সমালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মিশরদেশ (ইজিপ্‌ট) এককালে অতিশয় উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; তথা হইতে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইয়া, গ্রীক্ জাতিকে উদ্দীপিত করে; পরে গ্রীস্ হইতে রোমান্ জাতি সেই আলোক প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগের দ্বারা সমগ্র ইয়োরোপ খণ্ডে এই আলোক বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু মিশরবাসী এক্ষণে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা পূর্ব্বে যে এইরূপ অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়। গ্রীক্ ও রোমান্ জাতির অবস্থাও এইরূপ। অদ্য যে স্থান, অট্টালিকাশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত হইয়া, আপন সমৃদ্ধি প্রকাশ করিতেছে, শতবর্ষ পরে, হয়ত, তাহা মরুভূমিতে পরিণত হইবে এবং তাহার

সৌভাগ্যের কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্নও অবশিষ্ট থাকিবে না। ইহাই জগতের নিয়ম বলিয়া সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। দেড়শত বৎসরও অতীত হয় নাই, ভারতবাসী পাশ্চাত্য প্রদেশের শাসনাধিকারে আসিয়াছে; এই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের যেরূপ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, কেবল তাহাই স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে অতীতকালের অবস্থা সম্যক্ অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে সাধারণতঃ ভারতবাসীর ধারণা এই যে, সমুদ্রযাত্রা তাঁহাদের দেশাচারের ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ এবং ভারতবাসী সমুদ্রযাত্রা করিয়া, পূর্ব্বে দেশ-দেশান্তরে কখনও যাইতেন না এবং ইংরেজেরা এতদ্দেশে আসিয়া, সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষম অর্ণবপোতসকল ভারতবাসীকে প্রথম প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইংরাজী শিক্ষালাভে যাঁহারা স্বীয় সনাতন ধর্ম্মের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাই, পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণ করিয়া, বিদেশীয় অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক দেশদেশান্তরে গমন করিতেছেন। পাশ্চাত্যপ্রদেশবাসিগণ আসিবার পূর্ব্বে যে এই দেশে অর্ণবপোত কখনও ছিল, তাহা বর্ত্তমান ভারতবাসিগণ মনেও কল্পনা করিতে পারেন না। কিন্তু, সৌভাগ্যবশতঃ, ইংরাজগণ এদেশ অধিকার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বকালের অবস্থা বিষয়ে অবগত হইবার উপায়সকল অদ্যাপি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এদেশের তাৎকালিক অবস্থা-বিষয়ক গ্রন্থ অদ্যাপি কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে এবং তৎকালের ইংরাজগণও, কেহ কেহ, স্বরচিত গ্রন্থে ও শাসন-বিষয়ক বিবরণে এদেশের অবস্থা কিছু কিছু বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, ঊনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর প্রথমভাগেও ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক বৃহৎকায় অর্ণবপোত ছিল; সে সকল অর্ণবপোত পাশ্চাত্যপ্রদেশের অর্ণবপোত অপেক্ষা অশেষগুণে শ্রেষ্ঠ ও দৃঢ় ছিল। ইংরাজ-অধিকার

এই দেশে প্রবর্ত্তিত হইবার পরেও, ভারতবাসিগণ নিজনির্ম্মিত অর্ণবপোত সকলে আরোহণ করিয়া, ইংলণ্ডপ্রভৃতি দূরদেশে গমনপূর্ব্বক বাণিজ্য করিতেন। কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত বহুসংখ্যক অর্ণব-পোত ভারতসমুদ্রের উপকূলসকল সুশোভিত করিত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে, ভারতের পূর্ব্ববৃত্তান্ত আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তাহাতেই এই সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে; নতুবা বর্ত্তমান ভারতবাসী প্রায় কেহই এই সংবাদ অবগত ছিলেন না। পূর্ব্ববাঙ্গালার তন্তুবায়-সকল যেসমুদায় উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিত, তাহা বিদেশীয়দিগের অননুকরণীয় ছিল এবং তাহার যেসকল আদর্শ কখন কখন এযাবৎও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অদ্যাবধি পাশ্চাত্যপ্রদেশবাসীদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের অনেক লোকের মনে এইরূপই একপ্রকার ধারণা ছিল যে, পাশ্চাত্য-প্রদেশবাসিগণ এদেশে আসিয়াছেন বলিয়াই যেন ভারতবাসিগণ, নানাবিধ বস্ত্র পরিধান করিয়া, লজ্জা নিবারণ এবং শীতাতপ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহাদিগের কোনও বিষয়ে কোনপ্রকার সামর্থ্য যে কখনও ছিল, তাহাই মনে বিশ্বাস করা কঠিন হইত এবং এযাবৎও অনেকের মনের এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। কিন্তু এই দেশ, পাশ্চাত্যবাসিগণের অধিকারে আসিবার পূর্ব্বে, স্বপ্রতিষ্ঠ ছিল, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ভারত-বাসীর সকল অভাব, ভারতবর্ষে জাত ও নির্ম্মিত বস্তুদ্বারা, পূরণ হইত। ইহাদিগের বস্ত্রাভরণের চাকচিক্য, ইহাদিগের সভাগৃহের সৌন্দর্য্য, ইহাদিগের অট্টালিকাসকলের দৃঢ়তা এবং সুদর্শনতা, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বেও, সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলকে চমৎকৃত করিয়া রাখিয়াছিল। অদ্যাপি তাজমহলপ্রভৃতি অট্টালিকার সৌন্দর্য্য অপর সকলজাতীয় লোকের পক্ষে

অননুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বিজাপুরে যে ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বসময়ের এই-দেশকৃত কামান বিদ্যমান আছে, তাহার ব্যাস ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি; তাহা ১৫ ফুট লম্বা এবং তাহা প্রায় ১১০০ শত মণ ভারি; তদপেক্ষা বৃহত্তর কামান পাশ্চাত্যখণ্ডেও অদ্যাপি বিরল। এইরূপ আরও অসংখ্য বিষয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরাজাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ভারতবাসিগণ নানাপ্রকার রাজবিপ্লবে প্রপীড়িত হইলেও, অপর কোন জাতীয় লোক অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য, বাণিজ্য, ধনমর্য্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে হীন ছিলেন না। কিন্তু এই দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বের যেসমস্ত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তাহা কোন কারণ বশতঃ লুপ্ত হইয়া গেলে, এই দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের অবস্থাও জানিবার কোন উপায় থাকিত না। তাহাতে পঞ্চ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবাসীর অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা এইক্ষণকার ভারতবর্ষের অবস্থা দ্বারা নিরূপণ করা যে আরও কঠিন, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। আমাদের প্রাচীন আর্য্য ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, পঞ্চশত শতাব্দী * পূর্ব্বে, কালপ্রেরিত হইয়া, ভারতভূমির সমগ্র রাজন্যবর্গ, স্বীয় স্বীয় বীরবাহিনী-সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সম্মিলিত

* ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর গ্রহাচার্য্যেরা পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং নববর্ষারম্ভসময়ে বৎসরের ফলাফল গ্রামবাসী সকলে গ্রহাচার্য্যের নিকট শ্রবণ করেন এই পদ্ধতি প্রাচীনকালহইতে এই দেশে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। যুধিষ্ঠিরহইতে গণনা করিয়া কলিকালের আয়ুঃসংখ্যায় পঞ্জিকা সকলে বৎসর বৎসর এক এক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। সুতরাং যুধিষ্ঠিরাব্দার স্থিতিপরিমাণ বিষয়ে বিশেষ ভুল হইবার সম্ভাবনা অল্প। এতদ্দেশীয় পঞ্জিকানুসারে, এক্ষণে ইহার ৫০১১ বৎসর চলিতেছে। দুঃর্য্যোধন কলির অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অপরাপর অসুরেরাও, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া, কলিকাল প্রবৃত্ত হইলে, আবিভূত হইয়াছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রবিচারেও জানা যায় যে, দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের কিছু পূর্ব্ব হইতেই কলিকাল প্রাদুর্ভূত হয়। রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ আছে যে, কলির ৬৫৩ অব্দে যুধিষ্ঠির জন্ম গ্রহণ করেন। ইত্যাদি আরও প্রমাণ-দ্বারা জানা যায় যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ প্রায় ৫০০০ বৎসর হইল হইয়াছে।

হইয়া, পরস্পর আঘাতপ্রতিঘাতপূর্ব্বক নিধন প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার অল্প দিন পরেই প্রভাস ক্ষেত্রে যদুবীরগণ সংগ্রামে মিলিত হইয়া,এই ভারত-ভূমিকে একেবারেই বীরশূন্যা করেন। ঐ ক্ষত্রিয়কুলবিধ্বংসী ব্যাপারের পরে অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎ এবং তৎপুত্র জনমেজয় পর্য্যন্তই, ভারতবর্ষে একচ্ছত্রী চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে, কলিপ্রভাব-বৃদ্ধির সহিত, রাজগণ হীনবীর্য্যতা প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন এবং পরস্পরের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়া, আপন আপন শক্তি ক্ষয় করিতে থাকেন। ইঁহারা, এইরূপ পরস্পর সংঘর্ষে, ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, বিদেশবাসী কূটযোদ্ধৃগণ, কালস্রোতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, দলে দলে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন ও অপহরণ করিয়া, পরে এই দেশ সম্যক্ অধিকারকরতঃ স্বীয় প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন। ইঁহারা কেবল বিদেশবাসী ছিলেন এইরূপ নহে, পরন্তু ইঁহারা বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীও ছিলেন; অধিকন্তু প্রাচীন হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ও কীর্ত্তি বিলুপ্ত করা, ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকের অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্ম কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। এইরূপ এক শ্রেণীর বিজাতীয় রাজার পর অপর শ্রেণীর বিজাতীয় রাজা, পৃথিবীকে শোণিত-প্লাবিত করিয়া, ভারতভূমিকে সর্ব্বত্র দীর্ঘকালব্যাপী অশান্তিতে পূর্ণ করিয়া রাখেন। সহস্রবর্ষব্যাপী এইরূপ বিশৃঙ্খলতার মধ্যে থাকিয়া যে ভারতবাসী আত্মোন্নতিসাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন এবং তাঁহাদের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ যে লোপ প্রাপ্ত হইবে, ইহা কি বিচিত্র কথা? এক্ষণে সর্ব্ব-বিধ ধনরত্নাদিবিবর্জ্জিত হইয়া, ভারতভূমি একেবারে দারিদ্র্যপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে; দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এই দেশকে নিয়ত আবাসভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবাসীর মানসিক তেজস্বিতাও

নানাবিধ কারণে অস্তমিতপ্রায় ; ব্রাহ্মণগণ দ্বারে দ্বারে ভিখারী ও অবজ্ঞাত, ভূস্বামিগণ কম্পিত-কলেবরে অবস্থিত, ব্যবসা বাণিজ্য বিলুপ্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মসীবৃত্তি দ্বারা কষ্টের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত। সমাজশৃঙ্খলাসকলও এক্ষণে বহুল-পরিমাণে ভগ্ন হইয়াছে এবং ভারতবাসী সম্প্রতি এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, পূর্ব্বে যে তাঁহাদের নিজের গৌরবের বিষয় কিছু ছিল, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ নহেন। * কিন্তু প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দু জাতি যে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, সহস্রাধিকবর্ষব্যাপী এইরূপ দুর্গতিদ্বারা প্রপীড়িত হইয়াও, এই জাতি এযাবৎ লোপ প্রাপ্ত হয় নাই এবং এযাবৎ পৃথিবীমণ্ডলের

* ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার প্রারম্ভে ভারতবর্ষে যেসকল সমৃদ্ধি বর্ত্তমান থাকা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ইংরাজ শাসনকালে কিরূপে বিলুপ্ত হইল, তাহার বিশেষ সমালোচনা করা এই গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক। রাজশক্তির অপব্যবহারই ইহার কারণ বলিয়া অনেকে এক্ষণে নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই মীমাংসায় আংশিক সত্য থাকিতে পারে; কিন্তু স্থিরচিত্তে সমুদায় বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, কেবল রাজশক্তির অপব্যবহারই বর্ত্তমান অবনতির একমাত্র কারণ নহে; ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে নানাবিধ বিপ্লবে ভারতবাসী প্রপীড়িত হওয়াতে, তাঁহাদের স্বধর্ম্ম ও স্বজাতিনিষ্ঠা এবং জ্ঞানানুশীলনের হ্রাস হইয়া পড়ে এবং তাঁহাদের চরিত্রবল ও তেজস্বিতা অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। আমাদের বর্ত্তমান অবনতির ইহাও একটি প্রধান কারণ। বস্তুতঃ এই মুখ্য কারণ বিদ্যমান না থাকলে, ইংরাজশাসন এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারিত না। তদ্ভিন্ন দৈব-নিগ্রহও আর একটি বলবৎ কারণ। এতৎসম্বন্ধে ইংরাজ শাসনের যে সমস্ত দোষ আছে, তাহা পর্য্যালোচনা করাতে এক্ষণে কোনও ফল নাই। ইহাতে কেবল প্রতিহিংসাবৃত্তির বৃদ্ধি হইবে। তদ্দ্বারা, বর্ত্তমান দুরবস্থার হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, বরং অশান্তিই আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এই বিষয় বিচার করিতে গিয়া ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এক্ষণে ঘোর কলিকাল প্রবর্ত্তিত; এই কালে কেহ উচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, নিজ সাংসারিক কল্পিত স্বার্থসাধনের নিমিত্ত এই ক্ষমতার ন্যূনাধিক পরিমাণে অপব্যবহার করে না এমন লোক সকলদেশেই অতি বিরল।

অন্য কোনও জাতির সহিত তুলনায়, প্রকৃতমনুষ্যত্ব বিষয়েও ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় নাই।

যাহা হউক, যদিও বর্ত্তমানে ভারতের পূর্ব্বোন্নতির প্রমাণ সচরাচর দৃষ্ট হয় না, তথাপি এযাবৎ যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তৎপ্রতি বিশেষ প্রণিধান করিলে, ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতে পারে যে, ভৌতিক-বিজ্ঞানসম্বন্ধে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ বর্ত্তমান সময়ে যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতবাসিগণ তদ্বিষয়ে এতদপেক্ষা কোন অংশে অল্প উন্নত ছিলেন না।

প্রথমতঃ,—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যেরই উন্নতির পরিচয় তাঁহাদিগের ভাষাবিচারে অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে পরিমাণে জ্ঞানের বিকাস হইতে থাকে, ভাষারও উন্নতি সেই পরিমাণে হয়; কারণ ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে সাধারণতঃ কোন চিন্তাই হইতে পারে না। বিশেষতঃ চিন্তা প্রকাশ করিতে হইলে, সকলের বোধগম্য ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। চিন্তাশক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার উন্নতি অনিবার্য্য এবং ভাষাই সচরাচর চিন্তার উন্নতির অনুমাপক। এক্ষণে পৃথিবীমণ্ডলে যত ভাষা পরিজ্ঞাত ও প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বপ্রধান। পাশ্চাত্য-দেশবাসী ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীমণ্ডলের যাবতীয় ভাষা তুলনা করিয়াও এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষা যথার্থই অপর সকল ভাষা হইতে শ্রেষ্ঠ। এমন কোনও চিন্তাস্রোত এযাবৎ মনুষ্যহৃদয়ে প্রবাহিত হয় নাই, যাহা সংস্কৃত ভাষায় উত্তমরূপে প্রকাশিত করা যায় না। সংস্কৃত ভাষার ধাতুসকল এমন ব্যাপক-অর্থ-যুক্ত যে, মনুষ্যজাতির কোন প্রকার শারীরিক অথবা মানসিক ব্যাপার ইহাদের ব্যঞ্জনার-বহির্ভূত নহে। যাঁহাদিগের ভাষা এই "দেবভাষা" সংস্কৃত—তাঁহাদিগের উন্নতির পরিচয় কি আর অধিক

দেওয়া প্রয়োজন? কেবল সংস্কৃত ভাষা নহে, সংস্কৃত বর্ণমালা যেরূপ বৈজ্ঞানিক কৌশলে গঠিত এবং যেরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত, তাহা আর কোন ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে কি প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যদিগের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হয় না?

দ্বিতীয়তঃ,—কবিত্বশক্তি, বর্ণনাশক্তি, মনুষ্যপ্রকৃতির অভিজ্ঞান প্রভৃতি যদ্রূপ মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকটিত আছে, তাহার উপমাস্থল কি অন্যত্র কোন জাতীয় গ্রন্থে আছে? কবিতার যে সকল ছন্দ সংস্কৃতভাষায় প্রচলিত আছে, তাহারই উপমাস্থল অন্যত্র নাই। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থসকল লুপ্তপ্রায়; তন্মধ্যে যে কিছু অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহারই তুলনা জগতীমণ্ডলে অপ্রাপ্য। আধুনিক কবি কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থই এক্ষণে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পরন্তু সাধারণ সাহিত্যসম্বন্ধে যদি কোনপ্রকার তর্কিত বিষয় থাকে, তথাপি দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধে ত কোন প্রকার আপত্তিরই স্থল নাই। ভারতবর্ষে প্রচলিত শ্রুতিসকল অপৌরুষেয়; সুতরাং তাহার তুলনাস্থল হইতেই পারে না। কিন্তু জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় প্রতিপাদক সাংখ্যজ্ঞান এবং বৈদান্তিক ব্রহ্মবিদ্যারও কি আর কোন স্থানে উপমা আছে? ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডেও এক্ষণে, ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার উৎকর্ষ মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইতেছে। ভারতের প্রাচীনকালের সর্ব্ববিষয়ে উন্নত অবস্থার কি ইহা যথেষ্ট পরিচয় নহে? যাঁহাদের মানসিক তেজস্বিতা এত অধিক ছিল, তাঁহারা কি জড়জগতের ব্যাপার বিষয়েও জ্ঞানলাভ করিতে একদা উদাসীন ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায়? জীব, সাধারণতঃ, জড়জগৎকে আয়ত্ত করিতেই প্রথমে চেষ্টা করে; তৎপরে ক্রমশঃ অন্তর্ম্মুখীন হইতে আরম্ভ করে। ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডের দৃষ্টান্তই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। এই স্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জগৎ-তত্ত্ব সম্যক্

জ্ঞাত না হইলে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না বলিয়া, সাংখ্যকার জগৎ-তত্ত্বই অধিক বিস্তৃতরূপে সাংখ্যদর্শনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব জগতের জ্ঞানলাভ বিষয়েও ভারতবাসী উদাসীন ছিলেন না।

তৃতীয়তঃ,—সঙ্গীত-বিদ্যা মনুষ্যজাতির উন্নতির আর একটী পরিমাপক। ভারতবর্ষে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী এবং তাহার সঙ্কর অপরাপর অসংখ্য রাগরাগিণী, যাহা বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসীর মানসিক বিকাসের পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে, তাহাহইতে শ্রেষ্ঠ কোন রাগরাগিণী অদ্যাবধি কোন জাতিতে প্রকাশ পাইয়াছে কি? শব্দবিজ্ঞানের যে বহুল চর্চ্চা পাশ্চাত্য প্রদেশে অধুনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে, সম্প্রতি কেহ কেহ অবগত হইয়াছেন যে, সঙ্গীতসকলের মূর্ত্তি আছে,—রাগরাগিণী সকল অমূর্ত্তক নহে। মার্গারেট্ ওয়াট্‌স্ হিউজেস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঈডফোন ভয়েস ফিগার্স্ (Eidophone voice figures) নামক পুস্তকে ইউরোপীয় অনেক সঙ্গীতের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইসকল মূর্ত্তি প্রবাল, পুষ্প প্রভৃতির আকৃতিসদৃশ; কিন্তু প্রাচীন ভারতবাসী আর্য্যগণ এই শব্দবিজ্ঞানে এতদূর পারদর্শী হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীত-স্বর-মূর্ত্তি কোন্‌টি পুরুষ, কোন্‌টি স্ত্রী, কোন্‌টির কোন্ বর্ণ, কোন্‌টির কি অবয়ব, কোন্‌টির বালকমূর্ত্তি, কোন্‌টির প্রৌঢ়মূর্ত্তি, কোন্‌টির বার্দ্ধক্যা-বস্থায় উপনীত মূর্ত্তি, কোন্‌টির ক্রোধাবিষ্টমূর্ত্তি, কোন্‌টির শান্তমূর্ত্তি, কোন্‌টির হাস্যময়মূর্ত্তি, কোন্‌টির নির্ব্বেদযুক্তমূর্ত্তি—এতৎ সমস্ত অবধারণা করিয়া, ইহা-দিগকে পুংস্ত্রী এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং ইহাদিগের বিমিশ্রণে যে যে সঙ্করমূর্ত্তি সকল আবির্ভূত হয়, তাহাও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; বিশেষ বিশেষ কালে, যেসকল বিশেষ বিশেষ ভাব মানবীয় অন্তরে সাধারণতঃ প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার বিশেষরূপে উপযোগী স্বরগ্রামসকল অবধারিত করিয়া, তাহার ব্যবহার নিয়মিত করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয়

সঙ্গীত অতি উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত হওয়াতে, ইহাদের মূর্ত্তিসকল নানাবিধ ভাবময় দেবতা ও মনুষ্যমূর্ত্তি।* কিন্তু এই সঙ্গীত-বিদ্যাও এক্ষণে লুপ্ত-প্রায়; কারণ, ভারতবাসী বহুকাল হইতে আনন্দবিহীন হইয়াছেন; সুতরাং সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনার যে হ্রাস হইবে, ইহা কি বিচিত্র বিষয়? এক্ষণে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম প্রভৃতি সপ্তবিধ স্বর এবং উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত এই তিনটি গ্রাম সঙ্গীতের আছে এবং বীণাপ্রভৃতি যন্ত্রে, এই সকল অবলম্বন করিয়া, ঘাট বাঁধান হয়; এই মাত্র গায়কদিগের অবগতি আছে এবং গায়কগণ যন্ত্রের সহিত মিলন করিয়া, এই সকল অভ্যাস করিয়া থাকেন। কিন্তু এইসকল গ্রামের উৎপত্তিস্থান দেহ-মধ্যে কোন্‌টির কোন্ প্রদেশে আছে, তদ্বিষয়ে বিজ্ঞানবেদী গায়কই এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। সহস্রের মধ্যে যদি একটি গায়ক তাহা অবগত থাকেন, তবে তাঁহার তৎসম্বন্ধে জ্ঞানও কেবল মুখস্থ বিদ্যা; ইহা তাঁহার অনুভবের বিষয় নহে। এইসকল প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে যে সকল সাধনের প্রয়োজন, তাহা এই দুর্দ্দৈবপীড়িত ভূমিতে এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যাহাহউক, এই অবস্থায়ও, সঙ্গীতের জ্ঞান এক্ষণে ভারতবর্ষে যাহা আছে, তাহা অন্যত্র কোথায়ও অতিক্রান্ত হয় নাই। ইহা কি ভারতবর্ষে শব্দবিদ্যার উন্নতির ও ভারতবাসীর প্রাচীন উৎকর্ষের একটি অকাট্য প্রমাণ নহে?

চতুর্থতঃ—জ্যোতিঃশাস্ত্র, ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক ও মহাসামুদ্রিক বিদ্যার যে অংশ এই দেশে অদ্যাপি অবশিষ্ট আছে, এযাবৎ অপর কোন দেশীয় লোক তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। জ্যোতির্ম্মণ্ডলের বিজ্ঞান, যাহা ইউরোপ খণ্ডে আছে, তৎসমস্তই ভারতবর্ষে এযাবৎ বর্ত্তমান আছে।

* এতৎসম্বন্ধে আরও বিশেষ তথ্য এই গ্রন্থের উপসংহারনামক শেষ অধ্যায়ে প্রকাশিত করা হইয়াছে।

পরন্তু ভারতবর্ষে এইসকল বিদ্যার অবশিষ্টাংশ, যাহা এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, তাহা অন্যত্র নাই। তবে ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ে সাধারণতঃ এইরূপ আপত্তি করা হয় যে, ভারতবাসিগণ সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহাদি পিণ্ডকে জীবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াই, তাঁহাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ, নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতবাসিগণের এই সংস্কার অজ্ঞতার পরিচয় দেয় না; পরন্তু ইহা তাঁহাদের অপরিসীম জ্ঞানবত্তারই পরিচয় প্রদান করে। পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ জীব জন্তুর উপর আকাশমার্গস্থিত যে ভৌতিক পিণ্ড সকল কার্য্য করে, তাহাদের কার্য্যভেদে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ, তাহাদিগকে নানা, শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভারতবাসীরা উচ্চবিজ্ঞানবলে জানিয়াছিলেন যে, এ জগতে কোন বস্তুই সম্পূর্ণ চৈতন্যবিহীন নহে। জড় ও চৈতন্যের বিমিশ্রণে এই সম্যক্ জগৎ প্রকাশিত। এক্ষণে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, সমুদয় পাশ্চাত্যবাসী পণ্ডিতদিগের নিকট প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের এতৎ সম্বন্ধীয় উক্তি মিথ্যা মনে করিবার কোন কারণ নাই; প্রত্যুত তাহা সত্য বলিয়াই অনুমিত হয়। আর্য্য ঋষিগণ, পৃথিবীমণ্ডলনিহিত চৈতন্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এই পৃথিবীরও জীবসংজ্ঞা দিয়াছেন। এইরূপ তাঁহাদের মতে সূর্য্য জীব, চন্দ্র জীব, মঙ্গলাদি গ্রহ্ জীব, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রসকল জীব, এবং সমগ্র আকাশমণ্ডল জীবময়। যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ড আকাশে লক্ষিত হয়, তাহা তত্তন্নিহিত জীব-চৈতন্যের বহির্ব্বপু। মনুষ্যের দেহও জড়; কিন্তু তাহার অন্তরে জীবচৈতন্য প্রবিষ্ট থাকাতেই, তাহাকে জীব বলা যায়। জড় শরীরের দ্বারা যেরূপ কার্য্য যে জীব সম্পাদন করেন, এই জড় শরীরের যেরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি, তদনুসারেই তাহার নাম ও জাতিসংজ্ঞা হয়। প্রাচীন ঋষিগণও

তদনুসারে আকাশস্থ ভৌতিক পিণ্ডসকলের আকৃতি এবং ফলোৎপাদিকা শক্তি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাহাদিগকে নানাশ্রেণীর জীবরূপে আখ্যাত করিয়াছেন। তাঁহারা কোন কোন পিণ্ডকে গ্রহ আখ্যা দিয়াছেন. যেমন আদিত্যাদি নবগ্রহ; কতকগুলি পিণ্ডকে দিক্‌পাল আখ্যা করিয়াছেন যেমন ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল; কোন কোন পিণ্ডকে বসু আখ্যা করিয়াছেন, যেমন ভব, ধ্রুব ইত্যাদি; কোন কোন পিণ্ডকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন শিবাদি পঞ্চদেব; কোন কোন পিণ্ডকে ধর্ম্মাধিষ্ঠাতা ঋষি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন মরীচ্যাদি; আবার কোন কোন পিণ্ডকে নক্ষত্র বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, যেমন অশ্বিন্যাদি। এইরূপে এই সকল জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ডধারী জীব সকল কেহ দেবতা, কেহ অসুর, কেহ রাক্ষস. কেহ যক্ষ, ইত্যাদি নানাপ্রকার জাতিতে ঋষিগণকর্ত্তৃক শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছেন। পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য জীব বাস করে, তদ্রূপ গগনস্থ এইসকল জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ডেও অসংখ্য জীবের বসতি আছে। এই সকল জীবের সাধারণ প্রকৃতি তাঁহাদের আশ্রয়ীভূত জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ডধারী জীবের প্রকৃতির অনুরূপ। পৃথিবীমণ্ডলস্থ জীবসমূহের উপর গগনমণ্ডলস্থ গ্রহাদি জীবসকল যেরূপ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত অবগত হইয়া, ঋষিগণ পৃথিবীস্থ জীবসকলের কর্ম্ম ও ভাগ্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত অতি সহজ সহজ সাঙ্কেতিক নিয়মসকল উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ সমস্ত জগন্মণ্ডল তাঁহাদিগের জ্ঞানের এত সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত হইয়াছিল যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁহারা “করতলস্থ আমলকবৎ” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। *এক্ষণে এই সমস্ত জ্ঞান লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু জ্যোতির্ম্মণ্ডলের কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানসাহায্যে মনুষ্যের জন্ম, কর্ম্ম ও ভাগ্য গণনার নিমিত্ত যে সমস্ত সহজ সাধারণ সঙ্কেত তাঁহারা

প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এযাবৎ সম্যক্ বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই। কোন কোন স্থানে, অশিক্ষিত গ্রহাচার্য্য জাতি, স্বীয় উপজীবিকার নিমিত্ত, তাহার কোন কোন অংশ রক্ষা করিয়াছে এবং সাধারণ যোগ-বিয়োগমাত্রগণিতজ্ঞ হইয়াও, এইজাতীয় লোকেরা অদ্যাপি মনুষ্যের জন্ম, কর্ম্ম ও ভাগ্য অবধারণ করিতে যেরূপ অনেক স্থলে সমর্থ হয়, তাহা দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি প্রাচীন আর্য্যদিগের অপারিসীম জ্ঞানবত্তার বিষয় চিন্তা করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন? অবশ্যই সকল স্থানে প্রকৃত অবস্থার সহিত গ্রহাচার্য্যদিগের গণনার মিল হয় না; কিন্তু অনেক স্থলে মিল হইয়াও থাকে; ইহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ গণৎকারেরা সাধারণতঃ অতি অশিক্ষিত লোক; জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন জ্ঞানই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না এবং তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক সঙ্কেতই শিক্ষা করিতে পারেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রবিষয়ক মূল গ্রন্থসকল প্রায় সমুদয়ই এক্ষণে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে; যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহারও কিয়দংশ মাত্র একজনের নিকট, অপর কিয়দংশ অপর একজনের নিকট, এবং অপরাংশ অপরের নিকট, এইরূপ ভাবে বিশৃঙ্খলরূপে নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে এবং যাহার নিকট যে অংশটুকু আছে, সেও সেই টুকু গোপন করিয়া রাখে; তাহার ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে বিবেচনায়, অপরকে সে তাহা দেখিতে বা জানিতে দেয় না। ভৃগুসংহিতা, জ্যোতিঃশাস্ত্রের একখানি অতি প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ; কিন্তু তাহার অত্যল্পাংশ মাত্র বহু চেষ্টায় এক্ষণে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; গ্রন্থের অধিকাংশের কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় বর্ত্তমান অশিক্ষিত গণৎকার-দিগের সকল গণনা যে ঠিক হইবে, ইহার আশা করাও অনুচিত। কিন্তু তথাপি এই অশিক্ষিত গ্রহাচার্য্যগণও কখন কখন যেরূপ গণনা করিতে পারেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে:—

আমার ১৭ বৎসর বয়সের সময়ে, আমার পিতা গ্রহাচার্য্যদিগের দ্বারা আমার এক কোষ্ঠী প্রস্তুত করান; আমার জন্ম অধিক রাত্রে পল্লীগ্রামে হইয়াছিল এবং তৎকালে কোন ঘটিকাযন্ত্রের ব্যবহার ঐ গ্রামে ছিল না; অনুমান করিয়া আমার জন্মসময় তিনি গণৎকারদিগকে বলিয়াছিলেন; তদনুসারেই গণনা করিয়া, তাঁহারা আমার কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। প্রায় ছয় বৎসর হইল, আমার জনৈক ওকালতি-ব্যবসায়ী শিক্ষিত বন্ধু—যিনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তিনি—আমার ঐ কোষ্ঠী দেখিয়া, এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, আমার জন্মকাল ঐ কোষ্ঠীতে ঠিকরূপে লেখা হয় নাই, সুতরাং জন্মের লগ্ন অশুদ্ধ হইয়াছে; কারণ, কোষ্ঠীতে যেরূপ জন্মলগ্ন উল্লিখিত আছে, তাহা প্রকৃত হইলে, আমার জীবনের অবস্থা ও আমার প্রকৃতি, তিনি যেরূপ অবগত আছেন, তদ্রূপ হইত না। সুতরাং আমার সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি নারায়ণজ্যোতির্ভূষণনামক কলিকাতার একজন প্রধান জ্যোতিঃশাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতকে আমার কোষ্ঠীখানি দেখিতে দেন; তিনি কয়েক দিবস ধরিয়া বিচার করিয়া বলিলেন যে, কোষ্ঠীর গণনায় ভুল আছে; লগ্ন ঠিক হয় নাই; কোষ্ঠীর লিখিতরূপে জন্মের "মীন" লগ্ন না হইয়া "কুম্ভ" লগ্ন হইবে। ইনি গ্রহাচার্য্যজাতীয় নহেন; অতি সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ। আমার উকিল বন্ধু তাঁহার সহিত আলাপ করাতে, কোষ্ঠীর শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁহার অধিকতর সন্দেহ জন্মিল; কিন্তু তিনি বলিলেন যে, ইহাদ্বারাও তাঁহার সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই; শশী আচার্য্য নামে একব্যক্তি সামুদ্রিক শাস্ত্র কিঞ্চিৎ অবগত আছেন; কলিকাতা সহরে বহুবাজার নামক-স্থানে থাকিয়া, তিনি ঐ ব্যবসা করেন; তিনি, করতলমাত্র দেখিয়া, তাঁহার জ্ঞাতসারে অনেক স্থলে অতি অদ্ভুতরূপে জন্মলগ্ন স্থির করিয়াছেন; এজন্য তিনি তাঁহাকে আমার

কলিকাতাস্থ বাটীতে আনিয়া তাঁহাদ্বারা আমার হাত পরীক্ষা করাইতে ইচ্ছা করেন। এই শশী আচার্য্যের কথা আমি বহুকাল পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম এবং প্রায় ১৪ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে, তদ্দ্বারা আমার করতল পরীক্ষা করাইয়াছিলাম; কিন্তু তখন তিনি আমার করতল দেখিয়া, জন্মমুহূর্ত্ত অবধারণ ক'রতে পারেন নাই; এমন কি, যে বৎসরে আমার জন্ম, সেই বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। সুতরাং আমি তাঁহাদ্বারা আর কিছু গণনা করাই নাই। অতএব আমার বন্ধু ঐ শশী আচার্য্যকে আমার হাত দেখাইবার প্রস্তাব করাতে, আমি তাঁহাকে ঐ বৃত্তান্ত বললাম। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, একবার গণনায় ভুলও হইতে পারে; কিন্তু হাত দেখিয়া যে ঐ আচার্য্য জন্মলগ্ন অবধারণ করিতে পারে, তাহা তিনি স্বচক্ষে অনেক স্থলে দেখিয়াছেন, এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাহার গণনাশক্তির উন্নতিও হইয়া থাকিতে পারে। আমি আমার বন্ধুর অনুরোধে তাঁহাকে আনাইতে সম্মত হইলাম, এবং অবধারিত সময়ে তিনি আমার বাটীতে আসিলেন; আমি তাঁহাকে পূর্ব্বদৃষ্ট শশী আচার্য্য বলিয়াই জানিতে পারিলাম। তখন আমার বন্ধু তাঁহাকে আমার হাত দেখিয়া আমার জন্মলগ্ন স্থির করিতে বলিলে, আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, তিনি অনেক দিন পূর্ব্বে আমার হাত একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তখন তিনি আমার জন্মসময় স্থির করিতে পারেন নাই। ঐ ব্যক্তি ব্যবসায়ী লোক; সুতরাং তিনি প্রথমতঃ এই কথা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিলেন না, এবং গণনা বিষয়ে তাহার অনেক কীর্ত্তির কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি তাহাকে নিশ্চিতরূপে বলিলাম যে, আমি তাঁহাকে বিশেষরূপ জানি ও পরিচয় করিয়াছি; আমি পূর্ব্বে অন্য বাটীতে থাকিতাম, তথায় তাঁহাকে আনাইয়া আমার হাত দেখাইয়াছিলাম; তখন তিনি আমার জন্মসময় স্থির করিতে পারেন নাই। তখন সেই গণৎকার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া,

জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার স্ত্রী এইখানে আছেন কিনা, এবং তাঁহার কোষ্ঠী আছে কিনা। আমার স্ত্রীর কোষ্ঠী ঐ সময়ের এক বৎসর কাল পূর্ব্বে, আমার জন্মস্থানে, কলিকাতাহইতে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে, আমি প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, এবং ঐ কোষ্ঠী আমার স্ত্রীর কাছে ছিল; কলিকাতায় কাহাকেও দেখান হয় নাই; আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুও তাহা পূর্ব্বে দেখেন নাই। আমার স্ত্রী তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন; সুতরাং আমি বলিলাম যে, তিনি তথায় আছেন এবং তাঁহার কোষ্ঠীও আছে। তখন শশী আচার্য্য বলিলেন যে, আমার হাত দেখিয়া, তিনি প্রথমে আমার স্ত্রীর জন্মকাল অবধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন; তাহাতে যদি কৃতকার্য্য হয়েন, তবে পরে আমার জন্মকাল গণনা করিবেন; কারণ আমার সম্বন্ধীয় গণনায় তিনি এক-বার অকৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া আমি প্রকাশ করিয়াছি; তাহাতে তিনি অনুমান করেন যে, আমার হাতের রেখাতে কোনপ্রকার বিশেষ ব্যতিক্রম থাকিবে। আমি তাঁহার প্রস্তাবে খুব আগ্রহের সহিত সম্মত হইলাম। তখন তিনি আমার দক্ষিণ করতল মিনিট দুই কাল স্থিরচিত্তে পরীক্ষা করিয়া, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাধারণ যোগ, বিয়োগ দুই চারিটি অঙ্ক পাত করিলেন, এবং আমার স্ত্রীর জন্মের সংবৎসর, মাস, তারিখ, বার ও মুহূর্ত্ত স্থির করিয়া এবং তাঁহার জন্মের রাশিচক্রটি কাগজে অঙ্কিত করিলেন; তৎপরে আমাকে, আমার স্ত্রীর কোষ্ঠীখানি আনিয়া, তাহার সহিত মিলাইয়া, তাঁহার গণনা মিলিয়াছে কি না, দেখিতে বলিলেন। আমি আমার স্ত্রীর কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখিলাম যে, তাঁহার জন্মের সন, মাস, তারিখ, বার, মুহূর্ত্ত, এবং রাশিচক্র অবিকল ঠিক ঠিক অবধারিত করিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। গণৎকারও খুব উৎসাহান্বিত হইয়া, আমার নিজের জন্মলগ্ন অবধারণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় অঙ্কপাত করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার জন্মবৎসর পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া

বলিতে পারিলেন না; তখন কিছু অপ্রতিভ হইয়া, আমার করতল বারংবার টিপিয়া দেখিয়া বলিলেন যে, আমার হাতের চর্ম্ম অতিশয় পুরু, তাহা টিপিলে চর্ম্মের নীচে একটি রেখা লুক্কায়িত আছে বলিয়া অনুমান হয়; সেই একটি রেখা আছে মনে করিয়া, তিনি আর একবার অঙ্কপাত করিয়া দেখিবেন; যদি তাহাতে জন্মসংবৎসর মিলাইতে পারেন, তবে অন্য গণনা করিবেন; নতুবা তাঁহাদ্বারা আমার কার্য্য হইবে না। এইরূপ বলিয়া তিনি পুনরায় অঙ্কপাত করিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরেই আমার জন্মের বৎসর অবধারণ করিলেন। আমি দেখিলাম তাহা ঠিক মিলিয়াছে। তখন তিনি উৎসাহিত হইয়া, পরে আমার জন্মমাস, তিথি, বার অবিকল ঠিক ঠিক রূপে অবধারণ করিলেন এবং অবশেষে জন্মমুহূর্ত্ত স্থির করিয়া, আমার কোষ্ঠীর লিখিত লগ্ন ভুল বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন।

যে বিদ্যাপ্রভাবে ঋষিগণ এমন সামান্য সঙ্কেতসকল আবিষ্কার করিয়াছেন, যদ্দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিও এইরূপ অদ্ভুত গণনা করিতে সমর্থ হয়, সেই বিদ্যা যে কত গভীর, তৎসম্বন্ধে এই একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। আমার করতল দেখিয়া—কেবল আমার নহে,—আমার যিনি স্ত্রী হইয়াছেন, তাঁহারও জন্মমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে বিদ্যাবলে অবধারিত হয়, সেই বিদ্যা যে সমগ্র বিশ্বকে বিষয় করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে কি আর সন্দেহ থাকে? এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইল। অনেকের জীবনই এইরূপ অপরাপর দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য প্রদান করে; এবং মহাসামুদ্রিক বিদ্যাবলে ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য গণনাসকল এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতবর্ষে অদ্যাপি গণৎকারগণ সম্পাদন করিতেছেন। ভৃগু-সংহিতার যে অল্পাংশ এখন বর্ত্তমান আছে, তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে, মনুষ্যের রাশিচক্রের সংস্থান যতপ্রকার হইতে পারে, প্রায় তৎসমস্তই তাহাতে বর্ণিত আছে। এই জ্যোতিষ,

সামুদ্রিক ও মহাসামুদ্রিক বিদ্যা, যাহা এযাবৎ এই দেশে বিদ্যমান আছে, তাহাই ভারতবর্ষের প্রাচীন উৎকর্ষের একটি অকাট্য প্রমাণ। অপর কোনও জাতি অদ্যাপি তাহা লাভ করিতে পারেন নাই।

জ্যোতির্ম্মণ্ডলের এবং অপরাপর আকাশস্থ ভৌতিক পিণ্ডসকলের বিজ্ঞান এবং ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক ও মহাসামুদ্রিকের জ্ঞান, যাহা বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান জ্ঞানের সহিত তুলনায়ও অতি অকিঞ্চিৎকর। ধ্রুবকে আশ্রয়স্থান করিয়া যে জ্যোতির্ম্মণ্ডল, সপ্তর্ষিমণ্ডল, এবং অপরাপর দেবলোকসকল, একই শিশুমার-নামক চক্রের দেহস্বরূপ হইয়া, আকাশমার্গে সঞ্চরণ করিতেছেন, এবং ধ্রুবসমন্বিত সমগ্র শিশুমার চক্র যে পুনরায় তদূর্দ্ধস্থিত লোকসকলকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, ইহার অত্যল্পাংশের জ্ঞানমাত্র অদ্য পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে জীবজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে; এবং এই হতভাগ্য দেশেও, আলোচনার অভাবে, এই সকল প্রাচীন বিদ্যা একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঋষিদিগের এতৎসম্বন্ধীয় উক্তিসকল এক্ষণে বুদ্ধির অগম্য প্রহেলিকার ন্যায় হইয়া বর্ত্তমান আছে। ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক ও মহাসামুদ্রিক বিদ্যা, পাশ্চাত্যপ্রদেশে, সম্প্রতি, অল্পে অল্পে, প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং ইংরাজীবিদ্যায় শিক্ষিত ভারত-বাসিগণ, এক্ষণে, এই সকল বিদ্যাও কেবল মূর্খ ভারতবর্ষীয় গণৎকারদিগের প্রতারণামূলক নহে বলিয়া সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে, এইসমস্ত কেবল প্রতারণা বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা ছিল। কালচক্রে ঋষিদিগের আবাসস্থান ভারতভূমি এইরূপই শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, প্রাচীনকালে যে, ভারতবাসীর গৌরবের বিষয় কিছুমাত্রও ছিল, তাহাই তাঁহাদিগের এক্ষণে বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চমতঃ,—রাসায়ন বিদ্যা এবং ভৌতিক যন্ত্রাদির শক্তি এবং তাপ ও তড়িদ্‌বিজ্ঞানের আলোচনা এক্ষণে পাশ্চাত্যপ্রদেশেই অধিক; কিন্তু ভারতবর্ষে এত দীর্ঘকাল পরে, এই দুর্গতির সময়েও, এই সকল প্রাচীন বিদ্যার ফলস্বরূপ যে সকল চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তদ্দৃষ্টে কি এই কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ, এই সকল বিদ্যাবিষয়ে, অধুনাতন পাশ্চাত্যবাসিগণ হইতে অপকৃষ্ট ছিলেন? তাঁহাদের সর্ব্ববাদি-সম্মত মনস্বিতা এই অনুমানের বিরুদ্ধ। প্রাচীন হিন্দু রাসায়নিক প্রক্রিয়া-সকল এক্ষণে কেবল বিজ্ঞানানভিজ্ঞ অর্থপ্রয়াসী চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের উপজীবিকার উপায়রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তদ্রূপ অবস্থা হইলেও, এই অল্পশিক্ষিত লোকদিগের ক্রিয়াফলও, পৃথিবীমণ্ডলে অন্যত্র, এযাবৎ, অনেক স্থলে, অননুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মকরধ্বজ একটি পারদঘটিত রসায়ন; ইহা এতদ্দেশীয় অশিক্ষিত কবিরাজগণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন; পাশ্চাত্যপ্রদেশেও ইহা ঔষধের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় মকরধ্বজ যে সকল পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবসায়িগণ পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এতদ্দেশে প্রস্তুত করা মকরধ্বজের ঔষধরূপে কার্য্যকারিতা, পাশ্চাত্যপ্রদেশে প্রস্তুত মকরধ্বজ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক।

লৌহভস্ম এক্ষণে আমাদের শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে প্রস্তুতই হয় না; সহস্র পোড়ের লৌহভস্ম এক্ষণে পাওয়াই যায় না; তথাপি এদেশীয় প্রণালী কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া, তদনুসারে যে লৌহভস্ম অদ্যাপি প্রস্তুত হয়, তাহার ঔষধরূপে কার্য্যকারিতা, পাশ্চাত্যপ্রদেশে প্রস্তুত লৌহভস্মহইতে, সহস্রগুণে অধিক। কেবল উদ্ভিজ্জসংযোগে পারদভস্ম প্রস্তুত করিতে এক্ষণকার কবিরাজগণ কেহই জানেন না; কদাচিৎ কোন সাধু সন্ন্যাসী তাহা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে তদ্বিষয়ে

অভিজ্ঞান এযাবৎ কিছুমাত্র নাই। এক একটি ঔষধ প্রস্তুত করিতে, অনেক সময়ে, শতাধিক বস্তু একত্র মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা আর্য্যগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে, এবং এই সকল বস্তুর পরিমাণের ইতরবিশেষেরও উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে অনেক বস্তু এক্ষণে পাওয়াই যায় না, এবং সংগ্রহ করিবার বিশেষ চেষ্টাও এক্ষণকার অর্থাভিলাষী চিকিৎসকদিগের নাই। যে কিছু দ্রব্য তাঁহারা অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারেন, তদ্দ্বারাই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া, তাঁহারা চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন; কিন্তু তাহাতেও ইঁহাদিগের চিকিৎসার ফল, পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের চিকিৎসার ফলের সহিত তুলনায় অপকৃষ্ট নহে; বরং অনেক স্থলে এদেশীয় কবিরাজদিগের চিকিৎসাকে অধিক কার্য্যকরী হইতে দেখা যায়। এই কলিকাতা সহরেই, হিন্দু-প্রণালীতে চিকিৎসাকারী কবিরাজগণ যেরূপ খ্যাতির সহিত স্ব স্ব ব্যবসায়-কার্য্য পরিচালন করিতেছেন, তাহাই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। ইহা কি প্রাচীন আর্য্যদিগের রাসায়নবিদ্যাবিষয়ে উৎকর্ষের যথেষ্ট প্রমাণ নহে? *

দিল্লীতে একটি লৌহনির্ম্মিত স্তম্ভ অতি প্রাচীনকালহইতে বর্ত্তমান আছে; ইহা চুঙ্গার আকৃতি; দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ ফুট, মৃত্তিকার উপরে প্রায় ৩০ ফুট, ব্যাস ১৬ ইঞ্চি; ইহা ঢালা লৌহে নির্ম্মিত। ইহা পূর্ব্বে মথুরায় ছিল; তথা হইতে আনীত হইয়া, প্রায় ৮০০ বৎসর যাবৎ দিল্লীতে স্থাপিত হইয়াছে; ইহা কুরুক্ষেত্র সমরের সামসময়িক বলিয়া প্রবাদ আছে। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, রৌদ্র বৃষ্টি ইহার উপর ধারাবাহিক ক্রমে কার্য্য করিতেছে; কিন্তু এযাবৎ একটি স্থানে ইহার লৌহে কলঙ্ক জন্মে নাই। এরূপ নির্ম্মল লৌহ পাশ্চাত্য জাতিগণ এযাবৎ তাঁহাদের রাসায়ন-

* ভারতবর্ষের প্রাচীন রাসায়নবিদ্যাবিষয়ে শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্প্রতি একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন; প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রাসায়নবিদ্যার যে প্রভূত চর্চ্চা ছিল, তাহা এই গ্রন্থে তিনি উত্তমরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন।

বিদ্যাবলে, প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়েন নাই; তাঁহাদের নির্ম্মিত লৌহ কলঙ্কিত না হইয়া এত দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না। অপর দিকে এই একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণে বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে, অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীন ভারত-বাসিগণের বৃহৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা এক্ষণকার পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না এবং ইহা দ্বারা তাঁহাদের যেরূপ ভৌতিকশক্তিপরিচালনের ক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে, এক্ষণকার পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ যে তাহাদিগকে এযাবৎ এই সকল বিষয়েও কোন প্রকারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত রূপে অবধারিত হয়। * এই স্তম্ভটি যে হিন্দুরাজ্য সময়ের তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

পুরীক্ষেত্রে ৺ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের যে অদ্ভুত মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার শিল্পনৈপুণ্য ও কার্য্যকৌশল অতুলনীয়। পরন্তু যেসকল বৃহৎকায় প্রস্তর এই মন্দিরের উচ্চপ্রদেশসকলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং যে অতি বৃহৎ ধাতুনির্ম্মিত চক্র তদুপরি সংস্থাপিত আছে, তাহা তদ্রূপ উচ্চস্থানে বহন করিয়া, যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে যে প্রভূত ভৌতিক শক্তির (Mechanical Power) প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া

* সুবিখ্যাত রাসায়নিক পণ্ডিত রস্কো (Roscoe) সাহেব তাঁহার প্রণীত ১৮৮০ সালে প্রকাশিত রসায়নবিষয়ক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অংশের ৩৫ পৃষ্ঠায় এই স্তম্ভ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যে এই স্তম্ভটি "wrought-iron pillar, no less than 60 feet in length. This pillar stands about 30 feet out of the ground and has "an ornamental cap bearing an inscription in Sanskrit belonging to the 4th century It is not an easy operation at the present day to forge such a mass with our largest rolls and steam hammers" &c.

পাশ্চাত্য-দর্শক-পণ্ডিতগণ মন্দির-নির্ম্মাতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিছুদিন হইল, মন্দিরের উপরিভাগহইতে একখানি প্রস্তর খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু এযাবৎ তাহা পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতে পারে নাই।

তড়িৎসম্বন্ধীয় বিদ্যা যে মনস্বী প্রাচীন ভারতবাসিগণের আয়ত্তাধীন হইয়াছিল, তাহারও পরিচয় এযাবৎ সম্পূর্ণরূপে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। অদ্যাপি প্রাচীন মন্দিরসকলের শীর্ষভাগে যেসকল বিচিত্র ত্রিশাখাবিশিষ্ট অথবা চক্রাকৃতি লৌহময় ফলকসকল দৃষ্ট হয়, তাহা প্রাচীন ভারতবর্ষে তড়িদ্‌বিজ্ঞানের একটি অকাট্য প্রমাণ। প্রভূততড়িৎসম্পন্ন মেঘসকল ইহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র এইসকল ফলকহইতে তড়িৎপ্রবাহ নির্গত হইয়া, মেঘ-তড়িৎকে প্রশমিত করে। সুতরাং বজ্রাঘাতে এইরূপ মন্দির আহত হওয়া কখনও শ্রুতিগোচর হয় না। এইসকল লৌহফলক বজ্র, ত্রিশূল এবং চক্র নামে পরিচিত। মন্দির ও অট্টালিকাসকলের উপরিভাগে এইরূপ বজ্র সন্নিবেশিত করিবার প্রথা আছে, সুতরাং তাহা করা কর্ত্তব্য, এইমাত্রই ভারতবাসী এক্ষণে অবগত আছেন। ইহার যথার্থ বিজ্ঞান তাঁহারা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের আগমনে, এই প্রথার গূঢ়মর্ম্ম প্রকাশিত হইতেছে। (এইরূপে পরাধীনতারূপ মহৎ ব্যসনহইতেও ভগবৎকৃপায় নানাবিধ মঙ্গলসাধন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যবিজ্ঞানের দিকে পৃথিবীমণ্ডলস্থ অপর সকল জাতিরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ভারতীয় গৌরবের পুনরভ্যুদয়চিহ্নসকল এক্ষণে প্রকাশমান হইতেছে)।

সুবিখ্যাত ডাক্তার ৺সীতানাথ ঘোষ মহাশয়—যিনি এতদ্দেশে সর্ব্বপ্রথমে তড়িদ্‌-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, তৎসাহায্যে ব্যাধিচিকিৎসা প্রবর্ত্তিত করেন,

তিনি—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৯৪ শকাব্দার অগ্রহায়ণসংখ্যায় একটি প্রবন্ধে এতদ্দেশে মন্দিরের শিরোভাগে ত্রিশূলাদিস্থাপনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশিত করেন ঃ—

"শাস্ত্রের বিধান এই যে দেবমন্দিরের উপরিভাগে ত্রিশূল ও দেবীমন্দিরের উপরিভাগে চক্র স্থাপন করিতে হইবে। এই উভয়কেই আবার তাম্র লৌহ বা পিত্তল দ্বারা সূক্ষ্মাগ্র করিয়া গঠন করিতে হইবে। যিনি আমাদিগের শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনা করিয়া অনেক স্থলে তৎপ্রণেতাদিগের মনোগত গূঢ় ভাব অবগত হইতে পারিয়াছেন, তিনি অবশ্যই একেবারে স্বীকার করিবেন যে, তাঁহাদিগের এই বিধানটির কোন বিশেষ অভিপ্রায় আছে। আমরা যতদূর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে, ইয়োরোপীয়েরা প্রাসাদপার্শ্বে লৌহদণ্ড স্থাপন করিয়া যে বজ্রপাত নিবারণ করেন, আমাদিগের শাস্ত্রকারগণও তাহাই করিবার জন্য তাম্রলৌহাদি ধাতুনির্ম্মিত ত্রিশূল ও চক্র প্রোথিত করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃতিকতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, আকাশস্থিত মেঘে হয় পুরুষাকার, না হয় স্ত্র্যাকার তড়িৎ সততই মুক্তভাবে অবস্থিতি করে। ঐ মুক্ত তড়িৎকেই সকলে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে দেখিয়া থাকেন। বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে বায়ু প্রায়ই শুষ্কাবস্থায় থাকে; এই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘসকল একত্রিত হইলে, তাহাতে যে মুক্ত তড়িতের সমষ্টি হয়, তাহা বেগে ধাবিত হইয়া প্রায়ই নিকটস্থ মেঘান্তরে প্রবেশ করতঃ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি সেই সময়ে নিকটে কোনও মেঘ না থাকে, অথবা যাহা থাকে, তাহা যদি সজাতীয় মুক্ততড়িদ্‌বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে, ঐ তড়িৎ পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কোন পদার্থে পতিত হয়; কি মেঘান্তর, কি পৃথিবী, যাহাতেই হউক, পতিত হইবার পূর্ব্বে ঐ মেঘস্থ মুক্ততড়িৎ সেই মেঘ বা পৃথিবীস্থ পদার্থের অন্তর্গত সাম্যাবস্থ তড়িদ্দ্বয়কে বিয়োগ

করিয়া, অসমান বর্ণটিকে আপন অভিমুখীন প্রান্তে আকর্ষণ ও সমানবর্ণটিকে বিপরীত প্রান্তে প্রক্ষেপ করিয়া দেয়। এইরূপ বিয়োগের পর, অপরিচালক শুষ্ক বায়ুর মধ্যবর্ত্তিতা নিবন্ধন এ মুক্ততড়িৎ ও তদাকৃষ্ট অসমানবর্ণটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং পরস্পর মিলিত হইতে উদ্যত হয়। এই সময়ে সমানবর্ণ তড়িৎটিরও যে বৃদ্ধি না হয়, এমত নহে। এই সময়ে উক্ত মিলনোন্মুখ তড়িদ্দ্বয়ের মধ্যে একটি অগ্রসর হইয়া অপরটির সহিত মিলিত হইয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

"যেরূপ মেঘের বিষয় উল্লিখিত হইল, যদি সেইরূপ কোন মেঘ মন্দিরাদির উপরিস্থ আকাশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, তদন্তর্গত মুক্ততড়িতের বিয়োজনী শক্তির প্রভাবে মন্দিরের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থ তড়িদ্দ্বয় পরস্পর বিযুক্ত হওয়াতে, উক্ত মুক্ততড়িতের অসমানবর্ণটির উপরিস্থিত ত্রিশূল বা চক্রের অগ্রভাগ অভিমুখে আকৃষ্ট ও সমানবর্ণটি নিম্নস্থ ভূভাগের অভ্যন্তরাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ বিয়োগের পর, শুষ্ক বায়ুর মধ্যবর্ত্তিতা নিবন্ধন আকাশের তড়িৎ ও ত্রিশূলাগ্র-স্থিত আকৃষ্ট তড়িৎ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে, ত্রিশূলাদির অগ্রভাগ, মেঘের নিম্নভাগ অপেক্ষা অধিকতর পরিচালক ও সূক্ষ্মতর বলিয়া, মেঘস্থ তড়িৎ আপন অবস্থান-প্রান্তহইতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, মন্দিরস্থ তড়িৎ সহজেই ত্রিশূলাদির অগ্রভাগ হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া, উক্ত তড়িতের সহিত মিলিত হয়। মেঘতড়িৎ এইরূপে সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত হওয়ায়, কোনপ্রকার অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা থাকে না। ত্রিশূলাগ্র উৎকৃষ্ট পরিচালক; সুতরাং তাহাতে সামান্যপরিমাণ তড়িৎ সংগৃহীত হইতে না হইতেই, তাহা ঊর্দ্ধগামী হইয়া উপরিস্থ মেঘে গমন করে, এই জন্য কোনপ্রকার আলোক দর্শন বা শব্দ শ্রবণ করিতে পাওয়া যায় না।

"ইয়োরোপীয়েরা আপন প্রাসাদপার্শ্বে যে প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড ভূমিতে

প্রোথিত করিয়া রাখেন, ত্রিশূল বা চক্র অপেক্ষা তাহার বিদ্যুদ্‌-নিবারণী শক্তি প্রবলতর নহে। ত্রিশূলাদির কার্য্যকারিতা অপেক্ষা ইয়োরোপীয় শলাকার ফলোপধায়িকা যে শ্রেষ্ঠ নহে, ইহা শুনিলে বোধ হয় অনেকেই বিস্মিত হইবেন। কিন্তু সেরূপ হইবার কোন কারণ নাই; কেন না, ইয়োরোপীয় লৌহ-শলাকাও যেরূপ, ত্রিশূলসংযুক্ত মন্দিরও ঠিক সেইরূপ একটি ভূমিসংলগ্ন পরিচালক দণ্ডস্বরূপ। সুতরাং উভয়ের মধ্যেই পৃথিবীর তড়িৎ সমান বেগে গমনাগমন করাতে তুল্যরূপ কার্য্যসাধন করে। যদি ইহাতে কাহারও অবিশ্বাস জন্মে, তবে তিনি এদেশের কি পুরাতন, কি নূতন, সকলপ্রকার মন্দির পর্য্যবেক্ষণ করুন; তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, ইয়োরোপীয়শলাকারক্ষিত প্রাসাদাদিও যেরূপ প্রায় বজ্রাহত হয় না, সেইরূপ ক্ষুদ্রত্রিশূলাদিবিশিষ্ট মন্দিরাদিও প্রায় কখন বজ্রপাতে বিনষ্ট হয় নাই। অল্পব্যয়ে প্রকাণ্ড শলাকার কার্য্য নির্ব্বাহ করায়, শাস্ত্রকারদিগের তড়িৎশাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানের যথেষ্ট প্রাথর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহাদিগের জ্ঞানের বিশুদ্ধতাপ্রকাশের আর একটি স্থল আছে। ইয়োরোপীয়েরা তড়িৎশাস্ত্রের প্রাথমিক অনুশীলন কালে মনে করিতেন যে, মেঘস্থ তড়িৎ অন্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া, প্রোথিত লৌহশলাকার উপরেই আসিয়া পতিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহা পৃথিবীর অভ্যন্তরে নীত হওয়ায় কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ সিদ্ধান্তদ্বারা পরিচালিত হওয়ায়, তাঁহারা কোন স্থানেই ঐ দণ্ডকে অট্টালিকার গাত্রে সংস্পৃষ্টভাবে স্থাপন না করিয়া, কতিপয় অপরিচালক শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ করতঃ তাহাকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে প্রোথিত করিতেন। কিন্তু ঐ দেশীয় আধুনিক পণ্ডিতেরা বহুপরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মেঘের তড়িৎ আসিয়া লৌহশলাকার উপরে পতিত না হইয়া, পৃথিবীর তড়িৎই তাহার অগ্রভাগহইতে অগ্রসর হইয়া

মেঘতড়িতের সহিত মিলিত হয়। এই সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারা এইক্ষণে অনেক স্থলে শুদ্ধ গাত্রসংস্পর্শ কেন,উক্ত শলাকা দ্বারা অট্টালিকার অংশবিশেষ ভেদ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন না। ইয়োরোপীয়দিগের এই সংস্কৃত সিদ্ধান্ত যে বহুকাল পূর্ব্বেই আমাদিগের শাস্ত্রকারগণের জ্ঞান-ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, তাঁহারা বজ্রনিবারক ত্রিশূলাদিকে মন্দিরের উপরিভাগে প্রোথিত করিবার আদেশ দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

"পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা যে ধাতুনির্ম্মিত শলাকাদ্বারা বিদ্যুৎপাত নিবারণ করিতে জানিতেন, তাহার আর একটি চমৎকার প্রমাণ এখনও বিদ্যমান আছে *। পূর্ব্বপ্রদেশে গ্রীষ্মকালে যেসকল শস্য জন্মে, তাহার অনেকাংশ শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আপদ্‌নিবারণার্থে গ্রামস্থ কৃষক-দিগের প্রার্থনায় একব্যক্তি নিযুক্ত হয়, তাহাকে শিলারি কহে।

"সে গ্রীষ্মকালের তিন চারি মাস পর্য্যন্ত শ্মশ্রু ধারণ, অতৈল স্নান, নিরামিষ ভোজন এবং সর্ব্বদা শুচি হইয়া কালযাপন করে। যখন আকাশে শিলা-মেঘ দৃষ্ট হয়, তখন শিলারি আপন কেশবন্ধন খুলিয়া দিয়া এবং কপালে বৃহদায়তন সিন্দুরচিহ্ন, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘাকায় লৌহত্রিশূল, ও বাম স্কন্ধে একটি মহিষশৃঙ্গনির্ম্মিত ভেরী ধারণ করিয়া উলঙ্গ ভাবে গৃহহইতে বহির্গত হয়, এবং ঐ ভেরী বাদন করিতে করিতে শস্য ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হয়। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রান্তরের যে ভাগের উপরিস্থ আকাশে উক্ত শিলা-মেঘকে দেখিতে পায়, সেইভাগে যাইয়া হস্তস্থিত ত্রিশূল ভূমিতে প্রোথিত করে, এবং যতক্ষণ ঐ মেঘ ছিন্ন ভিন্ন ভাবে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ ঐ স্থানে দণ্ডায়মান

---

* কালের গতিতে, এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর এই ৩৭, ৩৮ বৎসরের মধ্যে, এই প্রমাণও বর্ত্তমানে বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

থাকিয়া ভেরী বাদন করিতে থাকে। ঐ মেঘ যদি ঐ স্থানে ছিন্ন ভিন্ন না হইয়া বায়ুসহযোগে স্থানান্তরে গমন করে, তাহা হইলে শিলারি সবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, এবং যেখানে তাহাকে স্থির হইতে দেখে, সেইখানে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে ত্রিশূল প্রোথিত করে। ঐ মেঘ যদি বায়ুকর্ত্তৃক প্রান্তরহইতে বহিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে শিলারির এরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা প্রায়ই তাহার শিলাবর্ষিণী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। শিলারি সমস্ত গ্রীষ্মকাল এইরূপে শস্যরক্ষণে শ্রম করিয়া, কৃষকদিগের নিকট হইতে যে কিঞ্চিৎ শস্য প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহার ভৃতিস্বরূপ। এই ব্যাপারের বাস্তবিকতা বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই; কারণ পল্লীগ্রামের অবস্থার বিশেষজ্ঞমাত্রেই বোধ হয় ইহা অবগত আছেন।

"এইক্ষণে শিলারি যেসকল উপায়ে শিলাবৃষ্টি নিবারণ করে, তত্তাবতের কার্য্যকারিতা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মেঘে কোনপ্রকার মুক্ত তড়িতের আবির্ভাব নিবন্ধন হঠাৎ অত্যন্ত শৈত্য উদ্ভূত হইলে, বাষ্পরাশি জমিয়া শিলারূপ ধারণ করতঃ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। উক্ত তড়িতের কার্য্যকারিতা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত শিলারির ত্রিশূলই একমাত্র উপায়। উক্তত্রিশূল শিলামেঘের নিম্নদেশস্থ ভূমিতে প্রোথিত করিলে, পৃথিবী হইতে অসমানবর্ণতড়িৎ উত্থিত হইয়া ত্রিশূলাগ্র হইতে উৰ্দ্ধমুখে অগ্রসর হয়, এবং মেঘস্থ তড়িতের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাকে সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে; সুতরাং উক্ত মেঘে ঐ সময়ে আর শিলা জন্মিতে পারে না *।" ইত্যাদি।

* শিলারির শুচিব্যবহারপ্রভৃতি বিষয়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারও বৈজ্ঞানিক হেতু আছে। উক্তপ্রকার ব্যবহারদ্বারা ইচ্ছাশক্তি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং তন্নিবন্ধন তড়িৎকার্য্য উৎপাদন করিতে বিশেষ সামর্থ্য জন্মে। ডাক্তার সীতানাথ ঘোষ যে সময়ে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তৎকালে ইউরোপীয়গণের এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। এক্ষণে তাহাও আরম্ভ হইয়াছে।

উক্ত ডাক্তার ৺সীতানাথ ঘোষ মহাশয় আর্য্য ঋষিদিগের তড়িদ্-বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ ঐ ১৭৯৪ শকাব্দার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মাঘসংখ্যায় মাদুলিধারণপ্রভৃতি বিষয়ে তড়িৎশক্তির কার্য্য ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,—"অনেকদিন হইল, এসিয়াটিক সোসাইটির অনুসন্ধানে "শিল্পসংহিতা" নামধেয় একখানি পুরাতন সংস্কৃত পুস্তক বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে পুষ্পক রথ বা ধূমযন্ত্র, তোয়যন্ত্র বা তাপমান যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আবার এক্ষণে যদি সৌভাগ্যক্রমে তড়িদ্বিদ্যাসম্বন্ধীয় কোন পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা হইলে, তড়িৎসম্বন্ধে আমরা যে কিঞ্চিৎ বলিলাম, তাহার মত কত শত বিষয় যে তাহাতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন, তাহা বলা যায় না।" ইত্যাদি।

ভারতবাসী মাত্রেই জানেন যে, বিদ্যুৎই দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্র। আকাশের মেঘমণ্ডলের বিদ্যুৎসংঘর্ষ দেবরাজের বজ্রনিনাদ বলিয়া ভারতবর্ষীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন। কথিত আছে যে, এই বৈদ্যুতিক ঐন্দ্রাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়া, শ্রীমন্নরদেব অর্জ্জুন খাণ্ডবদাহকালে সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া, তাঁহাকে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে লৌহময়বর্ম্মাবৃত অযুত অযুত সেনা এককালে নিধনকরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার কালে এই ঐন্দ্রবিদ্যা লোপ প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার ঐসকল কীর্ত্তি-বর্ণনা আরব্য উপন্যাসের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি অপরাপর মহাবীর সকলও ঐসকল দৈবাস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ ছিলেন। তড়িদ্‌বিজ্ঞান পূর্ব্বে ভারতবাসীর এত অধিক আয়ত্ত ছিল যে, আহারে, বিহারে, আসনে, গমনে, শয়নে, স্বপনে, সকলস্থলেই তড়িৎশক্তির কার্য্যের প্রতি ভারতবাসীর লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা দেহতত্ত্ব

সম্যক্ অবগত হইয়াছিলেন; সুতরাং কিরূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া আসীন হইলে, কিরূপ তড়িৎপ্রবাহ দেহে সঞ্চারিত হয়; কোন্ পদ কিরূপ বিক্ষেপ করিলে, দেহাভ্যন্তরে কিরূপ তড়িৎকার্য্য হইতে থাকে; কোন্ দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে, দেহস্থ তড়িতের বেগ পরিবর্দ্ধিত হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায় ও রোগোৎপাদন করে; কোন্ দিকে মুখ করিয়া আসীন হইলে, তড়িৎপ্রবাহ প্রশমিত হইয়া মনের স্থৈর্য্য ও ভজনের আনুকূল্য সম্পাদন করে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, আর্য্য ঋষিগণ সমুদয় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের প্রণালী অবধারিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে সেই বিজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কেবল চিরপ্রচলিত প্রথাস্বরূপে কোন কোন স্থলে তাহার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং তাহা কুসংস্কার বলিয়াই নব্য শিক্ষিতসমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক্ঃ—গৃহস্থব্যক্তি উত্তরশিয়রী হইয়া শয়ন করিবে না; যাঁহার নিদ্রালস্য জয় করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর, তাদৃশ যোগী পুরুষের উত্তর দিকে শিরঃস্থাপন করিয়া শয়ন কারতে বাধা নাই। এইমাত্র ব্যবস্থা আমাদিগের জানা আছে। এই প্রথার কেহ অনুসরণ করিলে, তিনি কুসংস্কারাপন্ন বলিয়াই ইংরাজীবিদ্যাবিদ্‌দিগের নিকট পরিচিত হয়েন; কারণ এই প্রথার অনুসরণকারিগণ ইহার তথ্য অবগত নহেন। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানপ্রভাবে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, পৃথিবী একটি বৃহৎ তড়িদ্‌যন্ত্র; উত্তর দক্ষিণে ইহার কেন্দ্রদ্বয়। নির্ম্মল লৌহ-ফলক চুম্বকের সহিত সংলগ্ন হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করিলে, ঐ লৌহফলক যেমন কালক্রমে চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উত্তর দক্ষিণদিকে লম্বিত করিয়া ঐ লৌহফলককে দীর্ঘকাল এক অবস্থায় রক্ষা করা হইলে, তাহাতে চুম্বকধর্ম্ম সকল প্রকাশ পায়; ইহার কারণ এই যে, তাড়িদ্-যন্ত্ররূপ পৃথিবী ঐ লৌহের উপর অতিবেগে তড়িৎ সঞ্চারিত করে।

লৌহের ন্যায় মনুষ্যদেহও শীঘ্র তড়িৎ-শক্তি গ্রহণ করিতে সমর্থ। সুতরাং পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে শয়নকারী পুরুষের মস্তক পৃথিবীর উত্তর দিক্স্থ তড়িৎ-কেন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হওয়ায়, উত্তরাভিমুখে শয়নকারী ব্যক্তির মস্তকে অতিবেগে তড়িৎপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হয়; ইহা সহজ অনুমানসিদ্ধ। এইরূপ তড়িৎপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে যে তাহার মস্তিষ্ক নিদ্রিতাবস্থায় অতিবেগে আলোড়িত হইবে, ইহাও সহজ অনুমান। সুতরাং উত্তরশিয়রী ব্যক্তির অবশ্য সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে এবং নিদ্রান্তে তাহার দেহ অবসাদ প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার ৺সীতানাথ ঘোষ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৯৪ শকাব্দায় একটি প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধে আরও বিশেষ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "পৃথিবীরূপ মহান্ চুম্বককে একটি মধ্যরেখাদ্বারা উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভাগ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা (ভারতবাসীরা) ঐ রেখাটি হইতে অনেকদূরে উত্তর বিভাগে বসতি করিতেছি। যখন পৃথিবীর উত্তর বিভাগ চুম্বকের উত্তর প্রান্তের গুণ-সমন্বিত এবং দক্ষিণ বিভাগ চুম্বকের দক্ষিণ প্রান্তের গুণসম্পন্ন এবং আমাদিগের পাদদ্বয় যখন দিবারাত্রির অধিকাংশ কাল উত্তরবিভাগের পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে, তখন আমাদিগের পাদদ্বয় চুম্বকীয় দক্ষিণপ্রান্তের গুণসমন্বিত এবং মস্তক সুতরাং উত্তর প্রান্তের গুণযুক্ত হইয়া উঠে। পৃথিবীর উত্তর বিভাগস্থ দেশসমুদায়ে দক্ষিণ শিরে শয়ন করিলে, দিবাভাগের চুম্বকত্ব যেরূপ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়, উত্তর শিরে শয়ন করিলে, তাহা আবার সেইরূপ বিনষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপে প্রত্যেক দিবারাত্রির মধ্যে শরীরের চুম্বকত্ব পুনঃপুনঃ নষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, স্বাস্থ্য, সুতরাং আয়ু, ক্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে।"

পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার ৺সীতানাথ ঘোষ মহাশয় ১৭৯৪ শকাব্দায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মাঘসংখ্যাতে আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন;

তাহাতে পূর্ব্বশিয়রী হইয়া শয়নের বিধি ও পশ্চিমশিয়রী হইয়া শয়নের নিষেধ-বিষয়ক হিন্দু প্রথার তথ্য তিনি নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যা করেন ঃ—

"পণ্ডিতপ্রবর ফ্যারেডে সাহেবের আশ্চর্য্য পরীক্ষাবলিদ্বারায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমাদিগের পদতলস্থ পৃথিবীর উপরিভাগ দিয়া একটি তড়িৎ-প্রবাহ নিত্য বহমান রহিয়াছে। ঐ তড়িৎ সূর্য্যকিরণোৎপন্ন তাপদ্বারা উৎপাদিত হইতেছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পৃথিবী গোলাকার এবং তাহার গতি পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্বদিগভিমুখে হইতেছে। এজন্য সূর্য্য-কিরণদ্বারা তাহার সমুদায় অংশ একসময়ে তাপিত নাহইয়া ক্রমে পূর্ব্ব পশ্চিম অংশক্রমে হইতেছে। যে সময়ে পৃথিবীর যে ভাগ সূর্য্য কিরণদ্বারা তপ্ত হয়, সেই সময়ে তাহার পশ্চিম ভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে ; এই কারণে পৃথিবীতে সূর্য্যকিরণোৎপন্ন তাপ দ্বারা তড়িৎ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত নিয়মানুসারে ক্রমাগত পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিগভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

"অধুনা যেসমুদায় শরীরতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত তড়িৎপ্রয়োগদ্বারা মানবশরীরের বিবিধ রোগ আরাম করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহারা শারীরিক তড়িৎপ্রবাহকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকের ফলাফল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শরীরে স্নায়ুকেন্দ্র বা মূল হইতে তাহার শাখাগ্র অভিমুখে, অর্থাৎ মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি অথবা মেরুদণ্ড হইতে বক্ষ, উদর, এবং অধোদেশ অভিমুখে যে তড়িৎপ্রবাহ বহিতে থাকে, তাহাকে তাঁহারা অধোগ প্রবাহ কহিয়া থাকেন। এইরূপ প্রবাহ শরীরের পক্ষে স্বাভাবিক। মানবশরীরের যে অংশে ঐরূপ অধোগ প্রবাহ যোগ করা যায় ; সেই অংশস্থিত শিরাপ্রভৃতি প্রসারিত হইয়া পড়ে বলিয়া, রসরক্তাদি অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে। সুতরাং শরীরের সেই অংশে রসরক্তপ্রভৃতির অবরোধজনিত কোন প্রদাহ বা পীড়া থাকিতে

পারে না। আর যে তড়িৎপ্রবাহ স্নায়ুসমুদায়ের শাখাগ্রহইতে কেন্দ্র বা মূলাভিমুখে অর্থাৎ পদাঙ্গুলি হইতে মস্তক অথবা বক্ষ, উদর বা অধোদেশ হইতে মেরুদণ্ডাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহাকে তাঁহারা ঊর্দ্ধগ প্রবাহ কহেন। এইরূপ প্রবাহ শরীরের পক্ষে অস্বাভাবিক। শরীরের যে অংশে ঐরূপ ঊর্দ্ধগ প্রবাহ প্রয়োগ করা যায়, সেই অংশস্থিত শিরাপ্রভৃতি স্বাভাবিক অপেক্ষা সংকুচিত হইয়া পড়ে বলিয়া, রসরক্তাদির সঞ্চালন সম্বন্ধে বিস্তর ব্যাঘাত জন্মে; সুতরাং শরীরের অংশে রসরক্তপ্রভৃতির অবরোধবশতঃ নানাপ্রকার প্রাদাহিক পীড়া জন্মিতে পারে (See page 9 of Dr. J. R. Reynold's Lecties on the clinical uses of Electricity, 1871)।

"এইক্ষণে আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ে অবতীর্ণ হইলে, সহজেই দেখিতে পাইবেন যে, অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ যেরূপ অন্যান্য বিদ্যায়, সেইরূপ তড়িদ্‌বিদ্যায়ও অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তড়িদ্‌-বিদ্যাসম্বন্ধে যে কয়েকটি পরীক্ষিত সত্য উল্লিখিত হইল, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শয়নকালে পৃথিবীর পশ্চিমদিকে মস্তক স্থাপন করা অপেক্ষা পূর্ব্বদিকে মস্তক স্থাপন করিলে, শরীর, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক, নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে; কারণ পৃথিবীর উপরিভাগ দিয়া প্রতিনিয়ত যে তড়িৎপ্রবাহ পূর্ব্বদিক্‌হইতে পশ্চিমদিগভিমুখে ধাবিত হইতেছে, পূর্ব্ব শিরে শয়ন করিলে, তাহা শরীরের পক্ষে অধোগ প্রবাহ এবং পশ্চিমশিরে শয়ন করিলে, তাহা ঊর্দ্ধগ প্রবাহের সমুদায় কার্য্য সাধন করে। এতদনুসারে পশ্চিম শিরে শয়ন করিলে, মস্তিষ্কপ্রভৃতি বিবিধ শরীরযন্ত্রে রক্তাদি সংগৃহীত হইয়া, প্রদাহ ও তজ্জনিত ব্যাধি সকল উৎপাদন করে।"

"অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ব্বশিরে শয়ন করিলে,

বিদ্যা এবং পশ্চিমশিরে শয়ন করিলে মন দুশ্চিন্তা-পরায়ণ হয়; তাহার যৌক্তিকতা বিষয়ে বোধ হয় এক্ষণে কাহারও সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। পূর্ব্বশিরে শয়ন করিলে যে মস্তিষ্কপ্রভৃতি যন্ত্রসকল সততই পরিষ্কৃত ও সুস্থাবস্থ এবং পশ্চিম শিরে শয়ন করিলে, তৎসমুদায় যে রসরক্তাদি পূর্ণ, প্রদাহিত, সুতরাং পীড়িতাবস্থাপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যদি মস্তিষ্কপ্রভৃতি সকলই সুস্থ থাকিল, তাহা হইলে আর জ্ঞানলাভের ভাবনা কি, এবং যদি তৎসমুদায় রক্তাদিপূর্ণ প্রদাহিত হইয়া পড়িল. তাহা হইলে মনের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার অসম্ভাবনা কি? অতএব শয়নবিষয়ক শাস্ত্রীয় বিধান যে সম্পূর্ণরূপে যুক্তি-সঙ্গত ও হিতকারী, তাহা অবশ্যই আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইতেছে।"

বস্তুতঃ আমাদিগের দেহ অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত একটি তড়িদ্‌যন্ত্র বিশেষ। অঙ্গুলিস্থ নখসকল ঐ দেহরূপ তড়িদ্‌যন্ত্রের তড়িন্নিষ্ক্রমণ-দ্বারস্বরূপ, এবং চক্ষুর্দ্বয় দেহস্থ তড়িন্নিষ্ক্রমণের নিমিত্ত সুবিস্তৃত গবাক্ষ-বিশেষ। ইহা জানিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন দেহের তড়িতের কার্য্য বিভিন্ন ইহা অবগত হইয়া, প্রাচীন আর্য্যগণ দৃষ্টিদোষ ও নখস্পর্শদোষ নিবারণের নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যিনি ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস করিবেন, তাঁহার দেহ ও মনকে সর্ব্বদা অপরের বহির্ম্মুখ তড়িৎপ্রবাহহইতে রক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার নিয়ম স্থাপন করা হইয়াছে। তিনি আহার করিবার সময়ে নির্জ্জন প্রদেশে, অপরের, বিশেষতঃ অপকৃষ্ট-প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির, দৃষ্টির বহির্ভূত থাকিয়া আহার করিবেন, ব্রহ্মচর্য্য-সময়ে অপকৃষ্টপ্রকৃতি শূদ্রাদির দর্শনের অগোচর থাকিবেন; * অপকৃষ্ট এবং অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিবেন না; কারণ

---

* জাতিভেদ যে মূলে গুণানুগত, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

তাহাদিগের স্পর্শে তাহাদিগের শারীরক তড়িৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, স্পৃষ্ট বস্তু সকলকে তদ্‌গুণাক্রান্ত করে। মৈথুনব্যাপারে পুংস্ত্রামিথুনের শরীরের তড়িৎ-রাশি একেবারে উদ্বেলিত হইয়া, পরস্পরে সংক্রামিত হয়। অতএব উত্তমপ্রকৃতি, সুতরাং উত্তমতড়িদ্‌যুক্ত পুরুষ অপকৃষ্ট প্রকৃতির স্ত্রীতে গমন করিবেন না, এবং উত্তম প্রকৃতির স্ত্রীও অপকৃষ্ট প্রকৃতির পুরুষের সহিত মৈথুনব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবেন না। স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, ব্রাহ্মণ, শূদ্রপক্কান্ন চতুর্ব্বিংশতিবার ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মণ্যহইতে ভ্রষ্ট হয়েন; কিন্তু একবার মাত্র শূদ্রাগমনে তাঁহার পাতিত্য জন্মে। পরন্তু মৈথুনব্যাপারে মৈথুনাসক্ত স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের তড়িৎ পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হয় সত্য, কিন্তু স্ত্রীদেহে পুরুষশক্তি যত অধিকপরিমাণে সঞ্চারিত হয়, পুরুষদেহে স্ত্রীশক্তি তত অধিকপরিমাণে সঞ্চারিত হয় না; কারণ স্ত্রী পুরুষশক্তির ধারিকা। অতএব ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উত্তম শ্রেণীর স্ত্রী অধম শ্রেণীর পুরুষের সহিত কখনই বিবাহকার্য্যে সম্মিলিত হইবেন না। বরং উত্তমতেজোধারী পুরুষ অধমা স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারেন; কারণ তাঁহার শক্তি লাভ করিয়া স্ত্রী উন্নতা হইবে, এবং তিনি নিজে তপঃ-প্রভাবে অধমস্ত্রী-সহবাসজনিত দোষ ক্ষালন করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষেও ইহা প্রশস্ত নহে। পূর্ব্বকালে ভারত-ভূমিতে উচ্চজাতীয় পুরুষদিগের আত্মসংযম পূর্ব্বক বহুলপরিমাণে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করা অভ্যাস করিতে হইত; সুতরাং তৎকালে ঋষিগণ সময়ে সময়ে অনুলোম বিবাহও অনুমোদন করিয়াছেন। এমন কি অপুত্রক কাহারও মৃত্যু হইলে, তাহার বংশরক্ষার নিমিত্ত উত্তমজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া, মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিবার ব্যবস্থাও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিয়োগানুসারে, বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীতে স্বয়ং কৃষ্ণ-

দ্বৈপায়ন ঋষি সন্তানোৎপাদন করিয়া, ভরতকুল রক্ষা করেন। বশিষ্ঠ ঋষি সৌদাসরাজপত্নীতে সন্তানোৎপাদন করিয়া সূর্য্যবংশ পরিবর্দ্ধিত করেন। এক্ষণ কলিকাল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; লোকসকল তপস্যা ও জ্ঞানোপার্জ্জনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে; মৈথুন এবং অপর সকল ব্যবহার বিষয়ে অতিশয় অধিক পরিমাণে কামপরতন্ত্র, বিজ্ঞান-বিরহিত ও স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। ঋষিগণ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা এই দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, এই কলিকালে বিভিন্ন বর্ণে অনুলোম বিবাহ ও নিয়োগদ্বারা সন্তানোৎপত্তি প্রতিষেধ করিয়াছেন। এতৎসমস্তই বিজ্ঞান; ইহা কুসংস্কার অথবা স্বার্থপরতা-মূলক নহে। আমরা বিজ্ঞান-বিরহিত হইয়া, সকল ব্যবস্থারই তথ্য বিস্মৃত হইয়াছি। সুতরাং সকল বিষয়ই কুসংস্কার বলিয়া জ্ঞান করি, এবং স্বেচ্ছাধীনতা ও যথেচ্ছ আহার-বিহারই সভ্যতার চরম চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করি। আহার-বিহারের সহিত যে মনুষ্যপ্রকৃতিগঠনের ও ধর্ম্মের কোনপ্রকার সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার করিতেও ইচ্ছা করি না; এবং যদি কোন ব্যক্তি প্রাচীন প্রথানুসারে নিয়ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া, অশ্রদ্ধা করিয়া থাকি। পক্ষান্তরে যাঁহারা ব্যবহারকালে প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানশূন্য হওয়াতে, তাঁহাদের আচার কেবল পূর্ব্বানুগত সংস্কারমাত্রের উপরই স্থাপিত। সুতরাং আমাদের যে এইরূপ মতিভ্রম ঘটিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে বিষয়সকল পর্য্যালোচনা করিলে, প্রাচীন আর্য্যগণের সকল বিষয়ে অপরিসীম জ্ঞানবত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। উন্মাদরোগ প্রধানতঃ একটি মানসিক-বিকার; একটি স্থূলবস্তু—যাহাকে ঔষধ বলা যায়, তাহা—সেবন করিলে, এই মানসিক বিকার দূর হয়। কামবৃত্তি একটি মানসিক বৃত্তি; কোন বস্তু সেবন করিলে, সেই বৃত্তি প্রশমিত হয়; কোন বস্তু

ব্যবহার করিলে (যেমন মদ্য, মাংস. পলাণ্ডু ইত্যাদি আহার করিলে), এই কামবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই দেখিতেছি। সুতরাং আহার্য্য বস্তুর সহিত যে মানসিক প্রকৃতির প্রভূত সম্বন্ধ আছে, তাহা অতি অল্প প্রণিধানেই অবগত হওয়া যাইতে পারে। অতএব যিনি যেরূপ প্রকৃতি গঠন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তদনুরূপ আহার্য্য বস্তুরও ব্যবস্থা করিতে হয়। যিনি শান্ত, ইন্দ্রিয়দমনশীল হইয়া, ব্রহ্মবিদ্যালাভে প্রয়াস করিবেন, উত্তেজক বস্তুসকল তাঁহাকে আহার্য্য বিষয়ে বর্জ্জন করিতে হইবে। যিনি উৎসাহপূর্ণ ও বলান্বিত হইয়া, সংগ্রাম-কুশল হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বলোৎসাহবর্দ্ধক আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আহারের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। ঋষিগণও বস্তুশক্তি বিচার করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত, দেশকালবিবেচনায়, ভিন্ন ভিন্ন আহার্য্য বস্তু অবধারণ করিয়াছেন। ইহাতে কি তাঁহাদের বিজ্ঞান-প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়, না অযৌক্তিক কুসংস্কারের লক্ষণ প্রদর্শিত হয়? পাশ্চাত্য প্রদেশে এ সকল সূক্ষ্মবিচার এযাবৎ প্রবর্ত্তিত হয় নাই দেখিয়া, এবং পাশ্চাত্যদিগের বিজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া, আমরা আর্য্যদিগের আহারীয় বস্তুর ব্যবস্থাসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাকি। বস্তুতঃ এইসকল বিষয়ে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে, আর্য্যগণের ভৌতিক বিজ্ঞানও এক্ষণকার কালাপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন যে, রেশম ও পশম তড়িৎপ্রবাহের বাধা উৎপাদন করে; সুতরাং ইহারা তড়িতের অপরিচালক বস্তুর মধ্যে গণ্য। ভজনোপাসনা কালে, ঋষিগণও রেশমের অথবা পশমের বস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কারণ তৎকালে বাহিরের তড়িৎপ্রবাহের শরীরে প্রবেশ বিষয়ে বাধা জন্মান প্রয়োজন,

এবং মনঃসংযমদ্বারা স্বীয়দেহে যে প্রশান্ত তড়িৎপ্রবাহ উপস্থিত হয়, তাহারও বাহিরে নিক্রমণহেতু অপচয় নিবারণ করা প্রয়োজন। তৎকালে কুশ, অজিন, পশম নির্ম্মিত আসন এই সকলের উপর উপবেশন করিবার ব্যবস্থা আছে। কেবল মৃত্তিকার উপর এবং ধাতুময় স্থানোপরি আসন-স্থাপন নিষিদ্ধ আছে; কারণ পৃথিবী ও ধাতুসকল অতিশয় তড়িৎপরিচালক, এবং কুশাসন প্রভৃতি বস্তু তড়িৎপ্রবাহনিবর্ত্তক। যে স্থানে সাধক ব্যক্তি অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা সাধন করিয়াছেন, সেই স্থান তাঁহার দেহস্থ সুনির্ম্মল তড়িৎপ্রবাহে আপ্লুত হইয়া পবিত্র শক্তি ধারণ করিয়াছে; সুতরাং তৎস্থল অপর জীবগণের তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।* বস্তুতঃ, মহাত্মগণ যেস্থান বা যে বস্তু স্পর্শ করিয়াছেন, সেই স্থান এবং সেই বস্তুই তন্নিমিত্ত পবিত্রীকৃত হইয়াছে; অতএব অপরের পক্ষে পবিত্রতাসম্পাদনের নিমিত্ত তাহা আদরণীয় ও উপাদেয়। এতৎ সমস্তই বিজ্ঞান; ইহাতে কুসংস্কার কিছুই নাই। এইরূপে আর্য্যদিগের আচার ব্যবহারের ব্যবস্থা যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই দেখা যায় যে, তাঁহাদিগের বিধানসকল অপরিসীম বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত †।

* স্মৃতশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার স্থল এইটি নহে; সুতরাং এই স্থলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল না; কেবল সাধারণভাবে কয়েকটি যুক্তিদ্বারা দিগ্দর্শনমাত্র করা হইল। স্মৃতিশাস্ত্রের মূলে যে বিজ্ঞান আছে, এবং তাহা যে কুসংস্কারপ্রসূত বলিয়া পরিহার্য্য নহে, কেবল তাহাই প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সাধারণ বিষয় উল্লেখ করা হইল।

† প্রত্যেক পুরুষের প্রকৃতিগত শক্তি যে এইরূপে তৎসন্নিকৃষ্ট পদার্থসকলে সঞ্চারিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ওয়ালেসের একখানি গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি উদ্ধৃত করা হইল—

"The case of Jacques Aymar, whose powers were imputed by himself and others to the divining rod, but which were evidently personal, is one of the best attested on record and one which indisputably proves the possession by him of a new sense in some

পার্থিব পরমাণুসকল যে অবিনাশী ও আবহমান কাল বিরাজমান আছে, ইহাই পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের এ যাবৎ ধারণা ছিল; অতি অল্প দিনযাবৎ তড়িদ্বিষয়ক এবং অপর স্থূল ভূতগ্রামসম্বন্ধীয়

---

degree resembling that of many other clairvoyants. Mr. Baring Gould, in his "Curious Myths of the Middle Ages" gives a full account of the case with a reference to the original authorities. These are Mr. Chauvin, a doctor of medicine, who was an eye-witness who publishes his narrative; the Sieur Panthot, Dean of the College of Medicine at Lyons; and the Proces-verbal of the Procureur du Roi. The facts of the case are briefly as follows. On the 6th of July, 1692, a wineseller and his wife were murdered and the bodies found in their cellar in Lyons, their money having been carried off. A bloody hedging bill was found by the side of the bodies, but no trace of the murderers was discovered. The officers of justice were completely at fault, when they were told of a man named Jacques Aymar, who four years before, had discovered a thief at Grenoble, who was quite unsuspected of the crime. The man was sent for and taken to the celler, where his divining rod became violently agitated and his pulse rose as though he were in a fever. He then went out of the house and walked along the streets like a hound following a scent. He crossed the court of the Archbishop's palace and down to the gate of the Rhone when, it being night, the quest was relinquished. The next day, accompanied by three officers, he followed the track down the bank of the river to a gardener's cottage. He had declared that so far he had followed three murderers, but here two only entered the cottage, where he declared they had seated themselves at a table and had drunk wine from a particular bottle. The owner declared positively no one had been there; but Aymar on testing each individual in the house found two children who had been in contact with the murderers and these reluctantly confessed that on Sunday morning when they were alone, two men had suddenly

বিজ্ঞানের উন্নতিহেতু, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে যে, এই সকল পার্থিব ও জলীয় পরমাণু এতদপেক্ষা সূক্ষ্মতর শক্তিনিচয়ের সংঘর্ষ হইতে প্রসূত। কিন্তু বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্যঋষি ভগবান্ কপিলদেব ইহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, এই পার্থিব, জলীয় ও আগ্নেয় পরমাণু সকল তদপেক্ষা বহু সূক্ষ্ম মারুতিক পদার্থ

---

entered and had seated themselves and taken wine from the very bottle which had been pointed out. He then followed them down the river and discovered the places where they slept and the particular chairs or benches they had used. After a time he reached the military camp of sablon, and ultimately reached Beaucaire where the murderers had parted company, but he traced one of them into the prison, and among fourteen or fifteen prisoners pointed out a hunchback (who had only been an hour in the prison) as the murderer. He protested his innocence, but on being taken back along the road was recognised in every house where Aymar had previously traced him. This so confounded him that he confessed, and was ultimately executed for the murder.

During the process of this wonderful experiment which occupied several days, Aymar was subjected to other tests by the Procurator General. The hedging bill, with which the murder was committed with three others exactly like it, were secretly buried in different places in a garden. The diviner was then brought in; and his rod indicated where the blood-stained weapon was buried but showed no movement over the others. Again they were all exhumed and reinterred, and the comptroller of the Province himself bandaged Aymar's eyes and led him into the garden, with the same result. The two other murderers were afterwards traced, but they had escaped out of France. Pierre Gornier, Physician of the Medical College of Montepelier, has also given an account of various tests to which Aymar was subjected by himself, the Lieutenant General, and two other gentlemen to detect imposture; but they failed to discover a trace of decep-

হইতে উপজাত হইয়াছে। এই মরুৎ-শব্দে আমরা এক্ষণে যাহাকে বায়ু বলি, তাহা বুঝিতে হইবে না; এই বায়ুতে সূক্ষ্ম মরুতের সঙ্গে পার্থিব, জলীয় এবং আগ্নেয় পরমাণু সকল মিশ্রিত আছে। বস্তুতঃ এই চারিটির বিমিশ্রণেই এই বর্ত্তমান বায়ু গঠিত হইয়াছে। এই জগতে সকল বস্তুই মিশ্রিত বস্তু বলিয়া ঋষিগণ অবধারণ করিয়াছেন; তবে যে বস্তুতে ক্ষিত্যপ্‌তেজঃপ্রভৃতি পদার্থ মধ্যে যেটির অংশ অধিক, সেই বস্তুর সংজ্ঞা সেই পদার্থেরই অনুগামী হইয়াছে মাত্র। *

tion; and he traced the course of a man who had robbed the Lieutenant General some months before, pointing out the exact side of a bed on which he had slept with another man." Miracles and Modern Spiritualism by Professor A. R. Wallace, pp 56 to 58, Edition of 1875.

এই বৃত্তান্ত পাঠে দেখা যায় যে, হত্যাকারী ব্যক্তিসকল যে পন্থা অবলম্বনে গমন করিয়াছিল, যে বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়াছিল, যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, যে বোতল স্পর্শ করিয়া তাহা হইতে মদ্যপান করিয়াছিল, যে বালকদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তৎসমস্তের উপর তাহাদের শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। পুলিশকর্ম্মচারিগণ বহু চেষ্টায়ও তাহাদের কোন অনুসন্ধান পায় নাই। কিন্তু আইমার তৎকালে অলৌকিক শক্তিবলে অনেক দিনের পরও তৎসমস্ত চিহ্ন অবলম্বন করিয়া হত্যাকারীকে ধৃত করে। বস্তুতঃ প্রত্যেক মনুষ্যের দেহই তাহার প্রকৃতির অনুরূপ শক্তিসকলের আশ্রয়; সুতরাং প্রত্যেক ক্রিয়াতেই মনুষ্যদেহের সেই শক্তি বহির্গত হইয়া সেই সকল ক্রিয়ার সাধনভূত পদার্থসকলে যে সঞ্চারিত হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তাহা লক্ষিত হয় না সত্য; কিন্তু তন্নিমিত্ত তাহা অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রীলোকের লিখিত একখানি পত্র তড়িদ্‌যন্ত্রের নিকটে উপস্থিত করিলে, তাহার কার্য্য একপ্রকার হয়, পুরুষলোকের লিখিত অন্য একখানি পত্র উপস্থিত করিলে, অন্য প্রকার কার্য্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যেরই শক্তি তৎসংসৃষ্ট সকল পদার্থেই যে সঞ্চারিত হয়, তাহা নিশ্চিতরূপ এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে।

* আমরা যাহাকে বায়ু বলি, তাহাতে অমিশ্র সূক্ষ্ম বায়ুর অংশ অধিক, এই নিমিত্ত ইহাকে বায়ু বলা যায়। পরন্তু ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, এই বিমিশ্রিত বায়ু সপ্তপ্রকারে বিভক্ত হইয়া, সমস্ত লোক সকল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে; এই ভাগ সকলের নাম

ভগবান্ কপিলদেব যে সূক্ষ্ম "মরুৎ" পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা হইতে সূক্ষ্ম অদৃশ্য ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ পরমাণু সকল সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহার স্বরূপগত শক্তি স্পর্শ ও চলনশীলতা মাত্র, এবং তদ্ধেতুই ইহা জীবের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রামকে আঘাত করিতে পারে; এই আঘাত হইতেই সাধারণত আমাদের সূক্ষ্ম স্পর্শজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং ভগবান্ কপিলদেব এই মরুৎপদার্থকে মনুষ্যজ্ঞানের বিষয়রূপে স্পর্শশক্তিশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষণবিচারদ্বারা তড়িৎশক্তিকে কপিলোক্ত মরুত্তত্ত্ব বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু ঋষিগণ এই সূক্ষ্ম তড়িৎ অথবা মরুৎকেও উৎপত্তিশীল পদার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কপিলদেব ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম "আকাশ" নামে পদার্থ এই মরুতের জনকরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই নির্ম্মল অবিমিশ্র আকাশ তত্ত্বের তথ্য এযাবৎ পাশ্চাত্য মণ্ডলে প্রকটিত হয় নাই। সুতরাং পাশ্চাত্যবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া, সাধারণ লোকের বোধগম্য-রূপে এই তত্ত্বের প্রকটন অসম্ভব। ভারতীয় যোগিগণ কেবল সমাধি-যোগেই এই নির্ম্মল আকাশতত্ত্বের লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আকাশতত্ত্ব কেবল শব্দাত্মকরূপে জীবের বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়। এই শব্দকে ঋষিগণ অনাহত ধ্বনি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই "অনাহত" বিশেষণ দ্বারা, আমাদের শ্রুত সাধারণ

যথাক্রমে আবহ, প্রবহ, অনুবহ, সংবহ, বিবহ, পরাবহ এবং পরিবহ। পৃথিবীর অব্যবহিত উপরে দ্বাদশ যোজন (৪৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত) প্রদেশ-ব্যাপী বায়ুকে আবহ বলে, তদূর্দ্ধে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সমগ্র জ্যোতির্ম্মণ্ডল-ব্যাপী সূক্ষ্ম বায়ুর নাম প্রবহ, ইহাকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'ইথার' বলিয়া থাকেন। তদূর্দ্ধ লোকসকলে ব্যাপ্ত বায়ুকে অনুবহ প্রভৃতি নাম দ্বারা আখ্যাত করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য-প্রদেশে অদ্যাপি তাহার জ্ঞান প্রবেশ করে নাই। এই প্রবহ বায়ু আয়ত্তাধীন করিয়া ভারতীয় রাজর্ষিগণও কেহ কেহ লোকান্তরে গমন করিতে পারিতেন বলিয়া পুরাণাদিতে উল্লেখ আছে; কিন্তু ভারতীয় বিদ্যার লোপ হওয়াতে এক্ষণে তাহা আর বিশ্বাস-যোগ্যই নহে।

শব্দ হইতে ঋষিগণ আকাশতত্ত্বের মূলীভূত শব্দতন্মাত্রের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের যাবতীয় শব্দের পরিজ্ঞান হয়, তৎসমস্তই কোন না কোন প্রকার আঘাত হইতে উপজাত। স্থূল শরীরের কর্ণ নামক অংশ বিশেষের অভ্যন্তরে কর্ণশষ্কুলি নামে আখ্যাত একখণ্ড চর্ম্মাবরণ আছে; তাহা বায়ুদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সঞ্চালিত হইলে, সাধারণতঃ আমাদের সূক্ষ্ম শ্রবণেন্দ্রিয় কার্য্যোন্মুখ হয়; পরন্তু ঐ কর্ণযন্ত্রের বিনাশ অথবা বিপর্য্যয় ঘটিলেই যে জীবের সূক্ষ্ম দেহনিরবলম্ব শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিনাশ হয়, তাহা নহে; ঐ সূক্ষ্ম শ্রবণেন্দ্রিয়ই অদৃশ্য শব্দাত্মক আকাশকে বিষয় করিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করে। পরন্তু ভগবান্ কপিলদেব এই শব্দ-তন্মাত্রের অপেক্ষাও সূক্ষ্ম "অহংতত্ত্বকে" উক্ত শব্দতন্মাত্রের এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বর্গের উৎপত্তিস্থান বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার এইটি উপযুক্ত স্থল নহে; ব্রহ্মবিদ্যা সমালোচনা-কালে এই সকল তত্ত্বের বিশেষরূপে বর্ণনা করা যাইবে। এই স্থলে এইমাত্র বলিয়া উপসংহার করা যাইতেছে যে, এই বিশুদ্ধ অনাহতশব্দের কিঞ্চিৎ আভাস খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রধানতম ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশুখৃষ্ট ভারতের সাধক মহাত্মাদিগের সংসর্গলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, এক্ষণে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তন্নিমিত্তই হউক, অথবা পরম্পরাসূত্রে ভারতীয় যোগজ্ঞান এশিয়া-মাইনর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়াতে তত্তদ্দেশবাসী কোন কোন সাধকের নিকট পূর্ব্ব হইতে ইহা কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হওয়ার নিমিত্তই হউক, *

* ভারতীয় জ্ঞানালোচনা যে এশিয়া-মাইনর প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল, এমন কি মিসরদেশবাসিগণও যে তাঁহাদের উচ্চজ্ঞান ভারতবাসী হইতে প্রাচীনকালে লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

বাইবেল গ্রন্থে এই স্থূল দৃশ্যমান বহির্জ্জগতের মূলীভূত শব্দতন্মাত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলে উক্ত আছে "In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God"—(সৃষ্টির আদিতে শব্দমাত্র ছিল, সেই শব্দ পরমেশ্বরে অবস্থিত ছিল, এবং সেই শব্দরূপই পরমেশ্বর)। এই যে "শব্দের" কথা বাইবেলে উল্লেখ আছে ইহা আঘাত হইতে উৎপত্তি-প্রাপ্ত শব্দ নহে। এই পঞ্চভূতাত্মক বহির্জ্জগতের সৃষ্টির আদিস্থিত পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ আকাশতত্ত্ব, যাহা অনাহত শব্দরূপে জীবাত্মার গ্রাহ্য হয়, সেই শব্দই সকল ভৌতিক সৃষ্টবস্তুর মূল উপাদান কারণ; এবং তাহাই পূর্ব্বকথিত বাইবেলোক্ত বাক্যের বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণও ইহাকেই মূল "শব্দব্রহ্ম" ও ইহ জগতের উৎপত্তিস্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সূক্ষ্ম অনাহত শব্দ এবং তদ্বোধকারী সূক্ষ্ম জীবেন্দ্রিয়গণ উভয়ে অহংতত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত, এবং অহংতত্ত্বেরও পুনরায় উৎপত্তিস্থান মহত্তত্ত্ব বলিয়া ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ অবধারণ করিয়াছেন। সুতরাং এই ভূতগ্রাম-সমন্বিত জাগতিক সম্পূর্ণ বিজ্ঞান যে আর্য্য ঋষিগণ অবগত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এক্ষণকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের জ্ঞান প্রভূত হইলেও, আর্য্যদিগের জ্ঞানের তুলনায় ইহা বাল্যক্রীড়া মাত্র।

ষষ্ঠতঃ-- বাণিজ্য, ব্যবসায়, শিল্পনৈপুণ্য ইত্যাদি বৈশ্যজাতীয় ব্যবসায়-বিষয়েও প্রাচীন ভারতবাসিগণ কোন প্রকারে হীন ছিলেন না। ঋগ্বেদে পর্য্যন্ত সমুদ্রগামী পোতসকলের এবং ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের সামুদ্রিক-যানারোহণে সমুদ্রযাত্রার বিষয় উল্লিখিত আছে এবং মনুসংহিতায়ও রাজা সমুদ্রগামী যানসকলের শুল্ক অবধারণ করিবেন, এরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। *

* ঋগ্বেদ, তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ৫৫ সূক্ত, ৬ষ্ঠ ঋক্; ৫ম অষ্টক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়,

ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতবাসিগণ সমুদ্রযাত্রায় নিপুণ ছিলেন। ভারতবর্ষীয় রাজা তুগ্রের পুত্র ভুজ্যের, সেনাদল সমভিব্যাহারে সামুদ্রিক পোতারোহণে দ্বীপান্তর জয় করিবার জন্য যাত্রা করা, ঋগ্বেদের ১ম অষ্টকের, ১১৬ সূক্তের সায়নভাষ্যে উল্লেখ থাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকল এক্ষণে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং ভারতীয় গ্রন্থ হইতে সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া এক্ষণে কঠিন; তবে অন্যান্য দেশে দুই তিন সহস্রবর্ষের পূর্ব্বের ইতিহাস এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তদ্দৃষ্টে ইউরোপ এবং এশিয়াখণ্ডে ভারতবর্ষীয় অর্ণবযান সকল যে নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য লইয়া গমন করিত, তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা নিঃসন্দেহরূপে এক্ষণে অবধারণ করিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত জাবাদ্বীপে প্রাচীন ভারতবাসিগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; শকট্রাদ্বীপেও হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া পাশ্চাত্যগ্রন্থে প্রকাশিত আছে। রোমের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, দুই সহস্রবৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদিগের একখানি বাণিজ্য ব্যবসায়ী অর্ণবপোত ইউরোপের উত্তরপশ্চিমাংশস্থিত সমুদ্রে জলমগ্ন হয়; কয়েকজন ভারতবাসী যুবক তাহাতে অব্যাহতি পায়, ও তাহারা প্রথমে জার্ম্মণীতে ও পরে তথা হইতে রোমনগরে আনীত হয়।* আফ্রিকা প্রদেশস্থ মীস্বরদেশ প্রাচীনকালে ভারতবাসিগণের বাণিজ্যের একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল। ইউরোপঅঞ্চলে কোন কোন স্থানে সংস্কৃত অক্ষরে খোদিত

---

৮৮ সূক্ত; ১ম অষ্টক, ৮ম অধ্যায়, ১১৬ সূক্ত, ৪র্থ ঋক্ ও সায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য; এবং ১ম অষ্টক, ৪৮ অধ্যায়, ৩ সূক্ত; ঐ অষ্টক ৫৬ অধ্যায় ২ অষ্টক। মনুসংহিতা, ৮ম অধ্যায়, ৪০৬।৪০৮।৪০৯ শ্লোক।

* পুরাকালের রোমদেশীয় পণ্ডিতবর প্লিনি তাঁহার "Natural History" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। Pliny's Natural History, Book II, ch. 67.

পদক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সেই স্থানে ভারতবর্ষের লোকের যাতায়াত ছিল। কিছুদিন হইল, জনৈক সম্ভ্রান্ত জাপানী ভদ্রলোক, পরিভ্রমণ উপলক্ষে কালকাতায় আসিয়াছিলেন; তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাপানে প্রাচীন কালিকামূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এমন কি, প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারস্থিত আমেরিকা অঞ্চলে পিরু নামক স্থানে প্রাচীনকাল হইতে "রামসীতার" মেলা হওয়া এবং তদ্দেশ-বাসী রাজন্যগণের সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেওয়া প্রকাশিত হইয়াছে; গণপতি দেবতার মূর্ত্তি তথায় পূজিত হওয়াও জানা গিয়াছে, এবং বুদ্ধ-দেবের প্রাচীন প্রস্তরময় মূর্ত্তিসকল তথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ যে তথায় ইউরোপীয় কলম্বস যাইবার বহুপূর্ব্বে গমন করিয়া-ছিলেন, তদ্বিষয়েও ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। তথাকার অনেকানেক স্থানের নামও সংস্কৃত ভাষার নামের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়; যেমন "গোয়াতেমালা" নামটি "গৌতমালয়" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই সিদ্ধান্ত কয়া যায়। অতএব স্পষ্টই অনুমান হয় যে, প্রাচীন ভারতবাসিগণ প্রশান্ত মহাসাগরও অতিক্রম করিয়া, আমেরিকা অঞ্চলে যাতায়াত করিতেন এবং তথায় সম্ভবতঃ উপনিবেশও সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমেরিকা অঞ্চলের পিরু নামক স্থানবাসীদিগের প্রধান বাৎসরিক উৎসবের নাম "রামসীতার উৎসব" থাকা প্রভৃতি কারণ উল্লেখ করিয়া এসিয়াটীক সুসাইটীর সভাপতি সুবিখ্যাত সার উইলিয়াম জোন্স্ সাহেব অষ্টাদশতম খৃষ্টশতাব্দীর শেষ-ভাগে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ একই জাতীয় লোক ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। (Asiatic Researches vol 1. Third Discourse p 426)। পরন্তু ভারতবর্ষে অযোধ্যাপ্রদেশে যে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল, এবং দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি তাঁহার কীর্ত্তিস্থানসকল অদ্যাপি যে ভারতবর্ষেই

বর্ত্তমান আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ বুদ্ধদেবের প্রাচীন মূর্ত্তিসকল এক্ষণে আমেরিকায় আবিষ্কৃত হওয়াতে, এসিয়াখণ্ডবাসী যে আমেরিকা মহাদেশে গমনাগমন করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবধারণ করা যায়। গ্রীস্‌দেশীয় ষ্ট্রাবো প্রভৃতি কোন কোন প্রাচীন লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারত-বর্ষের রণতরীসকল সমুদ্রে তৎকালেও বিচরণ করিত; নানাপ্রকার মণিমাণিক্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, পশম ও রেশম-নির্ম্মিত উত্তম বস্ত্র, দারুচিনি প্রভৃতি নানা প্রকার মস্‌লা, চন্দনাদি নানাপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য, ভারতবর্ষ হইতে প্রাচীনকালে ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে রপ্তানী হইত। বিদেশীয় গ্রন্থে, এমন কি বাইবেল্ গ্রন্থে, প্রাচীনকালের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, ভারতবর্ষীয় পণ্যদ্রব্যসকল অতি আদরের সহিত সমুদ্রপারস্থিত বিদেশ বাসিগণ গ্রহণ করিতেন। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে যে প্রাচীন ভারতবাসিগণ সবিশেষ উন্নত ছিলেন, তদ্বিষয়েও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

মহাভারতে, রাজন্যবর্গের পরিচ্ছদ, তাঁহাদের সভানির্ম্মাণপ্রণালী, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট আসন, গালিচা, সাজসজ্জা প্রভৃতি যেসকল শিল্পনৈপুণ্য-পূর্ণ বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহা কোন দেশে অদ্যাপি অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না! রাজসূয় যজ্ঞে যে স্ফটিকময় রাজসভা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে, যাহাতে রাজা দুর্য্যোধনের জলে স্থলভ্রম ও স্থলে জলভ্রম হইয়াছিল এবং যাহা দেখিয়া তিনি সর্ব্ব-প্রকারে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ সভা কি এযাবৎ অন্য কোন দেশে হইয়াছে? ইলোরার প্রস্তরে খোদিত মন্দিরসকল এযাবৎও পৃথিবী-তলস্থ সকলদেশীয় লোকের অননুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে। প্রাসাদ-প্রভৃতি নির্ম্মাণে যে ভারতবর্ষে স্ফটিকের ব্যবহার ছিল, তাহা কেহ

অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং মহাভারতের লিখিত বৃত্তান্ত অবিশ্বাস করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

সপ্তমতঃ—সাধারণ রীতিনীতি, আইন ও ব্যবহার-শাস্ত্র দ্বারাও ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ লোকের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণ গ্রন্থে ভগবান্ বাল্মীকি ত্রেতাযুগে ভারতবর্ষীয় জনসমাজের যেরূপ পবিত্রতা ও মনোহারিতা বর্ণনা করিয়াছেন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা তত্তুল্য-রীতিনীতিপূর্ণ সমাজ, এক্ষণে কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় কি? কলিযুগের প্রারম্ভেও মহাভারতে যেরূপ সামাজিক অবস্থার উল্লেখ আছে, তাহারও তুলনা অন্য কোনস্থানে পাওয়া যায় না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লেখ আছে যে, বিদেহ-প্রদেশে করালনামক জনকবংশীয় রাজার যজ্ঞীয় সভায় পণ্ডিতগণের মধ্যে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় এক বিচার হইয়াছিল; তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব, এতৎসমস্তই আলোচনার বিষয় ছিল। এই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতসভায় গর্গবংশোদ্ভবা একজন ব্রাহ্মণকুমারী এইরূপ কঠিন বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। যেদেশে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধেরও বহু বহু সহস্রবর্ষপূর্ব্বে স্ত্রীলোকসকল এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্না হইয়াছিলেন, সেই দেশের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ কি আর অন্য প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করা আবশ্যক? উপনিষদুক্ত যে ব্রহ্মবিদ্যা এক্ষণে পৃথিবী-মণ্ডলস্থ সমুদয়জাতীয় উচ্চ পণ্ডিতদিগেরও বুদ্ধির অগম্য হইয়া রহিয়াছে, সেই ব্রহ্মবিদ্যা ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্যক্ উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃহদারণ্যক শ্রুতি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন। মৈত্রেয়ী সেই দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মবিদ্যা—যাহা উক্ত আরণ্যক শ্রুতিতে প্রকাশিত আছে, তাহা—পতিহইতে লাভ করিয়া সম্যক্ ধারণ করিয়াছিলেন। কপিলদেব সম্যক্ সাংখ্যবিদ্যা স্বীয় মাতা দেবহুতিকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং তিনিও তাহা সম্যক্ ধারণা করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান

কালে এই সাংখ্যশাস্ত্র বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু কয়জন পুরুষ আছেন, যাঁহারা এই সাংখ্যবিদ্যা ধারণ করিতে সমর্থ? পরন্তু পুরাকালে ভারতবর্ষে রমণীগণও তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই দেশের প্রাচীন গৌরবের কি এতদধিক পরিচয় আবশ্যক আছে?

ক্ষত্রিয় রাজগণ দেশের সুশাসনের নিমিত্ত যেরূপ সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমাদিগের কলুষিত সমাজে ধারণাও হয় না। প্রজারঞ্জনের নিমিত্তই রাজার অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং তাঁহারা রাজনীতি সম্যক্ অবগত ছিলেন। দার্শনিক ভিত্তির উপর এতদ্দেশীয় রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেসকল রাজব্যবহারশাস্ত্র (আইন) এইদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা মনুসংহিতাপ্রভৃতি ব্যবহারশাস্ত্রে এবং মহাভারত-প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য রাজ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অপরাপর দেশে প্রবর্ত্তিত ব্যবহারশাস্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতবাসিগণকে কোন প্রদেশের লোকেই ব্যবহারশাস্ত্রের উৎকর্ষ বিষয়ে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই।

মহাভারত ও রামায়ণাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া, ভারতীয় প্রাচীন জন-সমাজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, তাহা এক্ষণকার কালের তুলনায় স্বর্গ-স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। কোন স্থানে শংসিতব্রতধারী পরমহংসগণ ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিয়া, নির্ব্বাতপ্রদীপবৎ একান্তচিত্তে পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিয়া, চতুর্দ্দিকে শান্তি বিস্তার করিতেছেন; কোন স্থানে বা আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র শিষ্যসহ সমবেত হইয়া, নানাসুস্বরসমন্বিত সামগান-দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিতেছেন; কোন স্থানে স্বর্ণরৌপ্যাদিখচিত বিবিধস্তম্ভসমন্বিত উজ্জ্বল সিংহাসনযুক্ত বৃহৎ সভামণ্ডলী, উত্তম ও মহার্ঘ-পরিচ্ছদবিশিষ্টমণিমাণিক্যসমলঙ্কৃত মুকুটরাজিশোভিত রাজন্যবর্গ ও গম্ভীর-

মন্ত্রণানিরত মন্ত্রিবর্গদ্বারা শোভা বিস্তার করিতেছে; কোন স্থানে বা পণ্ডিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী বিশুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া, জগত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সমালোচনা করিতেছেন; কোন স্থানে বীরগণ নানাবিধ ধনুর্ব্বিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন ও শিক্ষা প্রদান করিতেছেন; কোন স্থানে বা রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈনিকগণ পরস্পরের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া, আপন আপন যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিতেছেন, এবং দর্শকবৃন্দ উৎসাহান্বিত-লোচনে তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন; কোন স্থানে বা সুদর্শন বেশভূষায় সজ্জিত বণিগ্‌গণ মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য ও অলঙ্কার, নানাবিধ বস্ত্র, নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য, নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রদর্শন করিয়া, ক্রেতাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন; কোন স্থানে বা কৃষিজীবিগণ রাজপুরুষদিগের সহিত একত্র হইয়া, নানাপ্রকার কৃষিকার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিতেছেন; শিল্পজীবিগণ পুরুষানুক্রমে আপনআপন ব্যবসার উন্নতি সাধন করিতেছেন; দাসদাসীগণ প্রফুল্লমনে সুসজ্জিত হইয়া, আপনআপন প্রভুর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন; স্ত্রীসকল শোভন পরিচ্ছদ ও নানাবিধ অলঙ্কারে আবৃত হইয়া, জনসমাজের প্রফুল্লতা সম্পাদন করিতেছেন; বালকগণ পিতৃভক্ত মাতৃভক্ত ও গুরুভক্ত, এবং আপন জাতিগতবিদ্যাশিক্ষার্থ যত্নশীল; স্ত্রীসকল উত্তম-ধর্ম্মনীতি-সম্পন্না, তপশ্চরণে অনুরক্তা, আলস্যবর্জ্জিতা, গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা এবং স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী; জনসমাজ নীতি ও ধর্ম্মানুশীলনে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ; পরিবারসকল প্রীতি পবিত্রতা ও শান্তির আবাসভূমি; চৌর, দস্যু প্রভৃতির উপদ্রব, মিথ্যাভাষণ ও কপটাচার অতিশয় বিরল; রাজা দুরাচারীদিগের শাসনব্যবস্থা করিতে অকপটভাবে সতত যত্নশীল; প্রজার ধর্ম্ম ও সমৃদ্ধি সম্পাদন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এইত ভারতীয় প্রাচীন সমাজের আদর্শ। নগরসকল

বহুতল-বিশিষ্ট অট্টালিকায় পরিপূর্ণ; রাজপথসকল প্রশস্ত, এবং সুস্নিগ্ধ ও সময়ে সময়ে সুগন্ধি বারিদ্বারা অভিষিক্ত; দুর্গসকল নানা কৌশলে গঠিত ও রক্ষিত; উদ্যানসকল নানারম্যবস্তুসমন্বিত হইয়া নগরের গবাক্ষদ্বারস্বরূপে অবস্থিত; গ্রামসকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সর্ব্বপ্রকার শিল্পিজাতি ও কৃষক এবং দাসদাসীদ্বারা পরিপূরিত এবং প্রত্যেকেই স্বপ্রতিষ্ঠ; গ্রামাধিপতি ও গ্রামরক্ষকগণ সর্ব্বদা গ্রামের উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত; মাঠসকল শস্যপূর্ণ; বাপী, কূপ, তড়াগসকল সুস্বাদযুক্ত জলে পূর্ণ; অতিথিগণ সর্ব্বত্র আদৃত। এই ভারতবর্ষের প্রাচীন দৃশ্য মহাভারতাদি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। এমন যে কলির অবতার দুর্য্যোধন রাজা, তাঁহার শাসনাধীন থাকিয়াও, সাধারণ প্রজাবর্গ এইরূপ সুখ-সমৃদ্ধিতেই বাস করিতেন। যে ঋষিগণ এইসকল সমাজপ্রণালীর নিয়ন্তা, যাঁহারা ব্রহ্ম-বিদ্যা, অস্ত্র-বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, রাজনীতি, ব্যবহারনীতি, শিল্পবাণিজ্যনীতি, সকল বিষয়ের উপদেষ্টা ছিলেন, যাঁহাদের সর্ব্বদর্শিতাগুণে ভারতবর্ষ এইরূপ সুখসমৃদ্ধিশালী হইয়া, পুণ্যাত্মা জনগণের আবাসভূমি হইয়াছিল. যাঁহাদের অনুশাসনগুণে ভারতবর্ষ বিদেশবাসীদিগের নিকটে রত্নগর্ভা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের কৃপায় ভারতভূমিকে বিদেশীয় ইতিহাস-লেখকগণ সুবর্ণ, রজত প্রভৃতির আলয় বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সেই ঋষিগণের জ্ঞানোৎকর্ষের বিষয় কি আর অন্য প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করিতে হইবে? মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি সমস্তই, আরব্য উপন্যাসের ন্যায় অলীক বলিয়া, যদি উড়াইয়া দেও, তবে অবশ্য ঋষিদিগের জ্ঞানোৎকর্ষ বিষয়ে এই বিশেষ প্রমাণের হানি হয়। কিন্তু যাঁহাদিগের কল্পনায়ও এইরূপ জনসমাজের আদর্শ বর্ত্তমান ছিল, তাঁহারা যে এই আদর্শ লাভ করিতে প্রযত্ন করেন নাই, ইহা সহজে বিশ্বাসযোগ্য নহে। মহাভারতাদি গ্রন্থ যেরূপে রচিত, তদ্দৃষ্টে ইহা কখনই অনুমিত হয় না

যে, এইসকল গ্রন্থ কেবল কাল্পনিক, এবং তৎকালের সামাজিক অবস্থার বিপরীতরূপে কেবল কল্পনামূলে এইসকল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। আবহমান কাল হইতে সমগ্র ভারতবর্ষীয় লোকের ধারণা এইসকল গ্রন্থের লিখিত বিবরণের সত্যতারই অনুকূল। অবশেষে বক্তব্য এই যে, এই বহুসহস্রবর্ষব্যাপী অরাজকতা ও বিপ্লবদ্বারাও ভারতীয় জনসমাজের আভ্যন্তরিক শান্তি ও সুশৃঙ্খলা যে একদা দূরীভূত হয় নাই, ইহাই প্রাচীন আর্য্য-সমাজের অভাবনীয় উৎকর্ষের যথেষ্ট প্রমাণ। অপর কোন দেশীয় সমাজের এইরূপ শক্তি থাকা দৃষ্ট হয় নাই।

উপসংহার।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন সাধকগণ, যদিও প্রায় গোপনে থাকিয়াই আপনাদের সাধনরহস্যরক্ষা করেন, তথাপি বর্ত্তমানকালেও কখন কখন তাঁহারা ঘটনাচক্রে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তখন তাঁহাদের অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া, সর্ব্বলোক চমৎকৃত হইয়াছে। রুণজিৎ সিংহের সময়ে হরিদাসনামক সাধুকে কোন কোন ইউরোপীয় রাজপুরুষও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি সমাধিস্থ হইয়া, বাহ্যেন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহার পূর্ব্বক, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, সুদীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে পারিতেন। ১৭৬৮ শকাব্দার চৈত্র মাসে ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁহার বিবরণ নিম্নোক্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল:—

"রণজিৎ সিংহের রাজ্য পঞ্জাবেতে একজন যোগী দৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি যথেচ্ছকালপর্য্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে বাস করিতে পারিতেন। জেনেরল বেঞ্চুরা-নামক একজন ফরাসীস ইঁহার প্রতি সন্দেহ করিয়া, পরীক্ষা জন্য

তাঁহাকে মৃত্তিকামধ্যে স্থাপিত করেন এবং তিনি ও কাপ্তেন ওয়েড্ সাহেব তাঁহাকে মৃত্তিকা হইতে উত্থানকালে দৃষ্টি করেন। তাঁহার এই সংক্ষেপ বিবরণ যথা ঃ—একদা সেই যোগী রণজিৎ সিংহের আদেশ-অনুসারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এবং কর্ণ ও নাসিকারন্ধ্র এবং মুখভিন্ন অন্য অন্য শরীরদ্বার মধূচ্ছিষ্ট অর্থাৎ মোম দ্বারা বন্ধ করিলেন, এবং এক পট্টের গোণীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জিহ্বা ব্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নিদ্রিতবৎ হইলেন। তদনন্তর তাহাতে রণজিৎ সিংহের নাম মুদ্রিত করিয়া, তাঁহার লোকেরা তাহা সিন্ধুকমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক বন্ধ করিলেন, এবং সেই সিন্ধুক মৃত্তিকা-মধ্যে রক্ষা করিয়া, তদুপরি যব বপন করিলেন। তাহার রক্ষা জন্য সে স্থানে রক্ষক স্থাপিত হইল। দশ মাস পর্য্যন্ত সেই যোগী মৃত্তিকামধ্যে মগ্ন ছিলেন; ইতিমধ্যে রণজিৎ সিংহ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদ জন্য দুইবার সেই স্থান খনন করিতে অনুমতি করেন, এবং দুইবার তাঁহাকে সমানরূপ অচেতন দেখেন। দশ মাস পূর্ণ হইলে, যখন তাঁহাকে উত্তোলন করা যায়, তখন তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রাণহীন বোধ হইয়াছিল। তাঁহার সমুদয় শরীর শীতল, কেবল ব্রহ্মরন্ধ্র অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। তদনন্তর প্রথমতঃ তাঁহার জিহ্বাকে আকৃষ্ট করিয়া সহজ অবস্থাতে আনয়ন করিলে এবং তাঁহাকে উষ্ণজলে স্নান করাইলে দুই ঘণ্টা মধ্যে তিনি পূর্ব্ববৎ স্বস্থ হইলেন। যৎকালে তিনি পৃথিবীমধ্যে মগ্ন থাকেন, তখন তাঁহার নখ কেশ প্রভৃতি বৃদ্ধি হয় না। তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মৃত্তিকামধ্যে অবস্থিতি কালে তিনি পরমানন্দে মগ্ন থাকেন।

কলিকাতার সমীপবর্ত্তী ভূকৈলাসের সুন্দরবনস্থ জমিদারীমধ্যে ১৭৫৪ শকাব্দায় একটি মৃন্ময় ঢিপির মধ্যে একজন যোগী পুরুষ আবিষ্কৃত হয়েন। তাঁহার সম্বন্ধে ১৭৬৮ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এইরূপ

W. G. Osborne's Court and Camp of Ranjeet Sing, p. 124.

বৃত্তান্ত লেখা হয় যে, তিনি "সর্ব্বদা বাহ্যজ্ঞানশূন্য থাকিতেন; তাঁহার যোগভঙ্গ জন্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার গ্রেহাম সাহেব তাঁহার নাসিকারন্ধ্রের নিকট এমোনিয়া নামক অতি উৎকট ইংরাজি ঔষধ ধারণ করেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার যোগভঙ্গ হয় নাই; কেবল স্পন্দনমাত্র হইয়াছিল।"

সম্প্রতি কলিকাতার উত্তর প্রান্ত হইতে অৰ্দ্ধ মাইল ব্যবধানে শ্রীযুক্ত হরেরাম গোয়েনকার বাগান বাড়ীতে একটি যোগী পুরুষ কয়েক মাস যাবৎ অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি ১৫ দিবস পর্য্যন্ত সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। তাঁহার কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি সমাধিতে বসিবার সময়ে যেরূপ অবস্থায় থাকে, সমাধিহইতে যখন তিনি উত্থিত হয়েন, তখন ঠিক তদ্রূপই থাকে; কোন প্রকার ইতরবিশেষ হয় না। গত প্রয়াগের কুম্ভের মেলায়ও অনেক অলৌকিক-ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজী পায়োনিয়ার প্রভৃতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপ অলৌকিক-ক্ষমতাপন্ন পুরুষসকল সম্প্রতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে অনেক পাশ্চাত্য-প্রদেশবাসী পুরুষদিগেরও দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা বর্ণন করিয়াছেন। পরন্তু এক্ষণকার পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবলে এই সকল যোগী মহাপুরুষদিগের অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং প্রাচীন ঋষিদিগের অলৌকিক শক্তিবিষয়ে সন্দেহ করিবার পক্ষে কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। সর্ব্ববিষয়ে এযাবৎ তাঁহাদের যেরূপ অপরিসীম জ্ঞানবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের বর্ণিত কোন বিষয়ে আপাততঃ দোষ দৃষ্ট হইলে, তাঁহাদের যথার্থ ভাব আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই বলিয়াই মনে করা উচিত; তন্নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিতে সহজে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ভারতীয়-প্রাচীন-গৌরব-নামক তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ—

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা।

প্রথম অধ্যায়—চতুর্থ পাদ।

জাতিভেদবিচার।

আর্য্য ঋষিগণের সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান বিষয়ে সন্দিহান হইবার আর একটি কারণ বর্ত্তমানকালে অনেকেরই অন্তরে উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবর্ষে যে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অবশ্য ঋষিগণের অনুমোদিত, এবং তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রে এই জাতি-ভেদপ্রথার সবিশেষ পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়; স্মৃতিগ্রন্থমাত্রেই দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণজাতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, সকল শ্রেণীর লোককেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট মস্তক অবনত করিতে আদেশ করা হইয়াছে; দান করিতে হইলে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে; অন্যজাতীয় পঙ্গু, খঞ্জ, প্রভৃতি সামান্য আহার্য্য মাত্র পাইতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত দানের পাত্র ব্রাহ্মণেরাই। এইরূপ নানা স্থানে ব্রাহ্মণদিগের অনুকূল নানারূপ ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। এইসকল স্মৃতির প্রণেতা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণই; সুতরাং স্বজাতীয় উন্নতির নিমিত্ত স্বার্থপর হইয়া, তাঁহারা এই সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিতে হইবে। অপরজাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেককে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে দেখা যায়; সুতরাং এই জাতিভেদ-প্রথার মূলে কোন-প্রকার বিজ্ঞান নাই, কেবল স্বার্থপরতাই ইহার মূল বলিয়া অনুমিত

হয়। এই জাতিভেদ বর্ত্তমান থাকায়, ভারতবর্ষে একতা সম্পাদিত হইতে পারে না, এবং ইহাই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবনতির একটি প্রধান কারণ। সুতরাং এই জাতিভেদপ্রবর্ত্তক অনিষ্টকর নীতি যে ঋষিগণের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদর্শী অভ্রান্ত জ্ঞানী বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায় ?

এতৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষের জাতিভেদ বাস্তবিক স্বার্থপরতাহইতে প্রসূত নহে। এক্ষণে সমাজে যে আকারে জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত আছে, তদ্দৃষ্টে অনেকেই এইরূপ মনে করিতে পারেন, সন্দেহ নাই, যে ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতা হইতেই এই জাতিভেদ সৃষ্টি-প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সবিশেষ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত-প্রস্তাবে এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। সকল শাস্ত্রই ব্রাহ্মণকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা যে অপর সকল-জাতীয় লোকের সম্মানার্হ ও সেবনীয়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, এই কথা সত্য। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের সাংসারিক সমৃদ্ধিলাভের নিমিত্ত তাঁহাদিগের প্রতি এই মর্য্যাদার ব্যবস্থা করা হয় নাই। ব্রাহ্মণ কখনও ধনী হইবেন না, তপস্যাই তাঁহার প্রধানতম কার্য্য, ব্রাহ্মণেরা সঞ্চয়ী হইবেন না, তাঁহারা আপৎকাল ভিন্ন অন্য কোন সময়ে কোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করিবেন না, তাঁহারা কখনই রাজা হইবেন না. তাঁহারা আপৎকালভিন্ন যুদ্ধব্যবসায় করিবেন না, জ্ঞানালোচনা ও তপস্যাই তাঁহাদিগের কর্ম্ম। তাঁহারা কুশ-শয্যায় শয়ন করিবেন, সর্ব্বপ্রকার বিলাসবর্জ্জিত অন্নপানাদি গ্রহণ করিবেন, বিচিত্র বেশভূষা পরিধান করিবেন না, নিজে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া উপযুক্ত সৎশিষ্যদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। আপনাদিগের নিমিত্ত যাঁহারা স্বয়ং এইরূপ জীবনই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা কি স্বীয় বৈষয়িক "স্বার্থ-সিদ্ধির"

নিমিত্ত অপরজাতিহইতে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বলিতে হইবে? বস্তুতঃ এক্ষণকার কালেও, অন্যান্য দেশে যেসকল ব্যক্তি এইরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা কি সমাজে অপর সকল শ্রেণীর লোকের আদরণীয় ও সম্মানার্হ হয়েন না? এবং এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধি হওয়া কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে? যদি সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তবে যিনি সমাজের মঙ্গলবিধান করিবেন, তাঁহাকে কি এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত হয় না যে, এইরূপ উন্নত-প্রকৃতি তপস্বী ও জ্ঞানী এবং জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের যেসকল সামান্য সাংসারিক অভাব হয়, রাজা-প্রজা-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক তাহা মোচন করিতে যত্নপর হইবেন? এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ করিয়া, যাহাতে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক উদ্বেগ-বিমুক্ত হইয়া তপঃসাধন এবং জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে রাজা সর্ব্বদা যত্নবান্ হইবেন? বস্তুতঃ ঋষিগণ অপর সকলজাতীয় লোকের প্রতিই যে এইরূপ তপস্যানিরত ব্রাহ্মণদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা জগতের কল্যাণের নিমিত্তই করিয়াছেন বলিয়া, কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের গ্রন্থাদি পাঠ করিলে, অনায়াসে জানিতে পারা যায়।

সুতরাং সামাজিক সুশৃঙ্খলার দিক্‌হইতে বিচার করিলে, শাস্ত্র-বিধানোক্ত ব্রাহ্মণদিগের পূজার্হতা স্বার্থপরতামূলক বলিয়া বলা যাইতে পারে না। পরন্তু ব্রাহ্মণগণই দানের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য-পাত্র বলিয়া যে ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যে কেবল সামাজিক সুশৃঙ্খলা-স্থাপনের অভিপ্রায়েই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এইরূপ তাঁহাদের গ্রন্থপাঠে বোধ হয় না। দান-কার্য্য স্বার্থ-ত্যাগ-বোধক; এই স্বার্থত্যাগকে সকল-দেশীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই অতি উৎকৃষ্ট পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে।

যাঁহারা কোনও ধর্ম্মের অনুসরণ করেন না, তাঁহারাও স্বার্থত্যাগী পুরুষকে অতি উচ্চমনা পুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। সুতরাং স্বার্থত্যাগ-রূপ দানকার্য্য যে পুণ্যকার্য্য, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত বলা যাইতে পারে। ঋষিগণ দিব্যদর্শী ছিলেন, তাঁহারা কর্ম্মসকলের ফলাফল সুচারুরূপে অবগত হইয়া বলিয়াছেন যে, এই দান ব্রহ্মনিষ্ঠ, তপস্যানিরত, সদ্ব্রাহ্মণে প্রযুক্ত হইলে, ইহা দাতার ইহ ও পরকালে পরম-কল্যাণসাধন করে। বিচার করিয়া দেখিলেও ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্য্য-মাত্রই কোন না কোন প্রকার ফলোৎপাদন করে। দান কর্ম্মও যখন একটি কর্ম্ম, তখন তাহাদ্বারা দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের কোনও বিশেষ ফল অবশ্যই উপজাত হইবে, এবং সেই ফল পরস্পরের অবস্থার উপর অবশ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে। দান-প্রাপ্ত হইয়া গ্রহীতার মনে সন্তোষ উপজাত হয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দানের এই ফল; গ্রহীতার সন্তোষ উৎপাদন করাতে প্রীতিপূর্ব্বক দানকর্ত্তারও আন্তরিক সন্তোষ লাভ হয়; গ্রহীতার সন্তোষ দাতার উপর কার্য্য করিয়া তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করে। ক্রমশঃ এই সন্তোষ উত্তরোত্তর দান-কার্য্য দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, দাতার চিত্তকে আনন্দপূর্ণ করে। ইহজগতের কৃত কর্ম্মসকলের সংস্কার লইয়া, জীব দেহ পরিত্যাগ করেন; সুতরাং মৃত্যুর পরেও এই আনন্দোৎপাদক সংস্কারসকল তাঁহার আনন্দই বর্দ্ধন করে বলিয়া যে ঋষিগণ বলিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক মনে করিবার কোন হেতু নাই। বরঞ্চ দানগ্রহীতার দানপ্রাপ্তিহেতুক প্রীতি যদি দাতার উপরও ফলোৎপাদন করে, তবে সেই প্রীতির তারতম্যহেতু যে দাতার ফলেরও তারতম্য হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, দান-গ্রহীতার প্রকৃতির উপর এই প্রীতির পরিমাণ ও প্রকার অবশ্য নির্ভর করে। একই প্রকার অভাববিশিষ্ট দুই বিভিন্ন ব্যক্তির দানপ্রাপ্তিহেতুক প্রীতি ঠিক একই

প্রকার হয় না। অতএব দানের পাত্রাপাত্র বিচারের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। পাত্রের কেবল দারিদ্র্যই দানের সফলতা বিষয়ে একমাত্র বিচার্য্য বিষয় নহে। দিব্যদর্শী ঋষিগণ অবধারণ করিয়াছেন যে, পাত্র বিচার করিতে হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই দানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাত্র ; ইহা পূর্ব্বোক্ত কারণে যুক্তিসঙ্গত বলিয়াও অনুমিত হয়।

কোন একটি মহাত্মা সাধুকে একটি ভদ্রলোক এই বিষয়ে সম্প্রতি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে সেই মহাপুরুষ বলিলেন ;—"দেখ জগতে প্রত্যেক দেশে রাজা আছে ; প্রজাবর্গের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা তাঁহার কার্য্য ; সুতরাং যে ব্যক্তি অপরের পীড়াদায়ক হয়, এবং রাজার বিধানের বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহাকে রাজা কারাগারে প্রেরণ করিয়া দণ্ডিত করেন ; তাহাকে কারাগারে অতি সামান্যপ্রকার আহার্য্য বস্তু দেন এবং তদ্দ্বারা কঠিন পরিশ্রম করান ; কাহাকেও বা রাজা কারাগারে অবরুদ্ধ রাখিয়া কষ্ট প্রদান করেন ; কাহারও বা প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করেন। ইহাতে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের কষ্ট দেখিয়া যদি কেহ তাহাদিগকে উত্তম উত্তম আহার্য্য বস্তু প্রদান করেন, তবে রাজা ঐ দাতার প্রতি প্রসন্ন হয়েন না ; বরং তাহাদিগকে উক্তপ্রকার কার্য্যহইতে বিরতই করেন ; কারণ তদ্দ্বারা দণ্ডের অভিপ্রায় নিষ্ফল হয়। পরন্তু সৈনিক-পুরুষগণ যখন রাজার শত্রু-বিনাশার্থ ও রাজ্য বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত যাত্রা করে, তখন যদি কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সাহায্য ও শুশ্রূষা করে, এবং তাহাদিগের সর্ব্ববিধ অভাব দূর করে, তবে তন্নিমিত্ত রাজা ঐ দাতা ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নই হইয়া থাকেন, এবং তাহাকে পুরস্কৃতও করিয়া থাকেন। ভগবান্ সাংসারিক জীবের সম্বন্ধে রাজাও বটেন, সাংসারিক রাজার ন্যায় তিনিও ক্রূরকর্ম্মা পুরুষদিগকে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের নিমিত্ত কাহাকেও অন্ধ, কাহাকেও বধির, কাহাকেও খঞ্জ, কাহাকেও নির্ধন

করিয়া দণ্ডিত করেন। এই দণ্ডিত ব্যক্তিগণ পুণ্যনিমিত্তক দানের শ্রেষ্ঠপাত্র নহেন, তাঁহাদিগের প্রতি দয়া-নিবন্ধন তাঁহাদের প্রাণধারণোপায় করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে, এবং তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা এইরূপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবশ্য মহৎপুণ্য সঞ্চয় করা হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ—যাঁহাদিগের দ্বারা ভগবানের নিজ মহিমা জগতে প্রচারিত হয়, যাঁহারা তাঁহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্ত্তা; সুতরাং যাঁহারা সকল জীবের যথার্থ শ্রেষ্ঠমঙ্গলদাতা, তাঁহারাই উক্তপ্রকার দানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাত্র; তাঁহাদিগের প্রতি দানে ভগবান্‌ও বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েন, এবং তিনি দাতাকে ইহকালে যশোযুক্ত ও প্রফুল্লচিত্ত করিয়া, অন্তিমে স্বর্গাদি-সুখ প্রদান করেন।"

অতএব যেরূপেই বিচার করা যায়, ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বথা দানের যোগ্যপাত্র বলিয়া ঋষিগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা স্বার্থপরতাহেতুক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

এই সৃষ্টি অতীব বিচিত্র; কোন একটি বস্তু অপর কোন একটি বস্তুর ঠিক অনুরূপ নহে; একটি বৃক্ষে লক্ষ পত্র এক সঙ্গে হইয়া থাকে, কিন্তু কোন দুইটি পত্রই ঠিক অনুরূপ নহে; একই পিতা মাতা হইতে একই কালে যমজ সন্তান জাত হয়; কিন্তু তাহাদিগেরও প্রকৃতি ও আকৃতি ঠিক একরূপ হয় না। সুতরাং জীবমাত্রেই গুণগত ভেদ আছে; তন্মধ্যে অনেকগুলি গুণের সাদৃশ্য বিচার করিয়া জাতিসকল অবধারিত হয়; যেমন, মনুষ্য, গো, বৃক্ষ ইত্যাদি; যেমন বৃক্ষের মধ্যে আম্র, কণ্টকী, পলাশ ইত্যাদি। মনুষ্যের মধ্যেও গুণসকলের সাদৃশ্য, অসাদৃশ্য বিবেচনা করিয়া, প্রাচীন ঋষিগণ তাহাদিগকে প্রধানতঃ চারিপ্রকার জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথাঃ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই জাতিভেদ মনুষ্যকৃত কাল্পনিক জাতিভেদ নহে, ইহা

সনাতন; মনুষ্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। অনুলোম ও বিলোম ক্রমে ইহাদের বিমিশ্রণে অপরাপর সঙ্কর জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

গুণ ও কর্ম্মের প্রভেদ অনুসারে আমি চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমঃ জগৎ এই ত্রিবিধ-গুণাত্মক। যাঁহাতে সত্ত্বগুণের আধিক্য আছে, এবং রজঃ ও তমঃ গুণদ্বয় যাহাতে সর্ব্বদা সত্ত্বগুণের অধীন হইয়া আছে; সুতরাং যিনি ঋজুস্বভাব ও অক্রূর, তপস্যাশীল, জীবে দয়াসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ ও বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ।* যিনি ইহ ও পরকালে সুখসম্পত্তি লাভে ইচ্ছুক হইয়া, নিয়ত কর্ম্মে উদ্যমশীল, সৎসাহসপূর্ণ, আশ্রিত-প্রতিপালক, পরাক্রমী, দানশীল, পর-দুঃখবিমোচনে উদ্যমসম্পন্ন এবং পারমার্থিক জ্ঞানালোচনা হইতেও বিমুখ নহেন, তিনিই ক্ষত্রিয় (ক্ষৎ=দুঃখ, তাহা হইতে অপরকে ত্রাণ করেন, ইহাই ক্ষত্রিয় শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ)। কিন্তু দৈব ও আসুর প্রভেদে এই ক্ষত্রিয়গণ দ্বিবিধ। এই সুরাসুর ভেদও সনাতন, ইহা অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান থাকিয়া, বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই দুই প্রকৃতির প্রভেদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। যিনি জ্ঞানানুশীলন বিষয়ে ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও অল্প উৎসাহী এবং কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পনৈপুণ্য ইত্যাদি দ্বারা অর্থসংগ্রহে স্বভাবতঃ যত্নশীল হইয়া সুখ-সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই বৈশ্য। এই বৈশ্যের মধ্যেও দৈব

* সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রকৃতিগত ভেদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ও অন্যান্য গ্রন্থে বিবৃত আছে। সাধারণতঃ সত্ত্বগুণকে জ্ঞান ও আনন্দাত্মক বলিয়া জানিবে, এবং রজোগুণকে রাগ অর্থাৎ কামনাত্মক এবং কর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া জানিবে, এবং তমোগুণকে মোহ ও অজ্ঞানালস্যাত্মক জানিবে।

ও আসুর এই দুই প্রকার ভেদ আছে। যাঁহারা দৈবভাবাপন্ন, তাঁহারা অর্থসঞ্চয়-বিষয়ে খলতা, কপটতা, নৃশংস ব্যবহার ইত্যাদি পরিহার করেন, দানশীল এবং সৎপুরুষ বলিয়া খ্যাত হয়েন। আসুরভাবাপন্ন বৈশ্যগণ তদ্বিপরীত প্রকৃতি লাভ করেন। যাহারা, তমোগুণের আধিক্যহেতু, জ্ঞানালোচনায় অসমর্থ, সুতরাং অপরের অধীন হইয়া অপরের আদেশানুযায়ী কর্ম্ম করাই যাহাদের স্বভাবজাত বৃত্তি, যাহারা, রাজসিক উৎসাহবিবর্জ্জিত হওয়ায়, ক্ষাত্র অথবা বৈশ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার অযোগ্য, সুতরাং কোন না কোন প্রকার ভৃত্যব্যবসাই যাহাদিগের উপজীবিকা, তাহারাই শূদ্রজাতি। ইহাদিগের মধ্যেও সুর ও অসুর, এই দুই প্রকার ভেদ আছে।

স্বভাবজাত গুণ ও কর্ম্মের উপরে যে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা মহাভারতে বনপর্ব্বে একশত অশীতিতম অধ্যায়ে, যুধিষ্ঠির ও অজগররূপী নহুষের সংবাদ পাঠে বিশেষরূপ অবগত হওয়া যায়। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সর্প উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।
ব্রবীহ্যতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈঃ সমনুমীমহে॥ *

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

* * * * *

---

* সর্প বলিলেন, হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ কে, এবং বেদ্যই বা কি? তোমার বাক্যদ্বারা তোমাকে অতি মতিমান্ ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হইতেছে; অতএব আমার এই প্রশ্নের উত্তর কর।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে নাগেন্দ্র! সত্য, দান, ক্ষমাশীলতা, আনৃশংস্য, তপস্যা ও দয়া যাঁহাতে দৃশ্যমান্ হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

সর্প উবাচ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচৈব হি।
শূদ্রেম্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ॥
আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণা চৈব যুধিষ্ঠির।

* * * * *

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শূদ্রেতু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

* * * * *

সর্প উবাচ।

যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ।
বৃথা জাতিস্তদায়ুষ্মন্ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে॥

সর্প বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! বেদই বর্ণের চাতুর্ব্বিধত্বের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং বর্ণের যে প্রভেদ, তৎসম্বন্ধে বেদই প্রমাণ, এবং বেদ নিত্য সত্য। (পরন্তু) সত্য, দান, অক্রোধ, আনৃশংস্য, অহিংসা ও দয়া শূদ্রেতেও থাকিতে পারে, (কিন্তু তাহা থাকিলেই কি জন্মানুসারে যে ব্যক্তি শূদ্র সে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবে?)।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে সর্প! যে শূদ্রে ঐসকল লক্ষণ থাকে এবং যে ব্রাহ্মণে তাহা থাকে না, সে শূদ্র শূদ্র নহে, এবং সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে। হে সর্প! যে ব্যক্তিতে এইসকল চরিত্র লক্ষ্য হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন, আর যে ব্যক্তিতে ইহা বিদ্যমান নাই, তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

সর্প কহিলেন, হে আয়ুষ্মন্! যদি এই সকল বৃত্তি দ্বারাই ব্রাহ্মণ নিশ্চিত হয়, তবে যেপর্য্যন্ত ঐ সকল বৃত্তির কার্য্য না হয়, সেই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ জাতি (বলিয়া অভিমান) বৃথা।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমহো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥
ইদমার্ষং প্রমাণঞ্চ যে যজামহ ইত্যপি।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদু র্যে তত্ত্বদর্শিনঃ॥
প্রাঙ্নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে॥
তাবচ্ছূদ্রসমো হ্যেষ যাবদ্বেদে ন জায়তে।
তস্মিন্নেবং মতিদ্বৈধে মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥
কৃতকৃত্যাঃ পুনর্ব্বর্ণা যদি বৃত্তং ন বিদ্যতে।
সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান্ প্রসমীক্ষিতঃ॥
যত্রেদানীং মহাসর্প সংস্কৃতং বৃত্তমিষ্যতে।
তং ব্রাহ্মণমহং পূর্ব্ব- মুক্তবান্ ভুজগোত্তম॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মহামতি মহাসর্প! মনুষ্যদিগের মধ্যে জাতি অবধারণ করা কঠিন; কারণ সকল বর্ণের মধ্যেই সঙ্কর আছে। (কারণ) সকলপ্রকার মনুষ্যই সকল প্রকার স্ত্রীতে অপত্যোৎপাদন করে, এবং জন্ম, মরণ, বাক্য, ও মৈথুন ইহা সকল মনুষ্যেরই সমান ভাবে আছে। তদ্বিষয়ে আর্ষপ্রমাণও "যে যজামহ" ইত্যাদি মন্ত্রে আছে (আমরা ব্রাহ্মণ হই অথবা অব্রাহ্মণই হই, যজন করিতেছি; অব্রাহ্মণ হইলেও কার্য্যসম্পাদন নিমিত্ত ভিন্নমন্ত্রাদিপ্রয়োগদ্বারা যজমানের ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির ব্যবস্থা আছে)। অতএব শীল অর্থাৎ চরিত্র ও আচারকেই যাঁহারা প্রধান ও ইষ্ট বলিয়া জানেন, তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী। পুরুষের নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে জাতকর্ম্ম বিহিত হয়, তখন তাহার মাতাই সাবিত্রী এবং পিতাই আচার্য্য, এ বিষয়ে সংশয় হওয়াতে স্বায়ম্ভুব মনু এইরূপ কহিয়াছেন যে, পুরুষ যেপর্য্যন্ত বেদে সংযুক্ত না হয়, সেপর্য্যন্ত শূদ্রসম থাকে। হে নাগেন্দ্র! বর্ণসকলের সংস্কারাদি ক্রিয়া কৃত হইলেও, যদি তাহাতে

এই যথার্থ উত্তর শ্রবণ করিয়া, বৃকোদর সর্পপাশহইতে মুক্ত হইলেন, এবং নহুষ রাজাও অভিসম্পাতহইতে মুক্তিলাভ করিয়া, অজগরকলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ব্রাহ্মণজাতি সত্যপরায়ণতা, তপস্যা প্রভৃতি গুণের দ্বারাই পৃথক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত এবং অপরাপরের পূজনীয়রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন।

প্রাচীন ঋষিগণ যে জাতিভেদ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা গুণগত তারতম্যের উপরই যে নির্ভর করে, শ্রুতিতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে ৪র্থ প্রপাঠকের ৪র্থ খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, সত্যকাম-নামক কোনও অল্পবয়স্ক বালক একদা গৌতমগোত্রীয় কোনও আচার্য্য ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক গুরুত্বে বরণ করিয়া, তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ঐ বালক কোন্ জাতিতে উৎপন্ন, আচার্য্য তাহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; তাহাতে বালক বলিল যে, সে তাহা অবগত নহে; কারণ তাহার মাতাকে সে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন,—"তিনি বহু অতিথি ও অভ্যাগতের সেবায় অনুরক্তা ছিলেন, যৌবনে তাহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহার গোত্র তিনি অবগত নহেন। তিনি এইমাত্র জানেন যে, তাঁহার নাম জাবালা এবং তাঁহার পুত্রের নাম সত্যকাম।" বালক সরল ও বিনম্রভাবে এই উত্তর অবিকল আচার্য্যের নিকট বর্ণনা করিলে, আচার্য্য বলিলেন যে, এই বালকের যেরূপ সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা, তাহা ব্রাহ্মণজাতিভিন্ন অপরের দুষ্প্রাপ্য; অতএব ঐ বালককে ব্রাহ্মণজাতীয় বলিয়াই তিনি অবধারণ করিলেন।

উল্লিখিত বৃত্তিসকল বিদ্যমান না থাকে, তবে সে স্থলে সঙ্করকে বলবান্ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। হে ভুজগপ্রধান মহাসর্প! অধুনা যে পুরুষেতে সুসংস্কৃত বৃত্তি দৃষ্ট হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি।

এতদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, গুণের দ্বারাই জাতি অবধারিত হয়; শারীরিক বর্ণের উপর নির্ভর করিয়া এইদেশীয় জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে এক্ষণকার ধারণা প্রকৃত নহে। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, এইরূপ উল্লেখ আছে। দ্বিজাতি মাত্রের উপাস্যা নারায়ণীরূপা গায়ত্রী কৃষ্ণবর্ণা; সদা প্রশান্তমূর্ত্তি স্বয়ং ধর্ম্মরাজকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ঋষিগণ উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভারতভূমিতে সকল জাতিতে সকলপ্রকার শারীরিক বর্ণ পুরাকালহইতে বর্ত্তমান থাকা শ্রুত হওয়া যায়। কৃষ্ণার্জ্জুন এবং দ্রৌপদী ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণকায় ছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র শ্যামবর্ণ ছিলেন। সুতরাং শারীরিক বর্ণের উপর নির্ভর করিয়া, আর্য্য ও অনার্য্য বিবেচনায়, জাতিভেদ হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা এক্ষণে উক্তি করিয়া থাকেন, ঋষিদিগের গ্রন্থে তাঁহাদের মতের পোষকতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

জাতিভেদ মূলতঃ গুণগত হইলেও, ঋষিগণ কর্ম্মদ্বারাও তাহার ভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। গুণ এবং কর্ম্ম এই উভয়ের সংযোগে জাতিভেদ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ সমাজের সহজ অবস্থায় লোকে স্বীয় আভ্যন্তরিক গুণানুসারেই বাহিরের কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া, তাহা অবলম্বন করিয়া থাকে। যাহার প্রকৃতি স্থির, বুদ্ধি প্রখর এবং মার্জ্জিত, সাংসারিক সুখসমৃদ্ধিলাভে যাহার চিত্ত স্বভাবতঃ অধিক উৎসুক নহে, জ্ঞান-চর্চ্চা ও ধর্ম্মোপার্জ্জনের প্রতি যাহার অন্তর্ব্বৃত্তি স্বভাবতঃ ধাবিত হয়, সেই ব্যক্তি, সামাজিক কোনও বাধা না থাকিলে, স্বভাবতঃই ধর্ম্মলাভ ও জ্ঞানার্জ্জনরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ যাহার বুদ্ধি লাভ ও ক্ষতির দিকে অধিক লক্ষ্য করে, এবং তদ্বিষয়ে যে ব্যক্তি বিশেষ বিচারক্ষম এবং যাহার চিত্ত স্বভাবতঃ ধনরত্নাদির প্রতি আকৃষ্ট, সেই ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রভৃতি

অবলম্বন করিবে, ইহাও স্বাভাবিক। এইরূপ বীর-প্রকৃতির লোক যুদ্ধ-বিগ্রহাদিরূপ কর্ম্মে আকৃষ্ট হইবে, ইহাও স্বাভাবিক। কিন্তু সংসারে নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন ও অবস্থার প্রভেদহেতু, মনুষ্যেরা অনেক সময়ে প্রকৃতির অনুগামী কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিতে ও অবলম্বন করিতে পারে না। সুতরাং ভিন্নজাতীয় কর্ম্ম অবলম্বন করাতে, তাহাদের স্বীয় আভ্যন্তরিক প্রকৃতি বিকাস প্রাপ্ত হইতে পারে না, এবং বিজাতীয় ব্যবসায় অবলম্বনহেতু আভ্যন্তরিক স্বাভাবিক প্রকৃতিও ক্রমশঃ বিকার-প্রাপ্ত হইয়া, ব্যবসায়ানুরূপ গঠিত হইতে থাকে। তবে অপেক্ষাকৃত হীন-জাতীয় কর্ম্ম অবলম্বন হেতু ঊর্দ্ধতনপ্রকৃতি যেরূপ সহজে বিকার প্রাপ্ত হইয়া অবলম্বিত ব্যবসায়ের অনুরূপ হয়, উচ্চজাতীয় ব্যবসায় অবলম্বনে অধস্তন প্রকৃতি তদ্রূপ উন্নতি প্রাপ্ত হয় না; বরং উচ্চতর ব্যবসায় অধস্তন প্রকৃতির অনুকূল না হওয়ায়, উহা তৎকর্ত্তৃক সুচারুরূপে সম্পন্নও হয় না। সুতরাং অধস্তন প্রকৃতির লোক উচ্চ-জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, তত্তদ্ব্যবসায়ী লোক সমাজকেও কলুষিত করে, এবং ঐ অনধিকারে প্রবৃত্ত ব্যবসায়ীকেও কপট করিয়া তুলে। সুতরাং আচার্য্য ঋষিগণ, গুণ এবং কর্ম্ম এই উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, জাতি নির্ণয় করিয়া, কোন্ জাতীয় লোক কোন্ প্রকার কর্ম্ম করিবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু অপকৃষ্টজাতীয় লোকের সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট জাতীয় কর্ম্মের প্রতিষেধও করিয়াছেন। এতৎ সমস্তই বিজ্ঞান-মূলক,—স্বার্থপরতা-মূলক নহে।

এক্ষণকার কালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণাদি সমাজ অতি দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, পরস্পরহইতে পৃথক্ ভাবে বর্ত্তমান আছে। পরন্তু সত্য-যুগে এরূপ ছিল না। তখন সর্ব্বজীবে সত্ত্বগুণেরই আধিক্য ছিল; সুতরাং প্রকৃতিগত-ভেদ অধিক ছিল না; পরন্তু সমাজরক্ষার নিমিত্ত কর্ম্মের প্রভেদ সর্ব্বকালেই অবশ্যম্ভাবী; অতএব ঐ যুগে কর্ম্মের দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে জাতি

নির্ব্বাচিত হইত ; তবে গুণগত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ সত্যযুগেও অবশ্য ছিল ; তাহাই ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইত। পরে ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে, রজোগুণের বৃদ্ধি হওয়াতে, জাতিসকল স্পষ্টরূপে গুণ ও কর্ম্ম এই উভয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, পরস্পর হইতে পৃথক্ ভাবে বংশানুগতরূপে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে থাকে। * তৎকালে গুণও প্রায়শঃ কর্ম্মেরই অনুরূপ হইতে আরম্ভ হয়। পরে দ্বাপরে সেইসকল শৃঙ্খলা অতিশয় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় ; ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আচার ও ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। উৎকৃষ্টজাতীয় লোকের অপকৃষ্ট কর্ম্ম ও নিকৃষ্ট স্বভাব থাকা প্রকাশিত হইলে, অপকৃষ্ট জাতিভুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে থাকিলেও, তাহা কার্য্যে অনেক পরিমাণে অনাদৃত হইতে থাকে। পক্ষান্তরে কালক্রমে লোকের মতি অধিক পরিমাণে রজস্তমোগুণবিশিষ্ট হওয়ায় অপকৃষ্ট জাতির লোকের পক্ষে তপস্যাপ্রভৃতিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া উৎকৃষ্ট জাতিভুক্ত হওয়াও এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। কলিকাল সমুপস্থিত হইলে, লোকসকলের পাপমতি স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে, জাতিভেদের মূল হেতু যে প্রকৃতিগত গুণ ও কর্ম্ম, লোকে ইহা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। এক্ষণে যিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার প্রকৃতিগত গুণ ও কর্ম্ম যদ্রূপই হউক, তাহা এক্ষণে আর বিচারের বিষয় হয় না ; তিনি জন্মপ্রাপ্ত জাতিতেই চিরকাল ভুক্ত থাকেন। প্রচলিত সামাজিক নিয়মের অতিশয় উচ্ছেদশীল কোন কর্ম্ম করিলে, তিনি সমাজচ্যুত হইয়া কখনও কখনও হীনত্ব প্রাপ্ত

---

* কালশক্তি প্রভাবে যে জীবের আভ্যন্তরিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। বসন্তকাল আগত হইলে, সাধারণতঃ যে সকল ভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা শীতকালে তদ্রূপ হয় না ; ইহা অনেকেরই বিদিত আছে ; বর্ষাকালে কুকুর কামাতুর হয়, অন্য ঋতুতে তদ্রূপ হয় না, ইত্যাদি ব্যাপার স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

হয়েন সত্য; কিন্তু এইরূপ বর্জ্জনবিধিও অনেক স্থলেই উচ্ছৃঙ্খল আঢ্যলোকের পক্ষে খাটে না। কিন্তু কেবল এক্ষণকার অবস্থা দেখিয়া, ঋষিদিগের অনুমোদিত জাতিভেদসম্বন্ধে মত স্থাপন করা সঙ্গত নহে। জাতিভেদপ্রথা, সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগ-পরিবর্ত্তনের সহিত যেরূপ পরিবর্ত্তিত ও এক্ষণে হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটি প্রমাণ মহাভারত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

মহাভারতে বনপর্ব্বে, একোনপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়ে, ভীমসেন ও কপীশ্বর-হনুমৎসংবাদে উক্ত আছে যে, ভীমসেন হনুমানের সমুদ্র-লঙ্ঘনকালীন রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কপীশ্বর বলিলেন যে, যুগ-ধর্ম্ম-প্রভাবে তাঁহার রূপ এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সেই তেজস্বিরূপ তিনি চেষ্টাপূর্ব্বক ধারণ করিলেও, ভীমসেন তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন না। তখন ভীমসেন, যুগভেদে যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, অঞ্জনানন্দনকে তাহা বিশেষরূপ বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎকালে উভয়ের সংবাদ, মূল মহাভারত হইতে, অবিকল নিম্নে বর্ণিত হইল:—

ভীমসেন উবাচ। *

যুগসংখ্যাং সমাচক্ষ্ব আচারঞ্চ যুগে যুগে।
ধর্ম্মকামার্থ ভাবাংশ্চ কর্ম্মবীর্য্যে ভবাভবৌ॥

হনুমানুবাচ।

কৃতং নাম যুগং তাত যত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
কৃতমেব ন কর্ত্তব্যং তস্মিন্ কালে যুগোত্তমে॥

---

* ভীম কহিলেন, হে বীর! যুগসংখ্যা ও যে যে যুগে যেরূপ আচার, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, স্বভাব, কর্ম্ম, শুভাশুভ ফলের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, তাহা বলুন।

হনুমান্ কহিলেন, হে বৎস! যে সময়ে সনাতনধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার নাম কৃতযুগ। সেই যুগোত্তম কালে অভীপ্সিত সকলকর্ম্মই কৃত হইত, অসম্পন্ন

ন তত্র ধর্ম্মাঃ সীদন্তি ক্ষীয়ন্তে ন চ বৈ প্রজাঃ।
ততঃ কৃতযুগং নাম কালেন গুণতাং গতম্॥

* * * * *

ন তস্মিন্ যুগ-সংসর্গে ব্যাধয়ো নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ।
নাসূয়া নাপি রুদিতং ন দর্পো নাপি বৈকৃতম্॥
ন বিগ্রহঃ কুতস্তন্ত্রী ন দ্বেষো ন চ পৈশূনম্।
ন ভয়ং নাপি সন্তাপো ন চের্ষ্যা ন চ মৎসরঃ॥
ততঃ পরমেকং ব্রহ্ম সা গতির্যোগিনাং পরা।
আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং শুক্লো নারায়ণস্তদা॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ কৃতলক্ষণাঃ।
কৃতে যুগে সমভবন্ স্বকর্ম্মনিরতাঃ প্রজাঃ॥
সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলম্।
তদাহি সমকর্ম্মাণো বর্ণা ধর্ম্মানবাপ্নুবন্॥
একদেব-সমাযুক্তা একমন্ত্রবিধিক্রিয়াঃ।
পৃথগ্ধর্ম্মাস্ত্বেকবেদা ধর্ম্মমেকমনুব্রতাঃ॥

থাকিত না। এইজন্য তাহার নাম কৃতযুগ। তখন ধর্ম্মের বিষণ্ণতা ও প্রজার ক্ষীণতা ছিলনা; পরে কালক্রমে ক্রমশঃ তাহার প্রাধান্য হীনতা প্রাপ্ত হইল।...সেই কৃতযুগে ব্যাধি, কি ইন্দ্রিয়বিঘাত, কি অসূয়া, কি কোন রোদনের বিষয় ছিল না। তৎকালে দর্প, কপটতা, বৈরভাব, আলস্য, দ্বেষ, পৈশূন্য, ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষ্যা বা মাৎসর্য্য ছিল না। যোগীদিগের পরমগতি, সেই পরব্রহ্মই উপাস্য ছিলেন। সর্ব্বভূতের আত্মা নারায়ণ শুক্লবর্ণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ইহারা কেবল স্ব স্ব কৃতকর্ম্ম দ্বারাই তত্তজ্জাতীয়রূপে পরিচিত হইতেন, এবং প্রজাগণ স্বস্ব প্রকৃতির অনুযায়ী কর্ম্মে নিরত থাকিতেন। সকল বর্ণই সমানাশ্রয় (অর্থাৎ সকলেই পরব্রহ্মপর) ছিলেন, সকলেরই সমান আচার ও সমান জ্ঞান ছিল, এবং কর্ম্ম দ্বারা সকলেই পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া ধর্ম্মলাভ করিতেন। প্রত্যগাত্মা এক চৈতন্যবস্তুতে সকলেই যোগবান্ হইতেন, এক প্রণবরূপ মন্ত্রই সকলের মন্ত্র ছিল, বেদান্তশ্রবণাদিবিধি সকলেরই এক ছিল, এবং ধ্যানাদি ক্রিয়া, সকলেরই একরূপ ছিল। পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা, এক-

চতুরাশ্রমযুক্তেন কর্ম্মণা কালযোগিনা।
অকামফল-সংযোগাৎ প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্ ॥
আত্মযোগ-সমাযুক্তো ধর্ম্মোঽয়ং কৃতলক্ষণঃ।
কৃতে যুগে চাতুষ্পাদ শ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্থ শাশ্বতঃ ॥
এতৎ কৃতযুগং নাম ত্রৈগুণ্য-পরিবর্জ্জিতম্।
ত্রেতামপি নিবোধ ত্বং যস্মিন্ সত্রং প্রবর্ত্ততে ॥
পাদেন হ্রসতে ধর্ম্মো রক্ততাং যাতি চাচ্যুতঃ।
সত্যপ্রবৃত্তাশ্চ নরাঃ ক্রিয়াধর্ম্ম-পরায়ণাঃ ॥
ততো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে ধর্ম্মাশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
ত্রেতায়াং ভাবসংকল্পাঃ ক্রিয়াদানফলোপগাঃ ॥
প্রচলন্তি ন বৈ ধর্ম্মা- স্তপোদান-পরায়ণাঃ।
স্বধর্ম্মস্থাঃ ক্রিয়াবন্তো নরাস্ত্রেতাযুগেঽভবন্ ॥
দ্বাপরে চ যুগে ধর্ম্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ত্ততে।
বিষ্ণুর্ব্বৈ পীততাং যাতি চতুর্দ্ধা বেদ এব চ ॥

তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদেই সকলের জ্ঞাননিষ্ঠা ছিল; সুতরাং ধর্ম্ম সেই এক তত্ত্বেরই অনুসরণ করিত, এবং ধর্ম্মফলের অভিসন্ধি না করাতে, কালোচিত আশ্রমচতুষ্টয়ে বিহিত কর্ম্মদ্বারা মনুষ্যগণ এই পরাগতি লাভ করিতেন। এই আত্মযোগযুক্ত ধর্ম্মই কৃতযুগের লক্ষণ, এই কৃতযুগে চতুর্ব্বর্ণেরই শাশ্বত ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল। ত্রৈগুণ্যপরিবর্জ্জিত এই যে যুগ, ইহাই কৃতযুগ নামে খ্যাত। এক্ষণে যে যুগ রজোগুণের বিমিশ্রণহেতু যজ্ঞক্রিয়া প্রবর্ত্তক, সেই ত্রেতাযুগের বিষয় শ্রবণ কর। তৎকালে ধর্ম্মের একপাদ হ্রাস হয়, এবং অচ্যুত বিষ্ণু লোহিতবর্ণ হয়েন। মনুষ্যসকল তৎকালে সত্যপ্রবৃত্ত থাকিয়া ক্রিয়াধর্ম্মপরায়ণ হয়; অতএব তৎকালে যজ্ঞসকল প্রবর্ত্তিত হয়, এবং বিবিধ ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, এবং অভীপ্সিত ফলের নিমিত্ত ক্রিয়াসকল সংকল্পিত হওয়ায় মনুষ্য যজ্ঞ ও দান দ্বারা কাম্য বিষয়সকল প্রাপ্ত হইত। লোক সকল তপস্যা ও দানপরায়ণ ছিলেন, এবং ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতেন না। মনুষ্যেরা স্বীয় বর্ণোচিত ধর্ম্মে যুক্ত থাকিয়া, তদুপযোগী ক্রিয়াসকল ত্রেতাযুগে করিতেন। দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের দ্বিপাদহীন হইল, এবং নারায়ণ পীতবর্ণ হইলেন, এবং বেদ চারিভাগে

ততোহন্যে চ চতুর্ব্বেদা স্ত্রিবেদাশ্চ তথাপরে।
দ্বিবেদাশ্চৈকবেদাশ্চা প্যনৃচশ্চ তথাপরে ॥
এবং শাস্ত্রেষু ভিন্নেষু বহুধা নীয়তে ক্রিয়া।
তপোদানপ্রবৃত্তা চ রাজসী ভবতি প্রজা ॥
একবেদস্য চাজ্ঞানা- দ্বেদাস্তে বহবঃ কৃতাঃ।
সত্ত্বস্য চেহ বিভ্রংশাৎ সত্যে কশ্চিদবস্থিতঃ ॥
সত্যাৎ প্রচ্যবমানানাং ব্যাধয়ো বহবোহভবন্।
কামাশ্চোপদ্রবাশ্চৈব তদাবৈ দৈবকারিতাঃ ॥
যৈরদ্যমানাঃ সুভৃশং তপস্তপ্যন্তি মানবাঃ।
কামকামাঃ স্বর্গকামা যজ্ঞাংস্তন্বন্তি চাপরে ॥
এবং দ্বাপরমাসাদ্য প্রজাঃ ক্ষীয়ন্ত্যধর্ম্মতঃ।
পাদেনৈকেন কৌন্তেয় ধর্ম্মঃ কলিযুগে স্থিতঃ ॥
তামসং যুগমাসাদ্য কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ।
বেদাচারাঃ প্রশাম্যন্তি ধর্ম্মযজ্ঞক্রিয়াস্তথা ॥

বিভক্ত হইল। তাহার পর কেহ চতুর্ব্বেদী, কেহ ত্রিবেদী, কেহ দ্বিবেদী, ও কেহ একবেদী হইলেন, কেহবা একেবারে বিপর্য্যস্ত হইলেন। এইরূপে শাস্ত্রসকল ভিন্ন ভিন্ন হইলে, বহুবিধ ক্রিয়া প্রকটিত হইতে লাগিল; প্রজাসকল কেবল রাজস ভাব অবলম্বনে তপস্যা ও দানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। একবেদ সম্যক্ ধারণ করিতে লোক অসমর্থ হওয়ায়, তাহা বহুরূপে বিভক্ত হইল; বুদ্ধির ক্ষয়হেতু কোন কোন ব্যক্তি মাত্র সত্যনিষ্ঠ হইল। সত্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়াতে, বহুপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইল, এবং নানাপ্রকার কামনা ও দৈবকৃত উপদ্রব ঘটিতে লাগিল। ঐ সকল ব্যাধি এবং কামনা দ্বারা পীড়িত হইয়াই, মনুষ্যসকল তন্নিবারণার্থ তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিল (অর্থাৎ সত্য ও ত্রেতার ন্যায় মোক্ষ এবং ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত তপস্যা আচরিত হইত না)। কেহ কেহ নিজ কাম্যবস্তুর সিদ্ধিকামনায়, কেহ কেহ বা স্বর্গকামনায়, বিবিধ যাগযজ্ঞ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ দ্বাপরযুগ প্রাপ্ত হইয়া প্রজাসকল অধর্ম্ম দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। হে কৌন্তেয়! কলিযুগে ধর্ম্ম একমাত্র পাদে অবস্থিত হয়। এই তামসযুগ প্রাপ্ত হইয়া নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হন; বেদাচার, ধর্ম্ম, যজ্ঞ ও ক্রিয়া

ঈতয়ো ব্যাধয়োস্তন্দ্রা দোষাঃ ক্রোধাদয়স্তথা।
উপদ্রবাঃ প্রবর্ত্তন্তে আধয়ঃ ক্ষুদ্ভয়ং তথা॥
যুগেষ্বাবর্ত্তমানেষু ধর্ম্মো ব্যাবর্ত্ততে পুনঃ।
ধর্ম্মে ব্যাবর্ত্তমানে তু লোকো ব্যাবর্ত্ততে পুনঃ॥
লোকে ক্ষীণে ক্ষয়ং যান্তি ভাবালোক-প্রবর্ত্তকাঃ।
যুগক্ষয়কৃতাধর্ম্মাঃ প্রার্থনানি বিকুর্ব্বতে॥
এতৎ কলিযুগং নাম অচিরাৎ যৎ প্রবর্ত্ততে।
যুগানুবর্ত্তনং ত্বেতৎ কুর্ব্বন্তি চিরজীবিনঃ॥

সকল বিলুপ্তপ্রায় হয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি সকল, ব্যাধি সকল, আলস্য এবং ক্রোধাদি নানাপ্রকার দোষ সকল এবং আধি সকল, এবং ক্ষুধা ও ভয় ইত্যাদি নানা প্রকার উপদ্রব, এইকালে প্রবৃত্ত হয়। যুগের গতিপ্রভাবে, ধর্ম্ম বিনাশ-প্রাপ্ত হয়; লোক সকল ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইলে, লোকপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মজ্ঞানাদিভাব সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ লোকপুষ্টিকর কর্ম্ম সকলও, তৎকর্ত্তার অনুপযুক্ততা হেতু ও বিধিলোপ বশতঃ, পুষ্টিকর না হইয়া তন্নাশক হইয়া থাকে; অতএব যুগপ্রভাবে ধর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হওযাতে, বিপরীত ফল সকল উৎপাদন করিতে থাকে)। এই কলিযুগ বর্ণিত হইল, যাহা অচিরে প্রবর্ত্তিত হইবে। চিরজীবী ব্যক্তিরাও যুগ সকলের এইরূপে অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। *

---

* কালের গতিপ্রভাবে যে, সকলপ্রকার জীবজন্তু, এমন কি বৃক্ষগুল্মাদি পর্য্যন্ত, হীনবীর্য্য ও ক্ষুদ্রকায় হইতেছে, তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তী, অশ্ব, কুকুর, গো ইত্যাদি সমস্তই যে ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষের বিষয়। ইউরোপখণ্ডেও পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে যোদ্ধৃগণ যেরূপ বর্ম্ম ও কবচ ধারণ করিতেন, এক্ষণকার কালে কেহ তাহা বহন করিতে সমর্থ নহে। শারীরিক শক্তির ন্যায় মানসিক শক্তিরও হ্রাস সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যপ্রদেশে ক্রমিক উন্নতির যে মত প্রচলিত আছে,তাহা হিন্দুশাস্ত্রের স্বীকার্য্য নহে এবং তাহা কেবল অসারকল্পনামূলক। বানর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যজাতিরূপে পরিণত হওয়া বিষয়ক মতও সম্পূর্ণ অলীক, ইহার কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে মনুষ্যদেহ যে জীবজগতে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে তাহাই "জিয়লজি" প্রভৃতি বিজ্ঞানবলেও প্রমাণিত হয়। যাহা হউক এই সকল বিষয়ে বিশেষ সমালোচনা করা এই গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক।

অতি প্রাচীনকালে যখন গুণ ও কর্ম্মানুসারে লোকের জাতি অবধারিত হইত, এবং যখন জাতি পরিচয় কেবল জন্মদ্বারাই হইত না, তখন জাতি বিষয়ক সামাজিক বন্ধন যে এক্ষণকার ন্যায় কঠিন ছিল না, তাহার প্রমাণস্থলে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা হইতেছে।

প্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য যঃ।
তস্যাগ্নীধ্রস্ততোনাভি ঋর্ষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ॥
তমাহুর্ব্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্ম্ম-বিবক্ষয়া।
অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্বেদপারগম্॥
তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারায়ণ-পরায়ণঃ।
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্ য- ন্নাম্না ভারতমদ্ভুতম্॥
স ভুক্তভোগাং ত্যক্ত্বেমাং নির্গতস্তপসা হরিম্।
উপাসীনস্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্মভিস্ত্রিভিঃ॥
তেষাং নব নবদ্বীপ- পতয়োঽস্য সমন্ততঃ।
কর্ম্ম-তন্ত্র-প্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ॥*

স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত নামে এক পুত্র ছিল। সেই প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নীধ্র, অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি, সেই নাভির পুত্র ঋষভ নামে পরিকীর্ত্তিত হন। এই ঋষভদেবকে মোক্ষধর্ম্মের প্রবর্ত্তনার্থ ভগবান্ বাসুদেবের অংশে অবতীর্ণ বলিয়া বৃদ্ধগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহার বেদপারগ একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ভরত; ইনি নারায়ণের একজন পরমভক্ত। (যে বর্ষ পূর্ব্বে অজনাভ বলিয়া অভিহিত হইত) এক্ষণ হইতে সেই বর্ষ, উক্ত ভরতের নামানুসারে, ভারতবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হইল। তিনি রাজ্যভোগানন্তর বৈরাগ্য অবলম্বনে গৃহ হইতে নির্গত হন, এবং তপস্যা দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিয়া, তিন জন্মের অন্তে, ভগবৎপদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপর একোনশত পুত্রের মধ্যে, নয়টি পুত্র, (কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ ও কীকট নামে) ভারতের যে নবভূখণ্ড,

* "নব সুতা নবদ্বীপপতয়ঃ নবানাং ব্রহ্মবর্ত্তাদি-ভূখণ্ডানাং পতয়ঃ। অস্য ভারতবর্ষস্য। একাশীতিঃ সুতাঃ কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকা ব্রাহ্মণা অভূবন্"। ইতি শ্রীধরস্বামী।

নবাভবন্মহাভাগা মুনয়োহর্থশংসিনঃ।
শ্রমণা বাতবসনা আত্মবিদ্যা-বিশারদাঃ॥
কবির্হরিরন্তরীক্ষ- প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ।
আবির্হোত্রোথ দ্রবিড়- শ্চমসঃ করভাজনঃ॥
ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্।
আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্মহীম্॥

এইরূপ আখ্যায়িকা অন্যান্য পুরাণেও উল্লিখিত আছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ক্ষত্রিয় নরপতি নাভির পুত্র, ক্ষত্রিয় রাজা ঋষভের যে একশত পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে ভরতাদি দশ জন ক্ষত্রিয়-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া, ভূখণ্ডসকল শাসন করিতে থাকেন; অপর একাশীতি পুত্র, কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ হইয়া, বৈদিক কর্ম্মসকল যাজন করিতে থাকেন, এবং অপর নয়জন আত্মারাম মুনি হইয়া মোক্ষধর্ম্ম যাজন করেন। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয় যে, জাতি-বিষয়ক সামাজিক বন্ধন, অতি প্রাচীনকালে সত্যযুগে, এক্ষণকার ন্যায় প্রবর্ত্তিত ছিল না, তখন লোকসকল সাধারণতঃ সত্ত্বগুণান্বিত থাকায়, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতির বিশেষ বিভিন্নতা ছিল না; সুতরাং জাতি প্রায়শঃ কর্ম্মানুগামীই হইয়াছিল। পরন্তু ঋতু সকলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বৃক্ষ লতা গুল্মাদির স্বাভাবিক শক্তি-বিকাশের তারতম্য

তাহার অধিপতি হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট পুত্রগণের মধ্যে একাশীতি পুত্র কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন এবং নয়টি পুত্র, আত্মবিদ্যার অভ্যাসে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, আত্মবিদ্যার পারদর্শী হইলেন, তাঁহারা পরমার্থ নিরূপণে এতই দক্ষ হইয়াছিলেন যে, সংসারের কোন পদার্থের প্রতিই তাঁহাদের আসক্তি ছিল না; তাঁহারা দিগম্বর বেশে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। তাঁহাদের নাম কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন। তাঁহারা স্থূলসূক্ষ্মাত্মক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আত্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন ভগবানেরই স্বরূপবোধে প্রত্যক্ষ করতঃ, জগতে বিচরণ করিতেন।

ঘটে, তদ্রূপ কালস্রোতের পরিবর্ত্তনে মনুষ্যেরও অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয়ের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়ায়, এই জাতিবিভাগেরও রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে। জগৎকে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক বলিয়া তত্ত্ববেত্তা ঋষিগণ অবধারণ করিয়াছেন। এই তিন গুণই অবিনাশী, এবং মহাবিরাটরূপী ভগবানের অঙ্গস্বরূপ। পরন্তু কোন কালে সত্ত্বগুণের অভ্যুদয় হয়, কোনকালে রজোগুণের অভ্যুদয় হয়, আবার কোনকালে তমোগুণের অভ্যুদয় হয়। এইরূপে কালচক্র নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যখন যে গুণের অভ্যুদয়কাল উপস্থিত হয়, তখন সেই গুণটি প্রবল হইয়া উঠে; এবং সমস্তজীবজন্তুর মধ্যে তাহারই ক্রিয়া প্রধানতমরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে; অপর দুইটি গুণ তৎকালে অক্রিয়াবস্থায় শায়িত থাকে, অথবা হীনতেজ হইয়া মৃদুভাবে অবস্থিতিপূর্ব্বক অভ্যুদয়প্রাপ্ত গুণের কার্য্যে সাহায্যকারী হয়। কিন্তু তিনটি গুণই শক্তিবিশেষ, এবং প্রত্যেক শক্তিই, স্বীয় অনুরূপ কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া, ক্রমশঃ হীনবীর্য্য ও অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়; একটি শক্তি এইরূপ অবসন্নতা প্রাপ্ত হইলে, তদিতর অপর একটি শক্তি অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয়। তখন পুনরায় সেই অভ্যুদয়প্রাপ্ত নবশক্তিটিই, সকল জীবজন্তুর উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া, তাহাদিগকে তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে; এবং যাহাদিগের মধ্যে স্বভাবতঃ অভ্যুদয়প্রাপ্ত গুণের অংশ অধিক, তাহাদিগকে অভ্যুদয়-সম্পন্ন করে। ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম; ইহা ঋষিগণ অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই নিয়ম এইরূপ অলঙ্ঘনীয় যে, স্থূল জড়জগৎও ইহা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে। এইরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে যে, পাশ্চাত্য প্রদেশের ভৌতিক যন্ত্রসকল, দীর্ঘকাল আপন অনুরূপ কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া, অবশেষে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহাদের অঙ্গ

প্রত্যঙ্গসকল অবিকৃত অবস্থায় থাকিলেও, ঐ সকল যন্ত্রদ্বারা আর কর্ম্মোৎপাদন করা যায় না; পরে দীর্ঘকাল ইহাদিগকে কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিলে, পুনরায় তাহারা কর্ম্মসম্পাদনক্ষম হইয়া উঠে। এইরূপে যেকালে সত্ত্বগুণের অভ্যুদয় হয়, তাহারই নাম সত্যযুগ; কালের গতিতে এই সত্ত্বগুণ ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ হীনতেজ হইলে, পূর্ব্ব-প্রসুপ্ত রজোগুণ কিঞ্চিৎ শক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। এই রূপে রজোগুণের কর্ম্মের সহিত বিমিশ্রিত সত্ত্বপ্রধান যুগকে ত্রেতা-যুগ বলে; এবং সত্ত্বগুণ যখন আরও অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং রজো-গুণই প্রাধান্য লাভ করে আর তমোগুণও জাগ্রৎ হইয়া উঠে, সেই কালকে দ্বাপর যুগ বলে। অবশেষে যখন সত্ত্বগুণ অতিশয় দুর্ব্বল দশা প্রাপ্ত হয়, এবং রজোগুণেরও তেজ হ্রাস হইয়া যায় আর তমোগুণই প্রাধান্য লাভ করে, সেই তমঃপ্রধান কালের নাম কলিকাল। সুতরাং কালস্রোতের পরিবর্ত্তনে যে এই বিজ্ঞানমূলক জাতিবিভাগেরও স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা স্বাভাবিকই বটে। সুতরাং বর্ত্তমান জাতি বিভাগ দৃষ্টে প্রাচীন ঋষিদিগের জ্ঞানবত্তার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও দোষা-রোপ করা যাইতে পারে না।

পরন্তু, যদিও এক্ষণকার সামাজিক জাতিবিভাগ বিজ্ঞানমূলক নহে, তথাপি কি ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় যে, এক্ষণকার কালেও ইহা দ্বারা এই দেশের কেবল অপকারই সাধিত হইয়াছে এবং কোন উপকার সাধিত হয় নাই? কোন না কোন প্রকার জাতিভেদ ত অপর সকল দেশেই বর্ত্তমান থাকা দেখা যায়। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যা-গত যাত্রিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তথাকার সমাজে আঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-দিগের সহিত এক টেবিলে বসিয়া দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন লোকেরা কখনই ভোজন করিতে পারেন না; এমন কি দরিদ্র পিতার পুত্র যদি স্বীয় বিদ্যা

বুদ্ধি ও পরিশ্রমবলে ধনাঢ্য হইয়া, সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীদিগের পদবী লাভ করেন, তবে তাঁহার দরিদ্র পিতা নিমন্ত্রিত হইয়া, তাঁহার ঐ উন্নত অবস্থায় সমশ্রেণীর লোকের সহিত একসঙ্গে, এক টেবিলে, বসিয়া ভোজন করিতে পারেন না। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে, সকল সমাজেই বর্ত্তমান সময়ে কোন না কোন প্রকার জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে; এবং দেশে প্রবর্ত্তিত থাকায়, তত্তৎ-সমাজস্থ সকল শ্রেণীর লোকই, তাহা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করিয়া, তৎপ্রতি বিরুদ্ধাচারী হয় না। অন্যত্র যদি তত্তদ্দেশস্থ জাতিভেদ-প্রথা সাধারণের কোন প্রিয় কার্য্যের নিমিত্ত একত্রীভূত হইতে বাধা সম্পাদন না করে, তবে কেবল এই দেশের জাতিভেদ প্রথা, এই দেশবাসীর মধ্যে ভেদ জন্মাইয়া, কোন বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কার্য্য-করণে বাধা জন্মাইয়াছে, এই কথা, বিশেষ প্রামাণাভাবে, কিরূপে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়? অপরাপর দেশের জাতিবিভাগ, অধিকাংশ স্থলে, ধনসম্পত্তির আধিক্য বা অল্পতার উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হার্বার্ট স্পেন্সার, ধার্ম্মিকপ্রবর কার্ডিনেল নিউমেন্‌ও উচ্চ শ্রেণীর লর্ড (ভূম্যধিকারী) দিগের সহিত সামাজিক ভাবে এক টেবিলে বসিয়া ভোজন করিবার যোগ্য নহেন। এইরূপ জাতিপ্রভেদ এতদ্দেশীয় মনুষ্য-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এইদেশে ধন অপেক্ষা, অদ্যাপি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আদর অধিক; যত বড়ই রাজা হউন না কেন, তিনি শংসিত-ব্রতী চীরবসনপরিধায়ী সাধু সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিয়া, স্বভাবতঃ নিম্নাসনে উপবেশন করিবেন, এবং অনেকস্থলে গৃহশূন্য ভিক্ষুকের এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রসাদান্ন ভোজন করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন। ভারতবাসী যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রতি অদ্যাপি স্বভাবতঃ অধিক পক্ষপাতী, ইহা কি তদ্বিষয়ে একটি উত্তম প্রমাণ নহে? এবং

বাস্তবিকই কি ধর্ম্ম ও জ্ঞান, ধনসম্পত্তি অপেক্ষা, মনুষ্যত্বের অধিক পরিচায়ক নহে? অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা নিশ্চিতই উপলব্ধি হইবে যে, এক্ষণকার কালের প্রবর্ত্তিত জাতিভেদও ভারতবাসীর এই উচ্চ ভাবেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কলিকাল সম্যক্‌রূপে প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে, ভারতবর্ষ প্রথমতঃ অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের পরস্পর সংঘর্ষের দ্বারা বহুলরূপে অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; এবং পরে বিদেশীয় বিজাতীয়দিগের আক্রমণ অপহরণ ও আধিপত্যপ্রভাবে, সহস্রাধিক বর্ষ হইতে প্রপীড়িত হওয়াতে বর্ত্তমান সময়ে একেবারে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় যে সকলপ্রকার সমাজ-বন্ধন শিথিল হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? ব্রাহ্মণগণ, পূর্ব্বে সমাজের সুরক্ষিতাবস্থায়, রাজন্যবর্গ ও অপর প্রজাসকলের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া, নিশ্চিন্তমনে, পুরুষানুক্রমে, ধর্ম্মের যজন ও যাজন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন; অন্য কোন ব্যবসায়ই তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং ধর্ম্ম ও জ্ঞান-বিষয়ে তাঁহারা অনায়াসে নিজে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, এবং তাঁহাদিগের সংসর্গে অপর সাধারণ লোকও, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও পবিত্রতা-বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইত। বিদেশীয় বিধর্ম্মী রাজ-শাসন এইদেশে প্রবর্ত্তিত হইলে, ব্রাহ্মণেরা রাজা হইতে স্বীয় জাতিগত কর্ম্মে সাহায্য ও উৎসাহ পাওয়া দূরে থাকুক, বরং তৎকর্ত্তৃক প্রপীড়িতই হইতেন। পরন্তু সামাজিক সমস্ত ক্রিয়াকলাপে ব্রাহ্মণদিগের সাহায্য অবশ্য-প্রাপ্তব্য হওয়ায়, রাজা দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়াও, ব্রাহ্মণগণ, হিন্দু প্রজাবর্গের আনুকূল্য লাভ করিয়া, অতি কষ্টে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়াও, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুমোদিত যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন প্রভৃতি কার্য্য এযাবৎ কিঞ্চিৎপরিমাণে জাগরিত রাখিয়া-

ছেন। কিন্তু উপজীবিকার অনিশ্চিততা হেতু এবং সমাজ অশান্তি ও অবশ্যম্ভাবী ভ্রষ্টাচারে পরিপূর্ণ হওয়ায়, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ-সুলভ তপস্যা ও ধ্যান ধারণা হইতে, স্বভাবতঃই ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের পবিত্রতা-সম্পাদক সংস্কারসকলেরও আর আদর নাই; এমন কি উপনয়ন-সংস্কার পর্য্যন্ত এক্ষণে অধিকাংশ স্থলে একপ্রকার অভিনয়মাত্রে পরিণত হইয়াছে। সংস্কারচ্যুত এবং তপস্যাবিহীন হওয়াতে, তাঁহাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে নিহিত ব্রাহ্মণ্যবীজও ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া আছে। সুতরাং তাঁহারা এক্ষণে আর কিরূপে অপরের মানার্হ থাকিতে পারেন? অতএব তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, পূর্ব্বপুরুষদিগের কর্ম্ম ও আচার পরিত্যাগ করিয়া, শূদ্রজাতীয় ব্যবসায় (বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক চাকুরী প্রভৃতি) অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনার নিমিত্ত পৃথক্‌রূপে একজাতি এই দেশে বিদ্যমান থাকাতেই, সহস্রসহস্র-বর্ষব্যাপী বিপ্লবেও, এই দেশের ধর্ম্ম ও জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রসকল অদ্যাপি একদা বিলুপ্ত এবং জ্ঞানালোচনা এই দেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হয় নাই এবং এতদ্দেশবাসী সাধারণ লোকসকলও অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিতবুদ্ধি এবং ধর্ম্মপরায়ণ রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এই হীনদশায়ও অপর কোন জাতি এযাবৎ প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিষয়ে ইহাদিগকে সম্যক্ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন নাই এবং স্বাভাবিক বুদ্ধিবিষয়ে ইঁহারা অদ্যাপি পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

কেবল ব্রাহ্মণ জাতির সম্বন্ধেই এই স্থলে অধিক বর্ণনা করা হইয়াছে। অপরাপর জাতি সকলের বিষয় চিন্তা করিলেও পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থাই প্রকাশ পায়। এই জাতিবিভাগ-প্রথা যেরূপে প্রাচীনকাল হইতে

বিদ্যমান আছে, তন্নিমিত্ত সকলপ্রকার ব্যবসায়-কর্ম্মই এই দেশে জাতিতে পরিণত হইয়াছে; কারণ, আচরিত কর্ম্ম পূর্ব্বকাল হইতেই জাতির অনুমাপক ও পবর্ত্তক। এইজন্য ক্ষত্রিয়গণ এবং ক্ষত্রিয়-ব্যবসায়ী ভূম্যধিকারিগণ, নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও পুরুষানুক্রমে যথাকথঞ্চিৎরূপে অস্ত্রবিদ্যা ধারণ ও রক্ষণ করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহাদের অন্য ব্যবসায়ে তদ্রূপ অধিকার ও গৌরব নাই। শিল্পজীবীরাও পুরুষানুক্রমে, আপন আপন শ্রেণীর স্বাভাবিক শিল্পকর্ম্মসকল রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া, এই সহস্রাধিক-বৎসরব্যাপী বিপ্লবের পরেও, শিল্প-নৈপুণ্যের কর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অপরদিকে, এদেশে জাতিবিভাগের নিয়মানুসারে যুদ্ধবিদ্যাতে রাজা ও ক্ষত্রিয় জাতিরই বিশেষ অধিকার থাকায়, যুদ্ধাদি কার্য্য উপস্থিত হইলে, এই ক্ষত্রিয়গণই তাহাতে বিশেষরূপে আলোড়িত হইতেন, এবং সমাজস্থ তদিতর অপর সকল শ্রেণীর লোক যুদ্ধবিগ্রহাদিদ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে তদ্রূপ আলোড়িত হইতেন না। সুতরাং, এক রাজার পর অপর রাজা, এক জাতির পর অপর জাতি, এই দেশ অধিকার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংগ্রামঘটা ও শোণিতপ্রবাহে ভারতবর্ষ সহস্রাধিক বর্ষ আপ্লাবিত হইয়াছে, তথাপি হিন্দুসমাজ তাহা এযাবৎ সহ্য করিয়া, অতি কষ্টের সহিতও আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এক্ষণে এদেশে ক্ষাত্রবীর্য্যই প্রায় সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অস্ত্রবিদ্যা সম্পূর্ণরূপেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; পরন্তু অপরাপর বিদ্যারও প্রভূতপরিমাণে হ্রাস হইয়াছে সত্য, এবং এইরূপ অবস্থায় তাহা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু এতদ্দেশীয় জাতিবিভাগ হেতুই, প্রধানতঃ, অপরাপর বিদ্যা এযাবৎ একেবারে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় নাই। ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিমিত্ত জাতিসকল পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হওয়ায়, তাহারা এতকাল

যাবৎ পরস্পর পরস্পরের পোষক হইয়া আসিয়াছেন; সুতরাং দুঃখ-দারিদ্র্যও তত অধিকপরিমাণে এদেশকে গ্রাস করিতে পারে নাই। পরন্তু বর্ত্তমান বাণিজ্য-নীতিপ্রসূত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রভাবে খাদ্যোপযোগী শস্যসকল প্রভূতপরিমাণে এই দেশহইতে দেশান্তরে নীত হওয়ায়, এইক্ষণে কিছুকাল যাবৎ ভারতবর্ষের শস্যভাণ্ডারসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অপরাপর নানাবিধ কারণে সম্প্রতি ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষের নিত্য আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে। নিত্য ব্যবহারোপযোগী অপরাপর দ্রব্য-সকল ও এক্ষণে অপরাপর দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হইয়া, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হওয়ায়, ভারতীয় তত্তদ্দ্রব্যব্যবসায়ী জাতিসকল একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন, এবং দেশস্থ কৃষিজীবিগণ হইতে তাঁহারা বিশেষ কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দুঃখ-দারিদ্র্যে নিমগ্ন হইয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনপ্রকারে কিঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদন লাভ করিবার নিমিত্ত সকল শ্রেণীর লোকই সমভাবে ব্যগ্র হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে জাতি-বিভাগও এক্ষণে কেবল নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে।

অতএব এক্ষণকার ভারতবর্ষীয় জাতি-বিভাগ অবৈজ্ঞানিক হইলেও এবং ইহাতে বর্ত্তমানকালে নানাপ্রকার দোষ থাকা দৃষ্ট হইলেও, ইহা যে ভারতবর্ষের পক্ষে এই পর্য্যন্ত কেবল অমঙ্গলই উৎপাদন করিয়াছে, এইরূপ বলা যাইতে পারে না এবং এই জাতিভেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, প্রাচীন ঋষিদিগের জ্ঞানবত্তার উপর সন্দিহান হওয়াও যুক্তিযুক্ত নহে। *

* বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার দোষসকল ক্ষালনপূর্ব্বক, কিরূপে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সমাজসংস্কার করা যায়, তাহা নিরূপণ করা এই গ্রন্থের বিষয় নহে। তবে প্রকৃতিগত গুণ ও কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সমাজসংস্কার করিবার নিমিত্ত যে

সকল চেষ্টা এক্ষণে হইতেছে, তাহা বিজ্ঞানমূলক বলিয়া স্বীকার করা যায় না; এবং বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত সমাজ গঠন করিতে না পারিলে, বর্ত্তমান সমাজকে যথেচ্ছাক্রমে ভগ্ন করিয়া দিলেই যে দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাও বিবেচনা-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সমাজে অনেকপ্রকার কুসংস্কার আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎসঙ্গে অনেকগুলি সুসংস্কারও বিদ্যমান আছে; তদ্দ্বারা সমাজের পবিত্রতা এবং স্বাতন্ত্র্য অনেকপরিমাণে রক্ষিত হইতেছে। বিদেশীয়ভাবের অনুকরণেচ্ছায় সমাজবন্ধন শিথিল করিলে, তাহার ফল শুভজনক হইবে বলিয়া প্রতীতি হয় না, কারণ তাহাতে ভারতবাসীর ধর্ম্মপ্রাণতা বিনষ্ট হইয়া, সামাজিক গৌরব কেবল ধনপ্রাধান্যের উপরেই স্থাপিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার স্থল দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে বিদেশীয় সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে সকল পূর্ব্বানুগত সংস্কার তাঁহাদের আছে, তাহা ভারতীয় সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প; সুতরাং এতদ্দেশীয় সমাজের বর্ত্তমান ভিত্তি ভগ্ন করিলে, তাহা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রহিত হইয়া, অপবিত্রতাপূর্ণ হইবারই সম্ভাবনা অধিক। এবঞ্চ পাশ্চাত্য প্রদেশে সমাজ সকল ন্যূনাধিক পরিমাণে যে সার্ব্বজনীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপরে স্থাপিত, তাহাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক আদর্শ, তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহার ফল আর্থিক বিষয়েও অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি এবং অপর সাধারণের অত্যধিক দরিদ্রতা। পাশ্চাত্যসমাজের বাহ্য চাকচক্য তত্তৎসমাজের অপেক্ষাকৃত অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই শ্রীবৃদ্ধির পরিচায়ক। এই বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া বাহিরের লোক ইহার আভ্যন্তরিক শোচনীয় অবস্থা সহজে বোধগম্য করিতে পারে না। অতএব পাশ্চাত্য প্রদেশবাসিগণকে বর্ত্তমানে অভ্যুদয়-সম্পন্ন দেখিয়া, বিশেষ বিচার না করিয়াই ভারতবাসীর পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে প্রয়াস করা উচিত নহে। বিশেষতঃ ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পাশ্চাত্য প্রদেশে সভ্যতা এবং অভ্যুদয় অতি অল্পকাল মাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা দুই তিন শতবর্ষের অধিক কাল যাবৎ স্থাপিত হয় নাই; ইতিমধ্যেই ইহার ক্ষয়ের চিহ্নসকল সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং যুগযুগান্তর হইতে অটল পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত ভারতীয় সমাজের পক্ষে এই অল্পকালস্থায়ী সভ্যতা সর্ব্বথা অনুকরণীয় নহে।

সর্ব্ববিষয়ে সকল মনুষ্যের সমত্বই পাশ্চাত্য প্রদেশের বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক পরিমাণে ইহা হইতে উৎপন্ন এবং ইহাতে প্রতিষ্ঠিত। সকল মনুষ্যের সমান অধিকার এই কথাটি শুনিবামাত্র অনেকেরই মনে উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। যে দেশে স্থাবর জঙ্গম সকলের প্রতিই অনাদিকাল হইতে সমবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হইয়াছে, সেই দেশে পূর্ব্বোক্ত মত যে অনেকে উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক। পরন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বৈদান্তিক সমত্ব জ্ঞানগত পারমার্থিক সমত্ব; ইহা

ব্যবহার বিষয়ে সর্ব্বজীবের অধিকারগত সমত্বের বোধক নহে। বেদান্তদর্শন-ব্যাখ্যাকালে বৈদান্তিক সমত্ব কি, তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। শক্তির বিভিন্নরূপ বিকাস হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; বিষবৃক্ষে যে শক্তি নিহিত আছে, জগৎকর্ত্তা অমৃতবৃক্ষে ঠিক তাহার বিপরীত শক্তি সংযোজিত করিয়াছেন। সুতরাং অন্তর্নিহিত শক্তির অনন্ত প্রভেদ হেতু তৎফলে ভিন্ন ভিন্ন জীবের অধিকারেরও প্রভেদ অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই জীবত্ববিষয়ে সাম্য আছে, সকল জীবই ঈশ্বরসৃষ্ট; কিন্তু তন্নিমিত্ত সকল জীবের অধিকারও সমান হইবে, ইহা কোন বুদ্ধিমান পুরুষ স্বীকার করিবেন না। সুতরাং মনুষ্যের মধ্যেও শক্তিগত অনন্ত প্রভেদ থাকাতে মনুষ্যত্ব এবং অপরাপর অনেক বিষয়ে সকলের সাম্য থাকলেও, অধিকার-বিষয়ে কখন সকলের সাম্য হইতে পারে না। শক্তির প্রভেদ হেতু কর্ম্মের প্রভেদ অবশ্যম্ভাবী। অধিকার কর্ম্মেরই ফল; সুতরাং তাহারও প্রভেদ অবশ্যম্ভাবী। অতএব সকল মনুষ্যের সমান অধিকার-বিষয়ক মতের মূলে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই; ইহা কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাবুকতা ও অসার কল্পনার উপর স্থাপিত। যে সকল দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারসকল অতি বহুলপরিমাণে এই সমান অধিকার-বিষয়ক মতের উপর স্থাপিত, সেই সকল দেশেও অধিকারের সমত্ব কেবল নামে মাত্র,—কার্য্যে নহে। কার্য্যতঃ অধিক শক্তিশালী অতি অল্প সংখ্যক পুরুষই উচ্চ অধিকারসকল লাভ করেন, অপরে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব এই অপ্রকৃত মতের উপর নির্ভর করিয়া কোন স্থায়ী সমাজ গঠন করা যাইতে পারে না।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক আদর্শ জাতিভেদ। বিশেষ বিশেষ কর্ম্মশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, মনুষ্যসকলকে বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিভক্ত করা এবং তাহাদের বিশেষ বিশেষ অধিকার নির্ব্বাচন করাই আর্য্য ঋষিদিগের প্রদর্শিত সমাজগঠনের উৎকৃষ্ট প্রণালী। অধিক উচ্চশক্তিশালীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, সমকক্ষের প্রতি সখ্য প্রেম ও মর্য্যাদা, অল্প শক্তিশালীর প্রতি দয়া ও স্নেহ, ইহাই ভারতের সামাজিক আদর্শ; ভারতীয় সামাজিক ব্যবহার তদুপরেই প্রতিষ্ঠিত। শক্তি বিষয়ে অপরের সমকক্ষ না হইয়াও মিথ্যাকল্পে তাহার সহিত সমকক্ষ-বুদ্ধি পোষণ করা এবং মিথ্যা অভিমান ধারণ করা ভারতীয় সামাজিক আদর্শ নহে।

যখন উচ্চ অধিকার সকল পরিচালনের ভার অযোগ্যপুরুষে ন্যস্ত হয়, এবং তাহার স্বার্থপরতা ও অত্যাচারে অপর লোক প্রপীড়িত হয়, তখন সমানাধিকারবিষয়ক মত প্রচারিত হইলে, সাধারণ লোক তদ্দ্বারা উৎসাহিত হইয়া অত্যাচারীকে দণ্ডিত করিতে উত্তেজিত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা অপর সময়েও কোন কোন বিষয়ে সাময়িক কল্যাণও সাধিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে, এই মতটি যথার্থপক্ষে এইরূপ উত্তেজনার সময়েও মনুষ্যসমাজের স্থায়িভাব-ব্যঞ্জক নহে; ইহা বস্তুতঃ তৎকালেও একটি নিষেধ-সূচক স্বাভাবিক বৃত্তির বিকার মাত্র। বিশেষ শক্তিমত্তা ও যোগ্যতা দ্বারা অপর হইতে শ্রেষ্ঠ না হইয়া, নীতি-

বিরুদ্ধ উপায় অবলম্বনে অপর সকল হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করা অথবা লাভ করিতে চেষ্টা করা ন্যায়সঙ্গত নহে; ইহাই সেই নিষেধসূচক বৃত্তি, যাহা স্বভাবতঃ সর্ব্বমনুষ্যের অন্তরে নিহিত আছে। অধিকন্তু মনুষ্যমাত্রেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে কতকগুলি সাধারণ শক্তি ও কতকগুলি অসাধারণ শক্তি আছে; সুতরাং তদনুযায়ী অধিকারও সকলেরই আছে; কোন বিশেষ ব্যক্তি যতই শক্তিশালী হউন, তাঁহার পক্ষে অপরের ঐ সকল অধিকার লোপ করিতে প্রযত্ন করা অসঙ্গত; ইহাও মনুষ্যমাত্রের একটি স্বভাবজাত ধারণা। এই ধারণাটিও প্রথমোক্ত বৃত্তির সহায় হইয়া, অত্যাচার-দমনে মনুষ্যকে প্রবৃত্ত করে। পরন্তু অত্যাচারী পুরুষকে দণ্ডিত ও দমন করামাত্রই উক্ত বৃত্তিদ্বয়ের কার্য্য। সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, উক্ত সমানাধিকারবিষয়ক মত সমাজের সাধারণ লোকের আর বিশেষ কোন উপকার সাধন করিতে সমর্থ হয় না। অন্য সময়েও স্বভাবতঃ সজ্জন পুরুষ এই মতাবলম্বী হইলে, তদ্দ্বারা কোন কোন স্থানে তাঁহার অপরের প্রতি মর্য্যাদা-বুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধারণতঃ ইহা অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতারই উদ্রেক করিয়া, সমাজের ভাবশুদ্ধি ও শান্তি বিনষ্ট করে। অতএব এই অপ্রকৃত মতকে আদর্শ-স্বরূপে অবলম্বন করিয়া, সমাজ গঠন করিতে প্রয়াস করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

বুদ্ধিমান পুরুষ নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, ইহা অবশ্য বোধগম্য করিতে পারিবেন যে, ব্যবসায়সকল জাতিতে বিভক্ত হইলে, সার্ব্বজনীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার হ্রাস হইয়া, সমাজের ভাবশুদ্ধি সাধিত হয়, এবং সমাজে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শান্তি ও স্থিরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং পুরুষানুক্রমে প্রাপ্তবিদ্যা সহজে জন্মাবধি বালকদিগের মনে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়াতে ইহার ক্রমিক উৎকর্ষসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। অধিকন্তু জাতিসকল বাধ্য হইয়া পরস্পরের পোষক হওয়াতে, কোন একটি শ্রেণী অপর কোন শ্রেণীকে একান্ত উপেক্ষার চক্ষে দৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, এবং সমাজে ধনবৈষম্য ও দরিদ্রতা তত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। আপন আপন গৌরব রক্ষার্থ প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন আপন শ্রেণীভুক্ত লোকের উন্নতিসাধন বিষয়ে বিশেষরূপে যত্নশীল হইতে সমর্থ হয়; এবং প্রত্যেক জাতীয় সমাজ অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ও অল্পসংখ্যক লোকের মিলনে গঠিত হওয়াতে, প্রত্যেকেই আপন আপন নৈতিক উন্নতিসাধন বিষয়েও যত্নশীল হইতে অধিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়। সমাজসকল পরস্পরের নিকট স্বীয় গৌরব রক্ষা করিতেও স্বভাবতঃ যত্নশীল হয়; সুতরাং তদ্দ্বারা প্রত্যেক সমাজের পবিত্রতা বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। এবম্প্রকার নানাবিধ কারণে জাতিভেদ-প্রথা একদা বর্জ্জন করিয়া, কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর পাশ্চাত্য প্রদেশীয় সমাজের ন্যায় সমাজ-স্থাপন করিতে চেষ্টা করা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

এক্ষণে সত্যযুগের ন্যায় অধিকাংশ লোক সত্ত্বগুণানুক্রান্ত নহে, এবং সাধারণতঃ লোকের প্রকৃতিতে তামসাংশের আধিক্য থাকিলেও এক্ষণকারকালে প্রকৃতিগত প্রভেদ যে অতি অধিকপরিমাণে আছে, তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

সুতরাং আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়েও প্রবৃত্তির প্রভেদ এক্ষণে অতিশয় অধিক। সর্ব্বদর্শী ঋষিদিগের উপদেশ অবলম্বনপূর্ব্বক দেশ ও কালানুযায়িরূপে প্রকৃতিগত গুণানুসারে আচার ব্যবহার ব্যবস্থাপিত করিয়া জাতিসকলের সংস্কার-সাধন, এবং ঋষিগণের প্রণোদিত উপযুক্তের গ্রহণ ও অনুপযুক্তের বর্জ্জনবিধি অবলম্বনের সুব্যবস্থা স্থাপন করিয়া, ভাবি-দোষাগমের পরিহার চেষ্টাই, ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া অনুমিত হয়। পরন্তু তদ্বিষয়ে উপযুক্তজ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন পুরুষ এক্ষণে প্রত্যক্ষীভূত হয় না। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমানকালে সামাজিক কোন কোন কুসংস্কার স্থল-বিশেষে এত অনিষ্টকর যে, তাহা অনেক লোকের পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়ে; সুতরাং স্বভাবতঃই সমাজবন্ধন একেবারে ছিন্ন করিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। বাস্তবিক এই দেশে এইক্ষণে সকলবিষয়েই অতি ঘোর সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আশার বিষয় এই যে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সমাজগঠন ও সংস্কার করিতে সমর্থ ঋষিগণ এক্ষণে পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষীভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন ও আরও বিশেষরূপে করিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য-প্রদেশে বাহ্যভৌতিক-বিজ্ঞান এক্ষণে যেরূপ উন্নতি-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র পৃথিবী-মণ্ডলবাসী জীবের ভারতীয় প্রাচীন সনাতন অধ্যাত্মবিদ্যা আংশিক-পরিমাণে লাভের নিমিত্তও সময় উপযোগী হইয়াছে। ইংরেজ-জাতি যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া, ঋষিগণ এক্ষণে ভারতকে পুনরায় অভ্যুদিত করিবেন এবং ভারতের প্রাচীনজ্ঞান পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিতে বিকীর্ণ করিবেন। তাহার লক্ষণসকলও বাহিরে অল্পে অল্পে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব ভারতবাসিগণ হতোৎসাহ হইবেন না। আপনাদের চরিত্র নির্ম্মল করিয়া, স্বীয় স্বীয় পরিবারবর্গকে শাস্ত্রোক্ত স্বজাতীয় উচ্চ আদর্শে দীক্ষিত করতঃ কিঞ্চিৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করুন; এবং সমাজস্থ লোকের চরিত্রবলের বৃদ্ধিসাধন করিয়া প্রত্যেক গ্রামকে যতদূর সম্ভব সুপ্রতিষ্ঠ করিতে প্রযত্ন করুন। আপনাদের চিরারাধ্য দেবতা শীঘ্রই আপনাদের নিকট তাঁহার পবিত্র জ্ঞানালোক প্রকাশিত করিয়া, আপনাদের দুঃখ বিমোচন করিবেন।

প্রথমাধ্যায়ে জাতিভেদবিচার-নামক চতুর্থপাদ সমাপ্ত।

উদ্বোধন-নামক প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত।

ওঁ তৎ সৎ॥

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ—

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ।

বিষয়-সূচনা।

আচার্য্য-ঋষিগণের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে আর একটি আপত্তি উপস্থিত করা হইয়া থাকে যে, তাঁহারা বাস্তবিক অভ্রান্ত হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যে মত-বিরোধ কিরূপে সম্ভব হয়? মতভেদ থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে, কোন না কোন মতটি ভ্রান্ত; এবং যদি একজনের মত ভ্রান্ত হয়, তবে অপরজনের মতও ভ্রান্ত হইতে পারে; এবং কে ভ্রান্ত, কে অভ্রান্ত, তাহা যদি আমাকেই নিরূপণ করিতে হইল, তবে আমার বুদ্ধি-বিচার অভ্রান্ত না হইলেও, এই ভ্রান্ত বুদ্ধি-বিচারকেই আমার পরিচালক বলিয়া গণ্য করিতে হয়। অতএব প্রমাণবিষয়ে আপ্তবাক্যের প্রাধান্য আর কিছুই থাকে না।

এতৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঋষি-গ্রন্থসকল যেরূপে প্রণীত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানকালে অজ্ঞাত থাকাতে, এইরূপ আপত্তি সকল উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা যেমন এক্ষণে মনে চিন্তা করিয়া যাহা কিছু মীমাংসা করি, তৎসমস্তই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকি, ঋষিদিগের প্রণালী তদ্রূপ ছিল না। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে লিখিত আছে:—

"বিদ্যয়া সার্দ্ধং ম্রিয়েত ন বিদ্যামূষরে বপেৎ।"

বিদ্যার সহিত ব্রাহ্মণ শ্মশানগামী হইবেন, তথাপি ঊষর-ভূমিতে বিদ্যা বপন করিবেন না (অনধিকারী পাত্রে বিদ্যাদান করিবেন না)।

পুনরায় ঐ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে ঃ—

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম তবাহমস্মি, ত্বং মাং পালয়,
অনর্হতে মানিনে নৈবমাদা, গোপায় মাং শ্রেয়সে তেহমস্মীতি"।

বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া (বলিলেন) আমি তোমার (আশ্রয় গ্রহণ করিলাম)। তুমি আমাকে পালন কর। অযোগ্য এবং দাম্ভিকপাত্রে আমাকে দান করিও না। আমাকে (সাবধানে) রক্ষা কর। আমা হইতে তোমার মঙ্গলসাধিত হইবে।

মনুসংহিতায়ও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

"নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ॥ ২।১১০
বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং নত্বেনামিরিণে বপেৎ॥ ২।১১৩
বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্।
অসূয়কায় মাং মাদা স্তথা স্যাং বীর্য্যবত্তমা॥ ২।১১৪
যমেব তু শুচিং বিদ্যা নিয়তং ব্রহ্মচারিণম্।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে॥ ২।১১৫

অজিজ্ঞাসিতভাবে কাহাকেও বিদ্যা উপদেশ করিবে না। কেহ (ভক্তি শ্রদ্ধাদি প্রশ্নধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনক্রমে) অন্যায়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকেও বিদ্যা উপদেশ করিবে না। জ্ঞাত থাকিলেও মেধাবী-পুরুষ লোক-মধ্যে (উক্তস্থানে মূকের ন্যায় আচরণ করিবেন। ব্রহ্মবাদী পুরুষ বরং বিদ্যার সহিত শ্মশানগামী হইবেন, তথাপি ঘোর আপৎকাল উপস্থিত হইলেও, ঊষর ভূমিতে বিদ্যা বপন করিবেন না। বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট

উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমি তোমার অমূল্যধন, আমাকে রক্ষা কর।' শ্রদ্ধাবিহীনব্যক্তিতে আমাকে অর্পণ করিও না, তাহা হইলেই আমার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যাঁহাকে নিয়ত শুচি ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে, এবং যিনি নিধি-রক্ষকের ন্যায় সর্ব্বদা প্রমাদবিহীন হইয়া আমাকে রক্ষা করিবেন, এরূপ ব্রাহ্মণের হস্তে আমাকে প্রদান করিবে।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, আচার্য্যগণ এক্ষণকার লোকের ন্যায় অজিজ্ঞাসিত হইয়া এবং অপাত্রে কখনও উপদেশ দিতেন না, এবং তাঁহাদের উপদেশ সকল জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সীমা অতিক্রম করিত না, এবং তন্মধ্যেও জিজ্ঞাসুর ধারণাশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে তাঁহারা বিস্মৃত হইতে না *। এবং তন্নিমিত্তই তাঁহাদের তত্ত্ব-নির্ব্বাচনবিষয়ক-গ্রন্থ সকলের প্রথমেই অধিকার এবং প্রশ্ন-বিষয় অবধারিত হইয়াছে। যথা, পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শনে "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রদ্বারা প্রশ্ন ও অধিকার সর্ব্বাগ্রে নির্ণীত হইয়াছে, এবং ঐ জিজ্ঞাস্যবিষয় পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থে কোন বিষয়ের অবতারণা করা হয় নাই, বুঝিতে হইবে। বেদান্তদর্শনেও এইরূপ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্র দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে উক্তরূপ প্রশ্ন ও অধিকার নির্ণীত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনে "অথ যোগানুশাসনম্" দ্বারা যোগমাত্রই যে শিষ্যের জিজ্ঞাস্য, এবং তাহাই যে গ্রন্থের বিষয়, তাহা প্রথমেই গ্রন্থকার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। এইরূপ সাংখ্য-দর্শনে "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" ; এই প্রথমসূত্রে গ্রন্থের জিজ্ঞাস্যবিষয় সর্ব্বাগ্রে অবধারিত হইয়াছে। বৈশেষিক ও ন্যায়-দর্শনেও এই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে।

* তবে শরণাগত শিষ্যদিগের সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না; কারণ শিষ্যগণ, প্রথমেই, সদ্গুরুর শরণ লইয়া, উপযুক্ত উপদেশের নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেন। সুতরাং ঋষিগণ, তাঁহাদিগের অধিকার বুঝিয়া, নিজ হইতে তাঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় উপদেশসকল প্রদান করিতেন।

ইহাও প্রসিদ্ধ আছে যে, আচার্য্যগণ, বিদ্যার্থীদিগের অধিকার বিবেচনায়, মুখে মুখেই প্রথমে তাহাদিগের প্রশ্নানুসারে উপদেশ প্রদান করিতেন। এই সকল সংক্ষিপ্ত উপদেশ, যাহা এক্ষণে আমরা সূত্রাকারে দেখিতেছি, তাহা শিষ্যপরম্পরায় বহুশতাব্দীপর্য্যন্ত এইরূপে মুখে মুখেই উপদিষ্ট হইয়া আসিয়াছিল; অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে, কলির প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, অরাজকতাপ্রভৃতি বিপ্লবে দেশের শ্রী নষ্ট এবং ঋষি-দিগের আশ্রমসকল জনশূন্য হইয়া যায়; তন্নিবন্ধন সর্ব্বত্র নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে, ঐ সকল উপদেশ লুপ্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কায়, গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পরন্তু এই সকল গ্রন্থ অধ্যাপকগণের নিকটই থাকিত, বিদ্যার্থিগণ তাহার প্রতিলিপি লইয়া পাঠ করিতেন; সম্প্রতি ইংরাজশাসনকালেই মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে তাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়াছে।

সুতরাং আচার্য্যদিগের এই সকল শিক্ষাপ্রণালীবিষয়ে অবধান করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইসকল তত্ত্বগ্রন্থে পূর্ব্বাচার্য্য-গণের নিজের পরিজ্ঞাত সম্যক্‌জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই এবং শিষ্যদিগের অধিকারের যখন পার্থক্য আছে, এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়ও যখন সকলস্থলে এক নহে, তখন উপদেশের বিভিন্নতাও অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং এই সকল দর্শনে উপদেশের তারতম্য দেখিয়াই, ঋষিদিগের মতবিরোধ কল্পনা করা উচিত নহে। বাস্তবিক অবহিতচিত্তে তাঁহাদিগের প্রদত্ত ভিন্ন ভিন্ন দর্শনোল্লিখিত উপদেশসকল আলোচনা করিয়া দেখিলে, তন্মধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন বিরোধ লক্ষিত হইবে না। অনেক স্থলে আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায়সকল, আপন আপন মতের পোষকতা করিবার নিমিত্ত অথবা ভ্রান্তিবশতঃ এই সকল দর্শনের কুব্যাখ্যাও করিয়াছেন; তন্নিমিত্ত অনেক আধুনিক পণ্ডিতই এই

সকল দর্শনোল্লিখিত উপদেশ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সাধনদ্বারা বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে, ঋষিগণের প্রদত্ত উপদেশ সম্যক্ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। এক্ষণে ঋষিগণ আত্মগোপন করাতে, সমাজে উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে, সাধক ও চক্ষুষ্মান্ লোকের সংখ্যা বিরল হইয়াছে; সুতরাং যাঁহারা কেবল গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত ও তার্কিক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের ভাষ্য অথবা টীকা নামক ব্যাখ্যাসকলও পূর্ব্বাচার্য্যদিগের গ্রন্থের ন্যায়, অভ্রান্ত বলিয়া বর্ত্তমানকালে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতসমাজে আদৃত হইয়া থাকে; সুতরাং এই সকল ব্যাখ্যার উপর যে কখনও দোষারোপ হইতে পারে, তাহা এক্ষণকার পণ্ডিতগণ কল্পনায়ও আনিতে পারেন না অথবা ইচ্ছা করেন না; যিনি যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি তাহার দোষগুণ বিচার না করিয়া, আজন্মকাল তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন। ইহা শিক্ষাপ্রণালীরই দোষ,—পণ্ডিত মহাশয়দিগের বুদ্ধিমত্তার দোষ নহে; কারণ তাঁহাদের মধ্যে অতি প্রখর-বুদ্ধি-সম্পন্ন অনেকপুরুষ বর্ত্তমান আছেন। অতএব কেবল সদ্‌গুরুপ্রসাদে শাস্ত্রসকলের গূঢ় মর্ম্ম আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তদনুসারে, ঋষিদিগের উপদেশে যে সকল বিরোধ কল্পিত হইয়াছে, তাহার অসারতা প্রদর্শন করিতে প্রয়াস করিব। কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যদিগের উপদেশে প্রকৃত বিরোধের অভাব-বিষয়ে আমাদের উক্তি যে স্বকপোলকল্পিত এবং কেবল তাঁহাদিগের প্রতি অন্ধবিশ্বাসমূলক নহে, তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ প্রথমে দেওয়া আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতে, একাদশ স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, উদ্ধব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তত্ত্বসকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিকর্ত্তৃক অবধারিত হইয়াছে; ইহার

হেতু কি? তাহাতে ভগবান্ তাঁহাকে আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিতমত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

উদ্ধব উবাচ। *

কতি তত্ত্বানি দেবেশ সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো।
নবৈকাদশ পঞ্চত্রী ণ্যাত্থ ত্বমিতি শুশ্রুম॥
কেচিৎ ষড়্বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।
সপ্তৈকে নব ষট্‌কেচি- চ্চত্বার্য্যেকাদশাপরে॥
কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ॥ ১
এতাবত্ত্বং হি সংখ্যানা মৃষয়ো যদ্বিবক্ষয়া।
গায়ন্তি পৃথগায়ুষ্ম- ন্নিদং নো বক্তুমর্হসি॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ।

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিংনু দুর্ঘটং॥ ৩
নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তত্তথা।
এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে দুরত্যয়াঃ॥ ৪

* —উদ্ধব বলিলেন, হে প্রভো, হে দেবেশ! ঋষিগণ কর্ত্তৃক তত্ত্বসকল নানা প্রকারে সংখ্যাত হইয়াছে; আমি শুনিয়াছি তোমা কর্ত্তৃক ঐ সকল তত্ত্ব নব, একাদশ, পঞ্চ ও তিন, এই অষ্টাবিংশতি সংখ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে (তন্মধ্যে কোন্ মতটি যুক্ত?) কেহ বলেন (তত্ত্ব সকল মোট) ষড়্বিংশতি সংখ্যক, কেহ বলেন সপ্ত সংখ্যক, কেহ নব, কেহ ষট্, কেহ চারি, অপরে একাদশ, কেহ সপ্তদশ, কেহ ষোড়শ এবং কেহ ত্রয়োদশ।১। হে আয়ুষ্মন্! ঋষিগণ যে অভিপ্রায়ে তত্ত্বসংখ্যা এইরূপ বিসদৃশরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণনা করুন॥২॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই সঙ্গত; তৎসকলের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে; বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। আমার মায়া অবলম্বন করিয়া যিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছুই অসঙ্গত নহে।৩। তুমি যেরূপ বলিতেছ, ইহা এইরূপ নহে; কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, ইহা তদ্রূপ,—

যাসাং ব্যতিকরাদাসীদ্ বিকল্পো বদতাং পদম্।
প্রাপ্তে শমদমেঽপ্যেতি বাদস্তমনুশাম্যতি ॥ ৫
পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ।
পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসংখ্যানং যথাবক্তুর্বিবক্ষিতম্ ॥ ৬
একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ ॥ ৭
পৌর্ব্বাপর্য্যমতোঽমীষাং প্রসংখ্যানমভীপ্সতাম্।
যথা বিবিক্তং যদ্বক্ত্রং গৃহ্নীমো যুক্তিসম্ভবাৎ ॥ ৮
অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবেদন্য স্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥ ৯

কেবল এই প্রকার বিবাদকারী লোকদিগের পক্ষে আমার দুরতিক্রম্য অবিদ্যাদি শক্তিই প্রয়োজক বলিয়া জানিবে। (অর্থাৎ বিবাদকারিগণ অবিদ্যাধীন সুতরাং ভ্রান্ত)।৪। সেই সকল শক্তির ব্যতিক্রম হেতু, বাদিগণের বিবাদকারণ ভেদ উপস্থিত হয়; তাহারা শম ও দমগুণ প্রাপ্ত হইলে, ঐ ভেদ তিরোহিত হয়, এবং বিবাদেরও উপশম হয়।৫। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ? তত্ত্ব সকল পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকায়, বক্তা ঋষিগণের বিবক্ষা অনুসারে, তত্ত্ব সকলের পৌর্ব্বাপর্য্য ও সংখ্যাবিষয়ে ইতরবিশেষ হইয়াছে (অর্থাৎ ঋষিদিগের বিবক্ষা, যাহা শ্রোতার জিজ্ঞাসা ও অধিকারের উপর নির্ভর করে, তদনুসারে কখনও পরবর্ত্তী তত্ত্ব (কার্য্য) তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্বে (কারণে) অনুপ্রবিষ্ট থাকায়, ঐ কার্য্যরূপ তত্ত্বকে পৃথক্‌রূপে না দেখাইয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী কারণতত্ত্বের মধ্যে তাঁহারা ভুক্ত করিয়াছেন, এবং কখনও বা কার্য্যে কারণের অনুপ্রবেশ হেতু তদ্বিপরীতও করিয়াছেন; তদ্ধেতু তত্ত্বের সংখ্যাগণনা ও পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশবিষয়ে ইতর বিশেষ হইয়াছে)।৬। (তাঁহাদিগের উপদেশ সকল মনোনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করিলেই) দেখা যায় যে, সর্ব্বত্রই পূর্ব্বস্থিত (কারণ) বা পরস্থিত (কার্য্য) তত্ত্বে তদিতর তত্ত্বের সন্নিবেশ হইয়াছে।৭। অতএব, তত্ত্ব সকলের পৌর্ব্বাপর্য্য ও সংখ্যা যেরূপ ইঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমস্তই আমরা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করি, কারণ সকলই যুক্তিযুক্ত হয়।৮। অনাদিঅবিদ্যাযুক্ত পুরুষের স্বতঃ আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না। অতএব অন্য (যিনি অবিদ্যাপাশ হইতে মুক্ত তিনি) তাঁহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানদাতা গুরু হয়েন (অতএব জ্ঞানদাতা আচার্য্যগণকে অবিদ্যা-বিরহিত, অভ্রান্ত বলিয়া জানিবে)।৯।

বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণ মহর্ষিকপিল-প্রণীত সাংখ্যসূত্র ও মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের উপদেশের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম বিরোধ থাকা কল্পনা করিয়া থাকেন। পরন্তু মহর্ষি বেদব্যাস স্বপ্রণীত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টাক্ষরে মহর্ষি কপিলদেবকে সিদ্ধদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভগবদুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দশমস্কন্ধে মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাঁহার প্রধানতম দিব্যবিভূতি সকল বর্ণনা করিতে গিয়া ২৬ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন যে, "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ", অর্থাৎ সিদ্ধদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে কপিলমুনি, তিনি তাঁহারই স্বরূপ। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য নিজকৃত গীতাভাষ্যে এই শ্লোকের এই পাদের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—"সিদ্ধানাং জন্মনৈব ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়ং প্রাপ্তানাং কপিলো মুনিঃ (অর্থাৎ জন্মাবধি যাঁহারা ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও অলৌকিক ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপিল মুনি আমারই প্রকাশমূর্ত্তি)। গীতার শ্রীধরস্বামিকৃত টীকায়ও এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা:—সিদ্ধানাং উৎপত্তিতঃ এবাধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি" অর্থাৎ জন্মাবধি পরমার্থতত্ত্ববেত্তৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে কপিলমুনি তিনি আমারই স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতায়, তৃতীয় স্কন্ধে, চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে, ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ শ্লোকে এবং ১৮শ হইতে ১৯শ শ্লোকে, এবং পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে মহর্ষিকপিলকে সাক্ষাৎ ভগবদবতার বলিয়া বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তদুপদিষ্টসাংখ্যজ্ঞান তৎপরবর্ত্তী অধ্যায় সকলে অতি বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রামাণিকত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং মহর্ষি কপিলোপদিষ্ট সাংখ্যশাস্ত্রের মুখ্য উপদেশসকল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্যরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থেও মহর্ষি কপিলদেব ও তৎপ্রদত্ত উপদেশ সকলের এইরূপ

মর্য্যাদা ও গৌরব দেখিতে পাওয়া যায় *। কেবল মহর্ষি বেদব্যাস নহেন, অপরাপর ঋষিগণ, যাঁহারা বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদী তাঁহারাও, মহর্ষি কপিলকে সাক্ষাৎ ভগবদবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, মহর্ষি বাল্মীকি তৎকৃত রামায়ণের আদিকাণ্ডের চত্বারিংশৎ সর্গে পঞ্চবিংশতি শ্লোকে বলিয়াছেন ঃ—

তে তু সর্ব্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলাঃ।
দদৃশুঃ কাপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্ ॥

(কাপিলং কপিলরূপধারিণমিত্যর্থঃ)

অলমতিবিস্তরেণ, শ্রুতি স্বয়ং কপিলদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ— "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেত" (শ্বেতাশ্বতর, চতুর্থ অধ্যায় ২য় শ্লোক)।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্মসূত্রপ্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাস কখনই ভগবান্ কপিলদেবকে অতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া মনে করেন নাই, এবং তাঁহার প্রদত্ত উপদেশসকল ভ্রান্ত বলিয়া বোধ করেন নাই। স্বপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রে ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্তর্নিহিত উপদেশের সহিত যদি মহর্ষি কপিলপ্রদত্ত উপদেশের প্রকৃত বিরোধ থাকিত, তবে বেদব্যাস কখনই কপিলদেবকে অবিদ্যাবিরহিত ভগবদবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন না, এবং তৎপ্রদত্ত উপদেশ সকল যথার্থ বলিয়া নিজ প্রণীত গ্রন্থে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্যাস ও কপিলের প্রদত্ত উপদেশের মধ্যে প্রকৃত-

---

* যথা—যোগসূত্র ভাষ্যে ভাষ্যকার একস্থলে লিখিয়াছেন, "আদিবিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাৎ ভগবান্ মহর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ" এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়সকলে কপিলোক্ত সাংখ্যজ্ঞান বেদব্যাস স্বয়ং মোক্ষপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রস্তাবে কোন বিরোধ নাই এবং যদি কেহ বিরোধ থাকা বোধ করেন, তবে বলিতে হইবে যে, তিনি তাঁহাদিগের উপদেশের যথার্থমর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

পরন্তু এইরূপ মীমাংসা আপাততঃ সমীচীন বলিয়া অনুমিত হইলেও, বাস্তবিক কপিলসূত্রের (সাংখ্য-দর্শনের) উপদেশের সহিত ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্ত-দর্শনের) উপদেশের সামঞ্জস্য দেখাইতে না পারিলে, সকলের মনের সন্দেহ সম্যক্ দূর হইবে না; কারণ, সচরাচর আধুনিক পণ্ডিত-সমাজের এই ধারণা যে, কপিলপ্রণীত সাংখ্যসূত্রে ঈশ্বরসম্বন্ধে নাস্তিকবাদ স্থাপন করিয়াছেন, এবং বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রে তদ্বিপরীত মত স্থাপিত করা হইয়াছে। সাংখ্য-দর্শনে পুরুষবহুত্ব স্বীকৃত আছে, বেদান্তদর্শনে তদ্বিপরীত মত স্থাপিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে জগতের সত্যতা স্বীকার করা হইয়াছে, বেদান্তদর্শনে অসত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইত্যাদি আরও নানাপ্রকার বিরোধ আছে। বৈশেষিক ও মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনসকলের মতও এইরূপ অনৈক্যপূর্ণ ও বিরোধী। এই সকল অত্যন্তবিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য কি প্রকারে সম্ভব? সুতরাং কেবল বাহ্য প্রমাণদ্বারা কপিল ও ব্যাসের ঐকমত্য থাকিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের বিরোধাভাবের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। কার্য্যতঃ দর্শনসকলের মতের সামঞ্জস্য থাকা প্রদর্শন করিতে হইবে। আরও দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য বৈষ্ণব ইত্যাদি নানা প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধমতাবলম্বী সাধকশ্রেণী বর্ত্তমান আছে। এই সকল বিরুদ্ধমত ঋষিদিগের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত ও অনুমোদিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের মতের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে?

কিন্তু সাংখ্যসূত্র ও ব্রহ্মসূত্রের একটু বিস্তৃতসমালোচনা না করিলে, তল্লিখিত উপদেশসকলের প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা অবধারণ করা যায় না,

এবং তাহা না করিলে বিরোধ-ভঞ্জন এবং সামঞ্জস্য-স্থাপনও অসম্ভব। সুতরাং তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপেই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। পরন্তু এইসকল দর্শনের উপদেশবিষয়ে যে অধিকারভেদ আছে, তাহাই প্রথমে এক্ষণে প্রদর্শিত হইবে।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিষয়-সূচনা-নামক
প্রথম পাদঃ সমাপ্তঃ।
ওঁ তৎ সৎ ॥

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ হরিঃ ওঁ॥

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ।

অধিকারিভেদ ও ভারতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সকলের ভেদ-রহস্য-বর্ণনা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জিজ্ঞাসার ও জিজ্ঞাসুব্যক্তির অধিকার ভেদে বক্তা ঋষিগণের উপদেশের পার্থক্য হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য বিষয়ের প্রভেদ হইলে যে, উপদেশের তারতম্য হইবে, ইহা সহজেই সকলের বোধগম্য হয়। জিজ্ঞাসুগণের অধিকারবিষয়ে বৈষম্য থাকিলে যে, উপদেশের তারতম্য হইবে, তাহাও কিঞ্চিৎ অবধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। একই প্রশ্ন বালক ও প্রবীণ ব্যক্তির অন্তরে উদিত হইতে পারে এবং উভয়েই তদ্বিষয়ে আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; কিন্তু প্রশ্ন এক হইলেও সুবিজ্ঞ আচার্য্য কখনই উভয়কে একই প্রকারে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন না; কারণ বালকের ধারণাশক্তি ও প্রবীণ ব্যক্তির ধারণাশক্তি সমান নহে; সুতরাং যাঁহার যতটুকু ধারণা হইবে, আচার্য্য তাঁহাকে ততটুকুই উপদেশ করিয়া থাকেন। আচার্য্যগণ অধিকারীকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; পরন্তু শিষ্যদিগের প্রকৃতি বিবেচনায়, প্রথমতঃ, তাঁহারা কে কোন্ প্রকার শাস্ত্রে অধিকারী, তাহা নিরূপণ করিয়া, তৎপরে উত্তমাদিভেদে তন্মধ্যে উপদেশের তারতম্য করিয়াছেন। এই অধিকারভেদ বুঝিবার নিমিত্ত তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

আচার্য্যগণ সাধারণ মনুষ্যশ্রেণীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,

যথা :—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, এবং মুক্ত-পুরুষ। দেহেতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত, সুতরাং ইন্দ্রিয়ব্যাপারে যে সুখ উপজাত হয়, তৎপ্রতি বাসনাযুক্ত, যে ব্যক্তি, তিনি বদ্ধ বলিয়া পরিগণিত। এই দেহাত্মবুদ্ধি ও তাহাহইতে সম্ভূত বাসনাশক্তিকেই সাধারণতঃ অবিদ্যা বলিয়া ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। 'এই অবিদ্যাদ্বারা আবদ্ধ' এই অর্থে, সাধারণতঃ বদ্ধ শব্দ ব্যবহৃত হয়। জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি জীবের অবশ্যম্ভাবী গতি পর্য্যালোচনা করিয়া, যিনি সংসারকে দুঃখময় বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, এবং ইন্দ্রিয়ব্যাপারজনিত সুখ ও সাংসারিক সমৃদ্ধি অকিঞ্চিৎকর ও অস্থায়ী বলিয়া যিনি তৎপ্রতি অনাস্থাবান্ ও অনাদরযুক্ত হইয়াছেন, এবং দুঃখের আক্রমণ হইতে কিরূপে আপনাকে চিরদিনের নিমিত্ত মুক্ত করিবেন, স্বভাবতঃ যাঁহার অন্তরে এইরূপ বিচার স্থায়িবৃত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, এবং যিনি, সদ্‌গুরুর উপদেশদ্বারা আত্মাকে দেহহইতে পৃথক্ বলিয়া অবগত হইয়া, দেহাত্মবুদ্ধি বর্জ্জন করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, তিনি "মুমুক্ষু"। একমাত্র ঈশ্বরই এই সমগ্র জগতের নিয়ন্তা, বিধাতা ও প্রভু; জীব স্বভাবতঃ তাঁহার অধীন ও দাস এবং স্বাতন্ত্র্যশূন্য; এইরূপ প্রতীতি যাঁহার উপজাত হইয়াছে, সুতরাং আপনার সুখদুঃখের প্রতি লক্ষ্যশূন্য হইয়া, যিনি অভিমানাত্মক অবিদ্যাকে বর্জ্জন করিতে স্বভাবতঃ প্রয়াসী হইয়াছেন এবং ভগবৎ-স্বরূপ-চিন্তনে যাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়াছে, তিনিও "মুমুক্ষু" বলিয়া গণ্য হয়েন; পরন্তু তিনি "ভক্ত" নামেই বিশেষরূপে পরিচিত। এবং যাঁহারা চিরকালের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বপ্রকার দেহাত্মবুদ্ধি-বিবর্জ্জিত হইয়াছেন, পরমাত্মস্বরূপ যাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং যাঁহারা সর্ব্বদা পরমপুরুষ পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, যাঁহাদিগের জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্তব্য বিষয়ের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই, তাঁহারাই "মুক্ত-পুরুষ" নামে অভিহিত হয়েন।

বদ্ধজীব। বদ্ধজীবকে ঋষিগণ সাধারণভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা,—প্রাকৃতমনুষ্য ও কর্ম্মী অথবা কর্ম্মমার্গী। যে মনুষ্য শ্রুতির অনুবর্ত্তী নহেন, নিজ বুদ্ধিকে অধিনায়ক করিয়া, যিনি অপর প্রাকৃতজীবের ন্যায় জীবনযাপন করেন, তিনি "প্রাকৃত মনুষ্য" বলিয়া পরিগণিত হয়েন। আর যাঁহারা ইহ ও পরকালে অথবা উভয়কালে নিজের অথবা অপরের নিমিত্ত কোন না কোনপ্রকার সুখ ইচ্ছা করেন, অথচ তাহা লাভের নিমিত্ত নিজের শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীয় আচরিত কর্ম্মের নিয়ামক করেন না; পরন্তু সর্ব্বতোভাবে আপনাকে বেদ ও বেদমূলক-স্মৃতির ব্যবস্থা সকলের অধীন করিয়া, বুদ্ধিপূর্ব্বক সমুদায় আচরণীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন এবং বেদোক্ত কর্ম্মসকল আচরণ করিয়া, ইহকালে বাঞ্ছিত সুখ-সমৃদ্ধি, বিশেষতঃ পরকালে স্বর্গাদি সুখময় লোক সকল, লাভ করিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহারা কর্ম্মী অথবা কর্ম্মমার্গী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। "কর্ম্ম"শব্দ শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্র-বিহিত-কর্ম্ম অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ধর্ম্ম-শব্দও সচরাচর এই অর্থেই অনেকস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে; যাঁহারা এইরূপে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা "কর্ম্মী" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বেদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; জ্ঞান-কাণ্ড ও কর্ম্ম-কাণ্ড। জ্ঞান-কাণ্ডকে উপনিষৎ শব্দ দ্বারা বিশেষরূপে আখ্যাত করা হইয়াছে; সকাম-উপাসনা-অংশ কর্ম্ম-কাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হয়। এই কর্ম্মকাণ্ডে ইহ ও পরকালে কাম্যবস্তুলাভ ও স্বর্গাদিফলোপযোগী যজ্ঞ, দান, ব্রত, তপস্যা ইত্যাদি ক্রিয়াসকলের বিশেষরূপে বিস্তার করা হইয়াছে। এই সকল ক্রিয়া বেদোক্তবিধি-অনুসারে কৃত হইলে, তদুল্লিখিত ফলসকল উৎপাদন করিতে সম্যক্ সমর্থ। সংসারে অধি-কাংশ লোক এইসকল ফলই লাভ করিবার নিমিত্ত লালায়িত;

সুতরাং বেদের কর্ম্মকাণ্ডেই সাধারণতঃ ভারতবর্ষীয় চতুর্ব্বর্ণের লোকের অধিকার। অতএব বেদ বলিতে সাধারণতঃ বেদের কর্ম্মকাণ্ডকেই বুঝা যায়। বেদোক্ত ক্রিয়া-প্রণালী স্মৃতি-শাস্ত্রে বিশেষরূপে কোন কোন অংশে বিস্তার করা হইয়াছে। যাঁহারা বেদ ও স্মৃতির অনুসরণ করিয়া, জীবনের সমস্ত কর্ম্ম সকামভাবে নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাই কর্ম্মী অথবা কর্ম্মমার্গী শব্দের বাচ্য।

কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ডে মনোনিবেশ করাইয়া, তৎফলের প্রতি আসক্তি দৃঢ়ীভূত করা বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। বেদোল্লিখিত সদাচার ও ব্রত তপস্যা যাগ যজ্ঞ প্রভৃতিদ্বারা চিত্তের ক্রমশঃ মোহাত্মক তমঃ ও বাসনাত্মক রজোবৃত্তিসকলের ক্ষীণতা জন্মিতে থাকে এবং জ্ঞানাত্মক সত্ত্ববৃত্তিসকলের উদয় ও বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে চিত্তবৃত্তি-সকল শুদ্ধিলাভ করিতে থাকিলে, বিষয়-ভোগেচ্ছা ক্ষীণ হইয়া যায়; সুতরাং মনুষ্য সহজে মোক্ষলাভের নিমিত্ত উৎসুক হইতে থাকে। অপরন্তু স্বেচ্ছাচারিতা-বিবর্জ্জিত হইয়া, গুরূপদেশ ও শাস্ত্রের বিধি অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেই, মনুষ্যের অহংবৃত্তি, যাহা প্রধানতঃ তাহার মুক্তির বিঘাতক, তাহার বহুলপরিমাণে হ্রাস হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়সংযম-বিষয়েও ক্ষমতা বহুল-পরিমাণে সম্বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং মনুষ্যের মুক্তিলাভের উপযুক্ততা ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে থাকে। অধিকন্তু বেদোক্ত বিহিত কর্ম্ম সকলের সুখপ্রদ ফল অবশ্যম্ভাবী এবং কার্য্যতঃও ইহজীবনেই তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয় সত্য; কিন্তু এইসকল ফল যে অনিত্য, এবং মোক্ষানন্দ যে তদপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহাও বেদেই উল্লিখিত আছে; সুতরাং চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলে, বেদোক্ত ঐসকল বাক্যদ্বারা স্বভাবতঃই মনুষ্যের মনঃ মোক্ষের নিমিত্ত ব্যাকুল হয় এবং বৈদিক মন্ত্র ও ক্রিয়াদ্বারা যেসকল দেবদেবীর আরাধনা

সম্পাদিত হয়, সেই সকল দেব দেবীও পরমেশ্বরের অঙ্গীভূত অংশমাত্র বলিয়া বেদবাক্যে প্রকাশ থাকা দেখিয়া, সেই সর্ব্বেশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত শুদ্ধচিত্ত মনুষ্যের বৃত্তি স্বভাবতঃ ধাবিত হয়। এইরূপে মনুষ্যকে অবশেষে মুমুক্ষু করাই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের চরম উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের একাদশ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকে এই বিষয় স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। *

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং, ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়ো বিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥ ২৩
উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু॥ ২৪
ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ॥ ২৫

বেদে যে সকল ফলশ্রুতি উল্লেখ আছে, তাহাই জীবের পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রদর্শন করা বেদের উদ্দেশ্য নহে। ইহা মোক্ষধর্ম্মে রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত মাত্র। পরম শ্রেয়ঃ যে মোক্ষ, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই এই সকল উক্ত হইয়াছে। যেমন চিকিৎসকেরা রোগীর প্রীতি জন্মাইবার নিমিত্ত ঔষধের সহিত সুরস বস্তু মিশ্রিত করে, কিন্তু সুরস বস্তু খাওয়াইয়া প্রীতি জন্মানই তাহার উদ্দেশ্য নহে, তদ্রূপ স্বর্গাদি ফল দেওয়াই বেদের উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু মোক্ষাভিমুখ করাই উদ্দেশ্য। জীবসকল স্বীয় উৎপত্তির সহিত স্বভাবতঃ আয়ু এবং পুত্রকলত্রাদি স্বজন, যাহা তাহার স্বীয় অনর্থের হেতু, তৎপ্রতি আসক্তি-সম্পন্ন হয়। (২৪) স্বীয় যথার্থ স্বার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, দুঃখমার্গে ভাসমান, অন্ধতমে নিপতিত এই সকল

* অপরাপর গ্রন্থেও সুস্পষ্টরূপে ইহাই উক্ত আছে।

পুরুষ বেদমার্গাধীন হইলে, সর্ব্বজ্ঞ বেদ পুনরায় তাহাদিগকে কি নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কাম্যবিষয় সকলে নিয়োজিত করিবেন? (২৫)

এইক্ষণে মুমুক্ষুদিগের বিশেষ শ্রেণী-বিভাগ উক্ত হইতেছে :—

বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে যেমন "কর্ম্মী" বলা যায়, মুমুক্ষু ব্যক্তিকে তদ্রূপ "যোগী" বলা যায়। কর্ম্মী ও যোগী এই দুয়ের আভ্যন্তরিক প্রভেদ বিশেষরূপে বোধগম্য করা প্রথমে প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ সুখ অথবা দুঃখরূপ ফল উপজাত হয়; এই সুখদুঃখরূপ ফলকে জীবের সম্বন্ধে "ভোগ" শব্দ দ্বারা দার্শনিকপণ্ডিতেরা আখ্যাত করিয়াছেন। সুখরূপ ভোগের প্রতি সাধারণতঃ চিত্তের অনুকূল প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং দুঃখরূপ ভোগের পরিহারার্থ সাধারণতঃ চিত্তের প্রতিকূল প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিরূপে বাঞ্ছিত সুখ লাভ করা যায় এবং দুঃখ পরিহার করা যায়, তদ্বিষয়ের প্রণালী বেদের কর্ম্মকাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই বৈদিক প্রণালী (মার্গ) যাঁহারা অবলম্বন করিয়া, অভিমত উৎকৃষ্ট ভোগলাভ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে "প্রবৃত্তি-মার্গী" বলা হয়। তাঁহাদের চিত্তের প্রবৃত্তি সকল বহিঃস্থ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়; সুতরাং প্রবৃত্তি-মার্গের লোকসকল বহির্ম্মুখী লোক। পরন্তু যাঁহারা স্বীয় ইন্দ্রিয়সকলের ভোগ্য বিষয়ে স্বভাবতঃ আংশিক অথবা সম্যক্‌রূপে বিগততৃষ্ণ হইয়াছেন, এবং যাঁহাদের চিত্তের বৃত্তিসকল বহিঃস্থ ভোগোপযোগী বিষয়ের প্রতি ধাবিত না হইয়া, আত্মবিচার বা পরব্রহ্মোপাসনার দিকে স্বভাবতঃ ধাবিত হইয়াছে, অতএব যাঁহারা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ঋষিদিগের প্রদর্শিত উপদেশসকল প্রতিপালন করিয়া, চিত্তের বহির্ম্মুখীন বৃত্তিসকলকে সম্যক্‌রূপে নিরোধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, এবং আত্মতত্ত্ব অথবা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার

মুমুক্ষু।

লাভ করিতে যত্নপরায়ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে "নিবৃত্তি-মার্গী" বলা যায়। অতএব "কর্ম্মিগণ" প্রবৃত্তিমার্গের লোক, এবং মুমুক্ষুগণ নিবৃত্তিমার্গের লোক। এই নিবৃত্তিমার্গের লোকই "যোগী" বলিয়া উক্ত হয়েন। যোগী ও কর্ম্মী—ইহাদিগের প্রভেদ স্বাভাবিক প্রকৃতিগত প্রভেদ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আত্মতত্ত্ব অথবা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে, অনেকেরই মনে ক্ষণিক ইচ্ছার উদয় হইতে পারে; কিন্তু কার্য্যস্থলে এই ক্ষণিক ইচ্ছা বহির্ম্মুখীন প্রবৃত্তিসকলের আক্রমণে তিরোহিত হইয়া যায়; সুতরাং এই ক্ষণিক ইচ্ছা দ্বারা অধিকার নির্ণীত হয় না। যাঁহার এই ইচ্ছা এত বলবতী হয়, যে তিনি স্বীয় ভোগেচ্ছা দূর করিয়া, নিবৃত্তিবিষয়ক উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে সতত যত্নবান্ হয়েন এবং তাহা লাভ করিতে না পারা পর্য্যন্ত যাঁহার চিত্তে সর্ব্বদা অশান্তি থাকে, তিনিই নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া যোগী হইতে অধিকারী; নতুবা কেবল ক্ষণিক ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তি এইরূপ অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়েন না। এই স্থায়ী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছেন যে, "জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।"

মুমুক্ষু ব্যক্তিকে যোগী বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। এই যোগ ত্রিবিধ (১) কর্ম্মযোগ, (২) জ্ঞানযোগ, ও (৩) ভক্তিযোগ; তদনুসারে যোগিগণও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; এক শ্রেণীর যোগীর কর্ম্মযোগে অধিকার, অপর শ্রেণীর জ্ঞানযোগে অধিকার এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তি-যোগে অধিকার। এক্ষণে এই ত্রিবিধ যোগের বিশেষ বর্ণনা করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রথমে ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, কর্ম্মযোগ সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া আয়ত্তাধীন হইলে, সাধক ব্যক্তি নিজ প্রকৃতি-ভেদে জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগের অধিকারী হয়েন।

১ম কর্ম্মযোগ—ফলাভিসন্ধি-রহিত হইয়া, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান

করা, কর্ম্মযোগের প্রথম অবস্থা। কিরূপে ফলাভিসন্ধিশূন্য হইয়া, কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে ;—ইহা বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। প্রাণিহিংসা করিবে না, অবৈধ প্রাণিহিংসা ক'রলে, নিরয়গামী হইতে হয় ; এই একটি নিষেধ আজ্ঞা শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কেহ নরকরূপ কষ্টে পতিত না হইবার উদ্দেশ্যে প্রাণিহিংসাকার্য্যহইতে বিরত হয়। উপস্থিত অতিথিকে আদরের সহিত সৎকার করিবে এবং ভোজন প্রদান করিবে ; যিনি এইরূপ করিবেন, তিনি স্বর্গলাভ করিয়া সুখী হইবেন ; এইরূপ বিধিবাক্য শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি স্বর্গসুখলাভকামনায় এই অতিথি-পরিচর্য্যাব্রত অবলম্বন করেন। এই স্থলে উক্ত বিধি ও নিষেধের ফলশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, কর্ম্ম আচরিত হওয়াতে, কর্ত্তা ফলাভিসন্ধিযুক্ত কর্ম্মী বলিয়া গণ্য হয়েন ; তিনি যোগী নহেন। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ অবশ্য পালনীয়, এই বুদ্ধিতে তাহা পালন করিতে পারেন। বেদ ভগবদ্বাক্য এবং তদনুরূপ স্মৃত্যুক্ত অনুষ্ঠানসকলও অবশ্য-কর্ত্তব্য, কেবল এই বুদ্ধিতে বিশেষ বিশেষ ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি যোগী। সকলপ্রকার বিধি-নিষেধ যিনি কেবল এইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রতিপালন করেন, তিনি কর্ম্মযোগে আরূঢ় হইয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে এই প্রাথমিক কর্ম্মযোগ শ্রীভগবান্ নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

এই স্থলে কর্ম্মের ফলকামনা ত্যাগ করিয়া এবং তাহাতে (বিহিত কর্ম্মেতে) আসক্তিরহিত হইয়া, কেবল শাস্ত্রবিহিত বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান

করিবার উপদেশ আছে। কর্ম্মের ফল-কামনা পরিত্যাগ করিলেও কর্ম্ম করিতে করিতে তৎপ্রতি আসক্তি জাত হয় এবং তন্নিমিত্ত কর্ম্ম-বিষয়ক সংস্কার উপজাত হয়। বুদ্ধির মোহবশতঃ এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু কেবল ভগবদাজ্ঞা পালন করাই কর্ত্তব্য, এইরূপ বিচার যাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, তাঁহার, সত্ত্ববৃত্তির আধিক্যহেতু, কর্ম্ম-বিষয়ক সংস্কার জন্মে না। এই উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ফলাভিসন্ধিশূন্য হইয়া, এবং কর্ম্মেতে আসক্তিরহিত হইয়া, কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ভগবদ্‌বিধানোক্ত কর্ম্মসকল আচরণ করিবে। কেবল বেদোক্ত ভগবদাজ্ঞা পালন করাই এই কর্ম্মের উদ্দেশ্য, —কর্ম্মটি নিজে কিছুই নহে ; সুতরাং এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা কর্ম্ম ত্যাগ করা বলিয়াই গণ্য হয়। অতএব এইরূপ কর্ম্মের কর্ত্তা কর্ম্মী নহেন,— তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মত্যাগী যোগী।

এইরূপ কর্ম্মযোগ আয়ত্তাধীন হইলে, কর্ম্মযোগের দ্বিতীয় ভূমি লব্ধ হয়। ব্রহ্মে সমুদয় কর্ম্ম অর্পণ করা, এই দ্বিতীয় ভূমির স্বরূপ। কর্ম্মের প্রতি অনাসক্ত ও ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া বিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের এক অপূর্ব্ব শুদ্ধি উপজাত হয় এবং বিশুদ্ধ-জ্ঞানাত্মক সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়। তৎকালে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিবার যথার্থ ক্ষমতা জন্মে। এইরূপ নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি, সদ্‌গুরুর উপদেশ লাভ করিয়া, বুঝিতে পারেন যে, এই জগতে কোন কার্য্যে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই ; এক ভগবৎ-শক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়া, সমস্ত জীবজন্তু অবশভাবে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে ; তিনি তখন ধারণা করিতে সমর্থ হয়েন যে, একটি বৃক্ষের পত্রও আকস্মিক ভাবে আন্দোলিত হয় না,—একটি চিন্তাও অকারণ কাহারও মনে উদয় হইতে পারে না ; কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে সমস্ত পদার্থ পরম-কারণ পরমেশ্বরের

সহিত সম্বদ্ধ এবং সমস্ত জগৎই ভগবল্লীলায় পরিপূর্ণ; সুতরাং শুভাশুভ কোন প্রকার কর্ম্ম করিতেই বাস্তবিক তাঁহার কোনপ্রকার স্বাতন্ত্র্য নাই; তিনি স্বয়ং যে সকল বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে বাস্তবিক তিনি কেবল যন্ত্রস্বরূপ; সুতরাং এই অবস্থায় সাধক যে কোন বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তত্তাবৎই বস্তুতঃ ভগবৎ-প্রণোদিত। এইরূপ ধারণাযুক্ত হইয়া, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাকেই 'ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ করা' বলা যায়। ইহাই কর্ম্মযোগের পরাকাষ্ঠা ও দ্বিতীয় ভূমি। এই ব্রহ্মার্পণরূপ কর্ম্মযোগের বিষয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিম্নলিখিতরূপে উক্ত হইয়াছে:—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ (৩য় অধ্যায় ৩০ শ্লোক)।
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (৯ম অধ্যায় ২৭ শ্লোক)।

পুনরায়

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ (১৮শ অধ্যায় ৫৭ শোক)

* * * *

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (১৮শ অধ্যায় ৬১ শ্লোক)।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্"॥ ৬২ শ্লোক*

---

* আমি সর্ব্বপ্রকারে অন্তর্য্যামী ভগবানের অধীন, তাঁহা হইতে আমার কোন প্রকার স্বাতন্ত্র্য নাই, এইরূপ চিন্তা দ্বারা আমাতে (ভগবানেতে) তুমি সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ কর এবং ফলাকাঙ্ক্ষা সম্যক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক "অহং কর্ত্তা" ইত্যাকার বুদ্ধি-বিরহিত হইয়া শোক পরিত্যাগ করতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। ৩য় অধ্যায় ৩০ শ্লোক।

হে কৌন্তেয়! তুমি যে কোন কর্ম্ম কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু

যোগসূত্রের সাধনপাদের প্রথম সূত্রে এই কর্ম্মযোগের বিষয় নিম্নোক্ত-রূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

সূত্র। "তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ"।

ব্যাখ্যা—তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলে। এই সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে "ঈশ্বরপ্রণিধান" শব্দের অর্থ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা—"ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং পরমগুরাবর্পণং, তৎ-ফলসংন্যাসো বা"।" অর্থাৎ "ঈশ্বর-প্রণিধান" বলিতে পরমগুরু পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করা, অথবা ফলকামনা সম্যক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করা বুঝায়।

প্রথম ভূমিতে কেবল কর্ম্মের ফলত্যাগ করা হয়। দ্বিতীয় ভূমিতে কর্ম্মেতে আত্মকর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহাতে ঈশ্বর-কর্ত্তৃত্বের ধারণা সংঘটিত হয়। ফলাভিসন্ধিযুক্ত হইয়াও বেদশাস্ত্রোক্ত বিহিত কর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান করিলে, ঐ সকল কর্ম্মের এইরূপ শক্তি আছে যে, তদ্দ্বারা চিত্ত স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইয়া, অবশেষে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। তদবস্থায়ই কর্ম্মযোগ আরম্ভ হয়। ইহাই আর্য্য-দিগের উপদেশ-কৌশল জানিতে হইবে। পরন্তু ফলাভিসন্ধিযুক্ত কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী ব্যক্তি যে অতিশ্রেষ্ঠ, তাহা ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ সুস্পষ্ট-

---

হোম কর, অথবা দান কর, এবং যে কোন তপস্যা কর, তৎসমস্ত তুমি আমাতে অর্পণ কর। ৯ম অঃ ২৭।

তুমি বিবেক বুদ্ধিদ্বারা আমাতে তোমার সর্ব্ববিধ কর্ম্ম অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও; এবং বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া তোমার চিত্ত আমাতে প্রতিষ্ঠিত কর। ১৮শ অঃ ৫৭।

হে অর্জ্জুন! যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায়, সমস্ত জীবকে ঈশ্বর স্বীয় মায়াশক্তিবলে পরিচালন করিয়া তাহাদের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও; তবেই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া নিত্য পরমশান্তিপদ প্রাপ্ত হইবে। ১৮শ অঃ। ৬১ ও ৬২ শ্লোক।

রূপে উপদেশ করিয়াছেন; এবং কর্ম্মী ও যোগীর পূর্ব্বোক্ত ভেদও বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥৪২॥ ২য় অধ্যায়
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্- মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ।

---

* স্বর্গ ও পশু প্রভৃতি ফলসাধক যজ্ঞাদিকর্ম্ম ভিন্ন অপর কিছুই মনুষ্যের কর্ত্তব্য নাই; এই প্রকার বেদবাক্যে যে সকল অল্পবুদ্ধিপুরুষ বিমুগ্ধ হইয়া, এইরূপ আপাতমনোরম বাক্যসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেই সকল কামনাময় পুরুষের চিত্ত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি অতিশয় আসক্ত; সুতরাং তাহারা স্বর্গাদি সুখকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করে; সুতরাং পুনরায় দুঃখময় জন্ম ও কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হইলেও বহুক্রিয়াসমন্বিত (সুতরাং আয়াসসাধ্য) বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডকেই অভীপ্সিত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাহারা প্রশস্ত বলিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ ভোগ ও ঐশ্বর্য্য-কামনায় তাহাদের বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়াতে, তাহারা পরমার্থতত্ত্বে সমাধান করিবার উপযোগী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। (৪২—৪৪ শ্লোক)। হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রিগুণাভিভূত সকাম পুরুষসকলের কর্ম্মফল প্রতি-পাদক; তুমি কামনারহিত হইয়া ত্রিগুণাতীত হও, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হও; নিত্য

পুনরায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ৪৪শ শ্লোকে—

"জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।"

যোগের তত্ত্ব অবগত হইতে যিনি লোলুপ হইয়াছেন, তিনিও শব্দব্রহ্ম (বেদকে) অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন।

৪৬শ শ্লোকে—

"কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥" ইত্যাদি।

অর্থাৎ কর্ম্মী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ; অতএব, হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

এই যে দুইপ্রকার কর্ম্মযোগের কথা উল্লিখিত হইল, তাহা পরে বিশেষরূপে বিবৃত ভক্তিযোগের অঙ্গীভূত। পরন্তু বিবেক এবং বৈরাগ্যের উপরই জ্ঞানযোগ প্রতিষ্ঠিত; ইহার আনুষঙ্গিকসাধন পরে বিশেষরূপে যোগসূত্রব্যাখ্যানে বিবৃত হইবে। ঐ সকল কর্ম্মকেই (সাধনকেই) জ্ঞানযোগের অনুগামী কর্ম্মযোগ বলিয়া বলা যায়। পরন্তু এই স্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে, জ্ঞানমার্গাবলম্বী পুরুষ জীবাত্মাকে দেহাদি-ব্যতিরিক্ত বলিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন; সুতরাং চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত

৮। স্থিরবুদ্ধিযুক্ত এবং বিষয়লাভ ও রক্ষণবিষয়ে আসক্তিরহিত হইয়া, আত্মাতে প্রতিষ্ঠা লাভ কর। (৪৫ শ্লোক)। চতুর্দ্দিক জলপ্লাবনে ভাসিয়া গেলে, জলের নিমিত্ত ক্ষুদ্র জলাশয়াদির অন্বেষণে যতটুকু প্রয়োজন থাকে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষে সমগ্র বেদে (বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে) ততটুকুর অধিক প্রয়োজন নাই (অর্থাৎ তাহাতে তাঁহার কোন প্রয়োজনই নাই)। (৪৬ শ্লোক)। পরন্তু বৈদিককর্ম্ম আচরণ করিতে তোমাকে নিষেধ করিতেছি না; তুমি বিহিত কর্ম্ম আচরণ কর। কিন্তু তৎফলের প্রতি তোমার কামনা যেন না হয়; তুমি কামনা পোষণ করিয়া কর্ম্মফল (ভোগ) উৎপাদনের নিমিত্ত-ভাগী হইও না, এবং প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মেতেও তোমার আসক্তি যেন না হয়। হে ধনঞ্জয়! তুমি পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্রবুদ্ধিরহিত হইয়া কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে সমভাবাপন্ন হও এবং কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হও; এইরূপ যে সমভাব ইহাকেই "যোগ" বলে। ৪৭।৪৮ শ্লোক।

কর্ম্ম আচরণ করা কালে, তিনি আপনাকে সম্যক্ অকর্ত্তা এবং কর্ম্ম-সমস্তকে গুণকার্য্য বলিয়া ধারণা করিতে প্রযত্ন করেন ; ইহা পরে ব্যাখ্যাত জ্ঞানযোগ পাঠ করিলে, বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে।

এক্ষণে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই উভয়ের প্রভেদ উক্ত হইতেছে।

উন্নতবুদ্ধিশালী লোকের মধ্যে সাধারণতঃ দুইপ্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একপ্রকার লোকের বুদ্ধি অন্বয়ী ; তাঁহারা জগতে নানাপ্রকার বিসদৃশ বস্তু এবং বিসদৃশ কার্য্যের মধ্যে সূক্ষ্মাংশ বিচার করিয়া সাম্য অবধারণ করিতে, এবং ঐ সাম্য দর্শন করিয়া আপাততঃ বিশ্লিষ্ট বস্তু ও কার্য্যসকলকে জাতি-সংজ্ঞা দ্বারা একরূপে দর্শন করিতে সমর্থ, এবং জাতিসকলের মধ্যেও সমতা অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদিগকেও একরূপে অবধারণ করিতে সমর্থ। আবার অন্য প্রকার লোকের বুদ্ধি ব্যতিরেকী ; ইঁহারা সাধারণ ভাবে উপলক্ষিত সমতার মধ্যে ব্যতিক্রম নিরূপণ করিতে পটু।

ভক্তি ও জ্ঞান।

যাঁহাদের বুদ্ধি ব্যতিরেকী, তাঁহারাই জ্ঞানযোগের অধিকারী ; এই সকল পুরুষেরা আত্মানাত্মবিবেক সম্পন্ন ; ইঁহারা অনাত্ম-দেহাদি হইতে আত্মাকে পৃথক দর্শন করেন ; ইহাই তাঁহাদের প্রকৃতি। সাধারণ মনুষ্যগণ আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি সুন্দর, আমি কুশ্রী, আমি রোগী, আমি সুস্থ ইত্যাদিরূপ দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ; কিন্তু এই বিবেকসম্পন্ন পুরুষগণ বিচার করিয়া দেখেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত যে এই সাম্যবুদ্ধি, তাহা বাস্তবিক প্রকৃত নহে। আমি এককালে বালক বলিয়া অভিমান করিতাম, কখন যুবা, কখন প্রৌঢ় কখন বৃদ্ধ বলিয়া অভিমান করিয়াছি, অথবা করিতেছি ; কিন্তু বাস্তবিক আমার "আমিত্ব" সকল অবস্থায়ই অপরিবর্ত্তিতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে ; বালককালে যে "আমি", যুবাকালে, প্রৌঢ়াবস্থায় ও বৃদ্ধাবস্থায়ও সেই "আমি" ; বাল্যাদি

জ্ঞানযোগ।

অবস্থা সকল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এই সকল অবস্থার অন্তরালে এবং ইহাদের সংযোজকরূপে "আমি" নিত্যই সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছি। বাস্তবিক "আমি" উক্ত অবস্থাসকলের দ্রষ্টা ও ভোক্তা মাত্র;—রোগ, স্বাস্থ্য, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি আমার নানাপ্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; পাপ, পুণ্য, নানাবিধ কর্ম্ম এবং নানারূপ চিন্তা-স্রোতে "আমি" পতিত হইয়াছি, সত্য; কিন্তু এই সর্ব্বপ্রকার ভোগ, চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্যে "আমি" অপরিবর্ত্তিতরূপে এই সকলের অন্তরালে থাকিয়া ইহাদিগের সংযোজক ও সাক্ষিস্বরূপে মাত্র অবস্থিত রহিয়াছি। অতীত কালে যেসমস্ত সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে আমার নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হয়, অপরের সুখদুঃখের কাহিনী যদ্রূপ, আমারও অতীত সুখদুঃখের কাহিনী আমার নিকট প্রায় তদ্রূপই প্রতিভাত হয়; আমাকে এক্ষণে আর তাহা অভিভূত করিতে সমর্থ নহে। স্বপ্ন কালে যে সকল কর্ম্ম কৃত হয় ও সুখদুঃখাদির ভোগ হয়, জাগ্রদবস্থায় তৎসমস্ত আমার সম্বন্ধে অলীক বলিয়া বোধ হয়। আমার জীবনের অতীত কালের ভোগসকলও তদপেক্ষা অধিকতররূপে আমার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। স্বপ্নকালে ভোগসকল অনুভব করিলেও যেমন "আমি" তাঁহাদের দ্রষ্টা মাত্র ছিলাম, এইসকল ভোগও কর্ম্মের অন্তরালে থাকিয়া "আমি" যেমন ইহাদিগের সংযোজক ও দ্রষ্টা মাত্র হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলাম, এক্ষণে বিচারদ্বারা জাগ্রদবস্থার অতীত কর্ম্মসকল-সম্বন্ধেও "আমি" তদ্রূপই দ্রষ্টামাত্র ছিলাম বলিয়া বুঝিতেছি। সুতরাং ইহ সংসারের সুখ, দুঃখ, কর্ম্ম, অকর্ম্ম এই সকল আমার সম্বন্ধে স্বপ্নবৎ অলীক। আমার যে বাল্যাদি অবস্থাভেদ বলিতেছি, তাহা বাস্তবিক আমার আমিত্বের ভেদক নহে। তাহা দেহেরই অবস্থান্তর। দেহের সমস্তই দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে,

কিন্তু "আমি" ঠিক আছি; সুতরাং "আমি" এই স্থূলদেহ হইতে পৃথক্‌। পুনরায় দেখিতেছি, আমার সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাকালে আমার মন ও ইন্দ্রিয় আমাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, ইহাদিগের কোন কার্য্যই থাকে না। এবঞ্চ একটি মানসিক অথবা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় ব্যাপারের পর অপর একটি ব্যাপার আসিতেছে, তৎপর আর একটি, এইরূপে এই সকল ব্যাপার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু তাহাতেও আমার "আমিত্বের" কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না। "আমি" এই সকল ব্যাপারের অন্তরালে থাকিয়া, ইহাদিগের বোদ্ধৃস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি। ঐ অবস্থাসকল ঘটিবার সময় "আমি" ইহাদিগকে আত্ম বলিয়া অভিমান করিয়াছিলাম, এক্ষণে ঐ অবস্থাসকল অতীত হওয়ার পর আর আত্ম বলিয়া তদ্রূপ বোধ করিতেছি না; আমার অতীত কালের এই সকল ব্যাপারের কাহিনী, এবং অপরের বর্ত্তমান সুখদুঃখাদির এবং ইন্দ্রিয় ও মানসিক ব্যাপারের কাহিনী, আমার পক্ষে এক্ষণে সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অতএব ঐ ব্যাপারসকল ঘটিবার সময়ে যে আমি তাহাতে "আত্ম" বলিয়া অভিমান করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে স্বপ্নবৎ অলীক ও ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। পুনরায় দেখিতেছি যে, আমার অভিমানাত্মক বৃত্তি—যন্নিবন্ধন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের অবস্থা-সকলকে আমি, "আমার" বলিয়া বোধ করি, তাহা এই সমুদয় অবস্থার অন্তরালে ইহাদের সংযোজক-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তবে এই অভিমানাত্মক বৃত্তি কি আমার স্বরূপ? না, তাহাও নহে। কারণ, এই যে অভিমানাত্মক বৃত্তি (যাহাকে অহমিকা, অস্মিতা, ইত্যাদি শব্দে আখ্যাত করা হয়) তাহাও আমার জ্ঞানগম্য, আমার জ্ঞানের বিষয় রূপে অবস্থিত আছে। অহমিকাও একপ্রকার জ্ঞান; আমার জ্ঞান যেমন বাহ্যবস্তুকে বিষয় করে, তেমনি এই অভিমানাত্মক বৃত্তিকেও বিষয়

করে ; এবং সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাকালে মন ও ইন্দ্রিয়ের ন্যায় এই অভিমানাত্মক বৃত্তিরও লয় হইতে দেখা যায়, তখন এক অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান ও আনন্দময় অবস্থামাত্র বর্ত্তমান থাকে। পরন্তু তাহা অভিমান-বুদ্ধিশূন্য ; পরে জাগ্রত হইলেই অহংবুদ্ধি উদ্বোধিত হয়।* সুতরাং বিশুদ্ধ জ্ঞানমাত্র বৃত্তিই এই অহংবুদ্ধির অন্তরালে থাকিয়া ইহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার

* নিদ্রাও জীবের প্রকৃতি ভেদে তিন প্রকার :—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তামসিক নিদ্রা তমঃ-প্রধান প্রকৃতির লোকের হয় ; ঐ নিদ্রাকালে মনুষ্য প্রায় জড়ের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়ে, বহু চেষ্টা করিয়া ঐ তামসিক নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়। নিদ্রিত ব্যক্তির তৎকালে প্রায় কিছুমাত্র স্ফুরণ থাকে না ; নিদ্রাভঙ্গের পর ঐ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি আপনাকে অতিশয় আলস্যযুক্ত বোধ করে, শরীর অতি ভারী বলিয়া বোধ হয়, যেন তাহা পরিচালন করিতে সে অসমর্থ ; কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অল্পে অল্পে আলস্য দূর হয়, এবং সে সুস্থ বোধ করে। নিদ্রিতাবস্থায় যে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞানের স্ফুরণ ছিল, তাহা সে বোধ করে না। এইটি তামসিক নিদ্রার লক্ষণ। রাজসিক প্রকৃতির লোক অতি পরিশ্রান্ত হইলে তামস-শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া, তামসিক নিদ্রা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহারা তামসিকপ্রকৃতিযুক্ত লোকের ন্যায় অতিশয় জড়তা প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু রাজসিক প্রকৃতির লোকের প্রায়শঃ রাজসিক নিদ্রাই হইয়া থাকে। এই নিদ্রা তামসিক নিদ্রার ন্যায় গাঢ় নহে ; স্বপ্নদ্বারা তাহার গাঢ়তা ভগ্ন হয়, কোন না কোন প্রকার চিন্তাস্রোত মৃদু অথবা তীব্রভাবে স্বপ্নরূপে নিদ্রার গাঢ়তার বিঘ্ন জন্মায়। [illegible] নিদ্রাভঙ্গ হইলে, নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি সহজে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করে ; কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক গরম ও মন অপ্রসন্ন বোধ হয়। সাত্ত্বিক নিদ্রা অতিলঘু, ও আনন্দদায়ক। অধিক চিন্তাকুল এবং বিষয়বাসনাযুক্ত ব্যক্তির এই নিদ্রা হয় না। যাঁহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল ও স্থির এবং যাঁহারা অধিক বিষয়চিন্তা করেন না, তাঁহাদেরই পক্ষে এই নিদ্রা সুলভ। এই নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, জাগ্রদ্ব্যক্তি কিঞ্চিন্মাত্রও আলস্য বোধ করেন না, তাঁহার দেহ অতি লঘু বলিয়া বোধ হয়, এবং তিনি চিত্তের পরম প্রসন্নতা অনুভব করেন। এই সাত্ত্বিক নিদ্রা যখন অবাধে হইতে থাকে, তখনই সুপ্তব্যক্তির অভিমানাত্মক বৃত্তিরও লয় ঘটে, এবং তিনি নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও বস্তু-নিরপেক্ষ আনন্দমাত্রে নিমগ্ন হয়েন। জাগ্রৎ হইলে সেই জ্ঞানানন্দের কিঞ্চিৎ স্ফুরণ থাকে এবং তৎকালে অভিমানাত্মক বৃত্তিরও উদয় হওয়ায়, তিনি নিদ্রিতাবস্থায় আনন্দে ছিলেন বলিয়া বোধ করেন। রাজসিক প্রকৃতির লোকেরও সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হইলে, কখন কখন এই প্রকার নিদ্রাসুখ কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হইতে পারে।

সংযোজক স্বরূপ হইয়া থাকা সিদ্ধান্ত হয়। * অতএব অভিমানাত্মক যে অহংবৃত্তি এবং মনঃ ইন্দ্রিয়াদি ও দেহ, এই সমস্তই প্রকৃত "আমি" হইতে ভিন্ন। এইরূপ বিচার-নিষ্ঠ ব্যক্তির, সূক্ষ্ম বিচারের পর, ইহাও প্রতিভাত হয় যে, শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র যে বৃত্তি এই সকলের অন্তরালে আছে, তাহারও দ্রষ্টৃরূপে, তাহা হইতে পৃথক্-ভাবে "আমি" বর্ত্তমান আছি; কারণ জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞানকে বোধ করে না; সুতরাং এই জ্ঞানের বোদ্ধৃস্বরূপ যে পুরুষ, তাহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ; ইহা শ্রুতি এবং আপ্ত-ঋষিগণও বলিয়াছেন। শুদ্ধ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও দেহ হইতে পৃথক্‌রূপে এই পুরুষের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত যে বিচার, তাহাকে আত্মানাত্ম-বিবেক বলে; এই বিবেককে অবাধমান ও স্থায়ী করাকেই জ্ঞানযোগ বলে। যাঁহার অন্তরে এই বিচার নিয়ত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারে নিয়তই স্বভাবতঃ বৈরাগ্যযুক্ত, ; সাংসারিক সুখদুঃখের অনিত্যতা ও অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিক বোধ জন্মিয়াছে। তিনি আত্মার স্বরূপ চিন্তনে সর্ব্বদা অনুরক্ত, এবং তাঁহার বুদ্ধি অতি সূক্ষ্মদর্শী হওয়ায়, অনাত্মাংশ হইতে আত্মাংশকে পৃথক্ করিয়া লইতে তিনি সমর্থ। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানযোগের অধিকারী এবং এইরূপ অনাত্মহইতে আত্মাকে পৃথক্‌রূপে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত যে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, তাহাই জ্ঞানযোগ বলিয়া আখ্যাত হয়। ইহা দ্বারা জ্ঞানযোগী অবশেষে দ্রষ্টা পুরুষকে পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞানাত্মক বৃত্তি হইতেও পৃথক্-রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন। পরন্তু বিষয়-ভোগে আসক্ত ব্যক্তির এইরূপ বিচার উপস্থিত হয় না। সংসারে জাত

* এই বিশুদ্ধ অভিমানবৃত্তি-বিরহিত জ্ঞানবৃত্তিই নির্ম্মল সত্ত্বগুণ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ইহাকেই সাংখ্যজ্ঞানীরা বুদ্ধি অথবা মহত্তত্ত্ব অথবা মুখ্য অন্তঃকরণবৃত্তি বলিয়া থাকেন।

অবশ্যম্ভাবী দুঃখসকল কাহারও কাহারও অন্তরে বিষয়ের প্রতি স্বভাবতঃ বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া দেয়। এই বিষয়-বৈরাগ্যই জ্ঞানযোগের প্রবর্ত্তক। সকলপ্রকার বিষয়ভোগের অনিত্যতা দর্শন করিয়া এবং সংসারকে দুঃখময় দেখিয়া, তাহা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে বিচার স্বভাবতঃ কাহারও কাহারও অন্তরে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ বৈরাগ্যও বিচারযুক্ত ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানযোগই উপযোগী। তাঁহার বুদ্ধি ঐ জ্ঞানযোগেরই অনুকূল। এই ভোগায়তন দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ কি, কি নিমিত্ত আমার সুখদুঃখাদি ভোগ হয়, কিরূপে আমি এই দুঃখ হইতে আত্যন্তিক মুক্তি-লাভ করিতে পারিব, আমার প্রকৃতস্বরূপ কি? এইরূপ বিচার স্বভাবতঃই ঐ ব্যক্তির উদয় হয়, এবং ইহাই জ্ঞানযোগের অধিকার লক্ষণ। দুঃখের অনুভব বা দর্শন ব্যতিরেকে শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন দ্বারাও বুদ্ধি মার্জ্জিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত ব্যতিরেক-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞানযোগের অধিকারী হইতে পারেন। আত্মনিষ্ঠ হওয়াতে তিনি স্বভাবতঃই ভোগবিষয়ে বিরক্ত হয়েন। বস্তুতঃ যেরূপেই হউক, ভোগ্য-বিষয়ের প্রতি অতিশয় বৈরাগ্যযুক্ত না হইলে, জ্ঞানযোগের অধিকারী হওয়া যায় না।

ভক্তিযোগ।

অন্বয়ি-বুদ্ধি-বিশিষ্ট মনীষিগণ এই জগতের বিচিত্রতার মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ও পরস্পরের পরস্পরের সহিত অবিচ্ছিন্ন উপযোগিতা সম্বন্ধ ধারণা করিয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই নিয়ন্তার অধীন এবং একই ঈশ্বরের লীলামাত্র, এবং তাহা একই ব্রহ্মের প্রকাশ বলিয়া, অবধারণ করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং তদ্বিষয়ক শ্রুতিসকল তাঁহাদিগের বিশেষরূপে আদরণীয় ও উপযোগী হয়। এই সকল উত্তম মনুষ্য সমুদয় বিশ্বকে এক ঈশ্বরের দেহস্বরূপ, সমুদয় জীবকে এক ঈশ্বরেরই

বিশেষ বিশেষ শক্তিমাত্র বলিয়া অবধারণ করেন, এবং তাঁহারা চরাচর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে এক ঈশ্বরেরই লীলাভাবনারূপ উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, এবং তাঁহাদের ধারণাশক্তি তদ্বিষয়ে এইরূপ স্থিরতা প্রাপ্ত হয় যে, তাঁহাদের অহংরূপ পার্থক্যবুদ্ধি আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় উপনীত হইলে, তাঁহারা পরমপ্রেমরূপা পরাভক্তি লাভ করিয়া প্রকৃত পরাভক্তিযোগের অধিকারী হয়েন। এই ভক্তিযোগ লাভ করিয়া, অবশেষে পরব্রহ্মে লীন হয়েন ও তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। জ্ঞানযোগীরা পুরুষস্বরূপ অবগত হইয়া যে মুক্তি লাভ করেন, সেই মুক্তি আপনা হইতে আসিয়া, এই সকল ভক্তিমান্ যোগীকে আশ্রয় করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, অষ্টাদশ অধ্যায়ে, ৫৪ ও ৫৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ পরাভক্তিযোগের অধিকারী ও ঐ ভক্তিযোগের ফল এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ *

এই পরাভক্তিযোগের স্বরূপ কি, তাহা পরে বিবৃত হইবে। এক্ষণে ইহার অধিকারিমাত্র বর্ণিত হইল। পরন্তু এইটি ভক্তিযোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থার লক্ষণ ও অধিকার। এই অধিকার সম্যক্ লাভ করিবার পূর্ব্বে যে

---

* ব্রহ্মের সহিত একাত্মতাজ্ঞানে অবস্থিত, সুতরাং প্রসন্নচিত্ত, পুরুষ কখন শোক করেন না, কখন কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্ব্বভূতে সমদর্শনযুক্ত হয়েন এবং তদবস্থায় আমার (ভগবানের) সম্বন্ধে পরা (শ্রেষ্ঠ) ভক্তি লাভ করেন। এই ভক্তিবলে তিনি আমার জগদতীত যথার্থ স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপিত্ব সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি শক্তি তত্ত্বতঃ অবগত হইতে সমর্থ হয়েন ; অনন্তর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া তিনি আমাতেই প্রবিষ্ট হয়েন, অর্থাৎ মৎস্বরূপতা লাভ করেন।

কর্ম্মযোগ অথবা ক্রিয়াযোগ আবশ্যক, তাহাকেও সচরাচর ভক্তিযোগ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই কর্ম্মযোগের দুইটি ভূমি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—কর্ম্মফল-ত্যাগরূপ প্রথম ভূমি, এবং ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণরূপ দ্বিতীয় ভূমি। এই দ্বিতীয় ভূমিতে সম্যক্ আরূঢ় হইলে, পরাভক্তি-যোগ-লাভের অধিকার জন্মে। পরাভক্তির সহিত পার্থক্য দেখাইবার নিমিত্ত কর্ম্মযোগানুগত ভক্তিকে বৈধীভক্তি অথবা সাধনভক্তি, এবং নিষ্কাম ভক্তি, এই দুই নাম দ্বারা ঋষিগণ আখ্যাত করিয়াছেন। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ভগবৎপ্রীতি-সাধনের নিমিত্ত তাঁহার আদেশরূপ—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের যে অনুষ্ঠানপরতা, তাহাকেই বৈধীভক্তি অথবা সাধনভক্তি বলে। ইহাই কর্ম্মযোগের প্রথম ভূমি। পরন্তু এই প্রকার ভক্তিযোগে কর্ত্তার ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে, এবং তাঁহার নিজের সম্বন্ধে অন্য কামনা না থাকিলেও, ভগবৎ-প্রীতি-সাধন-কামনা তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণরূপ কর্ম্ম-যোগের দ্বিতীয় ভূমিতে, সমুদয় অনুষ্ঠিত কর্ম্মে কর্ত্তার আপন কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি না থাকিয়া, ব্রহ্মে তত্তাবৎ অর্পিত হওয়ায়, এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতার ভক্তিকে বিশুদ্ধ নিষ্কাম-ভক্তি বলা যায়। পরন্তু এই উভয় প্রকার ভক্তিযোগই পরাভক্তি-যোগলাভের সাধন মাত্র; অতএব পূর্ব্বোক্ত সাধনভক্তি ও নিষ্কাম ভক্তি, উভয়কেই অনেকস্থলে সাধন-ভক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হয়, এবং এই গ্রন্থেও তাহাই করা যাইবে। অতএব দেখা যায় যে, ভক্তিযোগ দ্বিবিধ (১) পরাভক্তি যোগ, (২) সাধন-ভক্তিযোগ (এই দ্বিতীয়টি ভক্তিমার্গানুগত কর্ম্মযোগ)।

যাঁহারা কর্ম্মফল কামনা করেন, পরন্তু শাস্ত্রবাক্যসকল ভগবৎকর্ত্তৃক উক্ত, (অথবা অনুমোদিত) বলিয়া স্বেচ্ছাচার-বিরহিত ভাবে শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়াই কাম্য ভোগসকল প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও কোন কোন শাস্ত্রে ভক্তিমার্গী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কারণ

ভগবৎপ্রীতি-নিবন্ধন তাঁহারা কাম্যভোগ-প্রাপ্তি-বিষয়ে স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করেন, এবং ভগবদাদেশ প্রতিপালন করিয়াই তাঁহারা বিষয়-ভোগলাভ করিতে ইচ্ছা করেন। শাস্ত্রে ইন্দ্রাদি দেবতাসকলের অর্চ্চনা উক্ত আছে সত্য; কিন্তু এই সকল দেবতা যে এক পরমেশ্বরেরই শক্তিবিশেষ, শ্রুতিশাস্ত্রে তাহারও পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে; সুতরাং এই সকল দেবতা সম্যক্ উপাসিত হইয়া যে কাম্য সুখসমৃদ্ধি সকল দান করেন, তাহা ভগবৎ-প্রদত্ত বলিয়াই তাঁহারা গ্রহণ করেন। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া নানাপ্রকার বাঞ্ছিতভোগ লাভে তাঁহাদের ভগবৎপ্রীতি সমধিক বর্দ্ধিত হয়। যিনি এমন ভোগ সকল দান করেন এবং অভীপ্সিত ভোগ-লাভের নিমিত্ত যিনি এমন অব্যর্থ উপায়সকল শাস্ত্রমুখে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার পরম কারুণিকতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তৎপ্রতি তাঁহাদের প্রীতি সমধিক বর্দ্ধিত হইতে থাকে; সুতরাং তাঁহাদের ভোগবাসনাও আপনাহইতে ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং ভোগদাতার প্রতি ভক্তিই অন্তঃকরণের উপর আধিপত্য লাভ করে. পরিশেষে কর্ম্মের শুভাশুভ ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া. তাঁহারা কেবল ভগবৎপ্রীতি লাভের উদ্দেশ্যেই তাঁহার আদেশ প্রতিপালনরূপ বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানসকল সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাঁহারা যোগিশ্রেণীভুক্ত হইয়া যান, এবং উত্তরোত্তর প্রীতির আধিক্য লাভ করিয়া ক্রমশঃ পরা-ভক্তিযোগ লাভ করেন এবং অবশেষে পরব্রহ্মে লীন হয়েন। ভগবৎপ্রীতি জন্মিলে সকাম পুরুষও এইরূপে ক্রমশঃ জীবন্মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন বলিয়া, সকাম ভগবদ্ভক্তকেও ভক্তিযোগী বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরন্তু বিধিপূর্ব্বক উপাসিত হইলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ অভীপ্সিত স্বর্গাদি ভোগ দান করেন; -এই মর্ম্মের যে সকল শ্রুতি আছে, তৎপ্রতিই যাঁহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট, এবং ভেদবুদ্ধি-

নিবন্ধন যাঁহারা এই সকল দেবতাকে ব্রহ্মরূপে ভজনা করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহাদিগকেই শ্রীমদ্‌ভাগবতে কর্ম্মযোগী শব্দদ্বারা আখ্যাত করা হইয়াছে। এইরূপ বর্ণনাতে ফলতঃ কোন প্রভেদ নাই, কেবল ভাষার প্রভেদ মাত্র। বিশুদ্ধ পরাভক্তিযোগের প্রাগবস্থায় যে কর্ম্মযোগ উক্ত হইয়াছে, তাহা এবং সকাম ভগবদারাধনা—এই উভয়কে পূর্ব্বোক্ত কারণাধীন ভক্তিযোগের অন্তর্ভূত গণ্য করিয়া, কেবল দেবতাতে ভেদ বুদ্ধিযুক্ত সকাম-কর্ম্মীকেই কর্ম্মযোগী বলিয়া পৃথক্ শ্রেণী গণনা করা হইয়াছে। যথা,—শ্রীমদ্‌ভাগবত সংহিতার একাদশ স্কন্ধে বিংশতিতম অধ্যায়ে উদ্ধব প্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্য,—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৬
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্ ॥ ৭ ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" ॥ ৮

পরন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ফলাভিসন্ধি-রহিত কর্ম্মানুষ্ঠান হইতেই কর্ম্ম-যোগারম্ভ বলিয়া উক্ত আছে, এবং ফলকামনাযুক্ত কর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে ; এইস্থলে তদনুসারেই এই সকল শব্দ ব্যবহৃত হইল। ইহাতে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই।

---

* মানবগণের শ্রেয়ঃ সাধনার্থ ত্রিবিধ যোগ আমি উপদেশ করিয়াছি, যথা,—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি ; তদ্ব্যতীত শ্রেয়োলাভের আর কোন উপায় নাই। যাঁহারা বিষয়-সুখে বিরাগযুক্ত, সুতরাং, তৎপ্রাপক কর্ম্ম হইতেও যাঁহারা বিরত, তাঁহাদিগের জ্ঞানযোগে অধিকার। যাঁহাদের বিষয়সুখে বৈরাগ্য জন্মে নাই ; পক্ষান্তরে যাঁহারা বিষয়সুখই কামনা করেন, তাঁহারা কর্ম্মযোগের অধিকারী। মৎসম্বন্ধীয় কথাতে স্বভাবতঃ যে পুরুষের প্রীতি জন্মে, যিনি অতিশয় বৈরাগ্যযুক্তও নহেন, অথচ অতিশয় বিষয়াসক্তও নহেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগই ফলপ্রদ হয়।

নারদ-পঞ্চরাত্রপ্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে জ্ঞানযোগীরই "মুমুক্ষু" সংজ্ঞা করা হইয়াছে; এবং পরাভক্তিযোগী ও সাধনভক্তিযোগী উভয়কেই "ভক্ত" সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে; ইহাতেও কেবল ভাষারই প্রভেদ; মূলতঃ কিছু পার্থক্য নাই। পূর্ব্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভক্তিমার্গাবলম্বী পুরুষ বিষয়-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইবে কি রাখিতে হইবে, তদ্বিষয়ের বিচারে জ্ঞানযোগীর ন্যায় প্রবৃত্ত নহেন; ভগবৎপ্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমই তাঁহার সাধনবিষয়ে প্রেরক; সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির ইচ্ছা করিয়াও তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন না; এই নিমিত্ত তাঁহাকে মুমুক্ষু (অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছুক) বলিয়া বর্ণনা না করিয়া, কেবল ভক্ত বলিয়া পৃথক্‌রূপে আখ্যাত করা যাইতে পারে। পরন্তু জ্ঞানযোগীও যেমন বিষয়ভোগ ইচ্ছা করেন না, দেহাদিপ্রপঞ্চ হইতে অতীত আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে যত্নশীল; ভক্তিযোগীও নিজের নিমিত্ত তদ্রূপই বিষয় সুখেচ্ছা হইতে বিরত, এবং সর্ব্বকারণের কারণ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে যত্নশীল; উভয়েরই অবস্থা এই অংশে প্রায় একরূপ; সুতরাং তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া, উভয়কেই মুমুক্ষু ভূমিতে অধিরূঢ় বলিয়া, অপরাপর গ্রন্থে উভয়কেই "মুমুক্ষু" বলা হইয়া থাকে। ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মতদ্বৈধ নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানযোগ বৈরাগ্য এবং আত্মানাত্মবিবেকাত্মক। তদনুগামী যে কর্ম্মযোগ, তাহার অষ্টবিধ অঙ্গ আছে যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। তন্মধ্যে সমাধিই প্রধান। অপর সাতটি এই সমাধির আরম্ভক মাত্র। সমাধি দ্বারা চিত্তের মল দূরীভূত হয় এবং ক্রমশঃ আত্মানাত্মবিবেক সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয়; বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত জ্ঞানযোগ আরম্ভ হয়। ভগবান্ পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্রে এই "যোগ" বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

জ্ঞানযোগের বিচার সাংখ্যদর্শনে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানযোগকে "জ্ঞান" অথবা "সাংখ্য" বলিয়া দার্শনিকেরা বর্ণনা করেন, এবং ভক্তিযোগকে কেবল "ভক্তি" বলিয়া বর্ণনা করেন। এই সকল বিষয় পরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে। এক্ষণে কেবল ভাষার প্রভেদ দেখাইবার জন্য ইহা উল্লেখ করা হইল। এই ভাষার প্রভেদে ঋষিদের বাক্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই।

এ যাবৎ যে সাধনভক্তি ও পরাভক্তি যোগের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা উত্তম অধিকারীর পক্ষে। কিন্তু এইরূপ অধিকারী ব্যক্তি অতি বিরল। সমগ্রবিশ্বকে একরূপে দর্শন করিতে, অতি অল্প লোকেরই, সামর্থ্য আছে; তর্কবুদ্ধিদ্বারা যদি বা অনেকে ইহা সন্মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু এই বিচিত্রতার মধ্যে কার্য্যকালে একতা দর্শন করা অতি কঠিন ব্যাপার। শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছেন —

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"॥ (৫ম অধ্যায় ১৮শ শ্লোক)

পুনরায় বলিয়াছেন,—

"সাধুষ্বপিচ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে"। (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯ম শ্লোকার্দ্ধ)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর এবং চণ্ডাল এতৎসমস্তের প্রতি জ্ঞানী পুরুষ সমদর্শী হয়েন। সাধু ও পাপী এই সকলে যে সমবুদ্ধি, তাহাই শ্রেষ্ঠবুদ্ধি। অবশ্য তর্কবুদ্ধি দ্বারা অনেকে বুঝিতে পারেন যে, জগতের কর্ত্তা যখন একই, তখন বাস্তবিকই কেহ স্বাধীন নহে; সকলেই সেই এক কর্ত্তার হস্তস্থিত যন্ত্রস্বরূপ; অতএব এই অর্থে পাপী ও পুণ্যাত্মা উভয়ই সমান। কিন্তু তর্ক দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করা এবং সকলের প্রতি এইরূপ সমবুদ্ধি লাভ করা, এককথা নহে। শ্রীভগবানের বিরাটরূপ দর্শন করিয়া, শ্রীমন্নরদেব

অর্জ্জুন পর্য্যন্ত একেবারে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন। সুতরাং বিশ্বব্যাপী বিরাটব্রহ্ম ধ্যান করিবার অধিকার অতি অল্পলোকেরই আছে; এবং প্রত্যেক বস্তুকে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে, ভগবদঙ্গরূপে, এবং প্রত্যেক কার্য্যকে ভগবৎ কার্য্যরূপে, ধ্যান করিতে অতি অল্প লোকেরই সামর্থ্য আছে। শ্রীভগবান্ ভগবদ্গীতার ৭ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে,—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ (৭ম অধ্যায় ৩য় শ্লোক)
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ"॥ (১৬শ শ্লোক)

উদারাঃ সর্ব্বএবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ সহি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮শ (শ্লোক)
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (১৯ শ্লোক) †

পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ শ্লোকে যে জ্ঞানীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহার যে সকল লক্ষণ ঐ সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই জানা যায় যে, ইনি বেদান্ত মীমাংসায় সুনিপুণ এবং নিষ্কাম ভক্ত; সুতরাং ভগবান্ তাঁহাকে

---

* সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করে; যাঁহারা যত্ন করিয়া সিদ্ধ হন, তাঁহাদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সুকৃতিশালী চতুর্ব্বিধ লোক আমার ভজনা করেন, যথা,—দুঃখী, জ্ঞানলাভেচ্ছু, প্রয়োজনীয় বস্তুপ্রার্থী, এবং জ্ঞানী।

† ইঁহারা সকলেই মহান্ ব্যক্তি (কারণ আমাকে ভজন করিতে তাঁহাদের রুচি হইয়াছে)। কিন্তু জ্ঞানীই আমার আত্মস্বরূপ প্রিয়; কারণ সেই যুক্তাত্মা পুরুষ লব্ধব্য বস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে আমি, সেই আমাকেই সম্যক্ আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, তিনিও বহু জন্মের পর (বহুজন্মের সাধনের পর) এই চরাচর বিশ্ব সমস্তই বাসুদেব এইরূপ জ্ঞানে সম্যক্ স্থিতি লাভ করিয়া, আমাকে প্রাপ্ত হয়েন; তাদৃশ মহাত্মা পুরুষ অতি দুর্লভ।

তাঁহার অতিশয় প্রিয় বলিয়া অষ্টাদশ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। তৃতীয় শ্লোকে যে সিদ্ধদিগের কথা উল্লিখিত আছে, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও এই জ্ঞানী পুরুষ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ঊনবিংশ শ্লোকে ভগবান্ বলিলেন যে, বহুজন্ম ভজনের পর, এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি চরাচর সমগ্র বিশ্বকে বাসুদেবস্বরূপ বলিয়া ধারণা করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উত্তম ভক্তিযোগের অধিকারী যে ইহ সংসারে অতি বিরল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ অনেক পুরুষ এইরূপ আছেন, যাঁহাদের প্রকৃতি ভক্তিময়; শুষ্ক ও কঠিন বিচারাত্মক জ্ঞানযোগে ইঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না এবং ইঁহারা তদ্বিষয়ে পটু নহেন। এবংবিধ ব্যক্তি সকলের শ্রেয়ঃসাধন নিমিত্ত ভগবান্ যুগে যুগে যোগময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার এই সকল মূর্ত্তি স্বয়ংসিদ্ধ; এই মূর্ত্তিসকলের এইরূপই প্রভাব যে, যে কোন কারণ হেতু তাহা ধ্যানের বিষয় হইয়া হৃদয়ে স্থিররূপে ধৃত হইলে, জীবের সর্ব্বপ্রকার ভববন্ধন মুক্ত করে এবং ধ্যানকারী ব্যক্তির চিত্তের ধারণাশক্তি এইরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয় যে, অবশেষে সেই সকল পুরুষ সম্যক্ পরাভক্তি লাভ করিয়া, অন্তিমে পরব্রহ্মে লীন হয়েন। একদিকে ভগবদ্বিগ্রহ-মূর্ত্তি যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য-বিষয়রূপে ধ্যেয়াকারে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, বাসনাবন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন ও বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করে, তদ্রূপ করুণাময় ভগবান্ অপরদিকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ব্রহ্মবোধক সিদ্ধ প্রণবাদি-শব্দরূপে ও ধ্যেয়াকারে মানসমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সাধকের শ্রেয়ঃসাধন সম্পাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রণবাদিশব্দব্রহ্মের পুনঃ পুনঃ স্মরণ এবং বিগ্রহ শরীরধারী ব্রহ্মের রূপ পুনঃ পুনঃ ভক্তিপূর্ব্বক চিন্তন, এই দুই প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া, অপেক্ষাকৃত অধমাধিকারী ব্যক্তিও সম্পূর্ণ উত্তম অধিকার লাভ করেন, এবং অবশেষে পরাভক্তিযোগ

অবলম্বনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে সমতাপ্রাপ্ত হয়েন।* ভগবান্ বিশেষ বিশেষ যুগের ও বিশেষ বিশেষ লোকের পক্ষে বিশেষরূপে উপযোগী মূর্ত্তিসকল ধারণ করিয়াছেন। কলিযুগের প্রারম্ভেই মনুষ্যলোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বসম্প্রদায়ের এক মত। মহাভারতে, শ্রীমদ্ভাগবতে ও অপরাপর পুরাণে ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ শ্রীরামমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ রাক্ষসভারাক্রান্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া, দেবতা ও মনুষ্যকে বিগতজ্বর করিয়াছিলেন। নরসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুর বধ-সাধন দ্বারা প্রহ্লাদকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। দুর্গা, কালিকা ইত্যাদি দেবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুরদলনদ্বারা দেবগণকে বিজ্বর করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে এই সকল বিষয়ে কোন বিরোধ নাই।† এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপ প্রকট-মূর্ত্তিতেই যে শ্রীভগবান্ জগদ্ব্যাপার সম্পাদন করেন, তদ্বিষয়েও কোন জাতীয়-

* এতৎ সম্বন্ধে উপসংহার প্রকরণে আরও কিছু বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

† পরন্তু এক্ষণে কেহ কেহ বলেন যে, দেবীভাগবত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বীকার করেন না; পরন্তু তাহা প্রকৃত নহে; তদ্বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক দেবীভাগবত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। যথা—দেবীভাগবতের নবম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

গণেশ-জননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রীচ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতাঃ॥
প্রকৃতে র্লক্ষণং বৎস কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
কিঞ্চিত্তথাপি বক্ষ্যামি যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রতঃ॥

* * * *

প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥
যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামার্দ্ধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥

সম্প্রদায়ের মত-বিরোধ নাই। পরন্তু কেহ কেহ ভগবানের স্ত্রীমূর্ত্তিভজনে অনুরক্ত; তাঁহারা শাক্ত বলিয়া পরিচিত; কেহ কেহ ভগবানের প্রকাশিত পুং-মূর্ত্তিতে আসক্ত; তাঁহারা বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য ইত্যাদি শ্রেণীতে

সা চ ব্রহ্ম-স্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী।
যথাত্মা চ তথা শক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্থিতা॥
অতএব হি যোগীন্দ্রৈঃ স্ত্রীপুংভেদো ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ সদপি নারদ॥
স্বেচ্ছাময়স্বেচ্ছয়া চ শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়া।
সাবির্বভূব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী॥
তদাজ্ঞয়া পঞ্চবিধা সৃষ্টিকর্ম্ম-বিভেদিকা।
অথ ভক্তানুরোধাদ্বা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা॥
গণেশমাতা দুর্গা যা শিবরূপা শিবপ্রিয়া।
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী॥
ব্রহ্মাদি দেবৈর্মুনিভির্মনুভিঃ পূজিতা স্তুতা।
সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সর্ব্বরূপা সনাতনী॥

৯ম স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়—

যথাগ্নৌ দাহিকা চন্দ্রে পদ্মে শোভা প্রভা রবৌ।
শশ্বদ্ যুক্তা ন ভিন্না সা তথা প্রকৃতিরাত্মনি॥

* * * *

স চাত্মা স পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।
কৃষিস্তদ্ভক্তবচনো নশ্চ তদ্দাস্যবাচকঃ॥
ভক্তিদাস্যপ্রদাতা যঃ স চ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কৃষিশ্চ সর্ব্ববচনো নকারো বীজমেব চ॥
স কৃষ্ণঃ সর্ব্বস্রষ্টাদৌ সিসৃক্ষন্নেক এব চ।
সৃষ্ট্যুন্মুখস্তদংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভুঃ॥
স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়া চ দ্বিধারূপো বভূব হ।
স্ত্রীরূপো বামভাগাংশো দক্ষিণাংশঃ পুমান্ স্মৃতঃ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে দেবীভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতে কোন প্রকার প্রভেদ নাই। পরন্তু শ্রীভগবান্ অবতার গ্রহণ করিলে, অবতারগণ দেহধারী জীববৎ আচরণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্মচেষ্টা দৃষ্টে লোকের ভ্রম জন্মিয়া থাকে। যে বিগ্রহ হইতে যেরূপ শক্তি প্রকাশিত হয়, তদনুসারে অবতারসকলেরও মধ্যে কাহাকে অংশ কাহাকেও কলা এবং কাহাকেও বা পূর্ণ বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বিভক্ত। এই সকল সাধকদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বভাবতঃ ভেদ-বুদ্ধিযুক্ত, তাঁহাদিগের উপাস্য-মূর্ত্তির প্রতি আস্থা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত পুরাণসকল বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণ বৈষ্ণবদিগের, কোন কোন পুরাণ শৈবদিগের, এবং কোন কোন পুরাণ শাক্তদিগের বিশেষোপযোগী ইত্যাদি। বৈষ্ণবদিগের উপযোগী পুরাণসকলে বিষ্ণুকেই পরব্রহ্ম ও সকলের সারাৎসার এবং অপর সকল তাঁহাহইতে সম্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণে মহাদেব রুদ্রই পরব্রহ্ম এবং তাঁহাহইতে অপর সকলের সৃষ্টি ও সংহার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণে দেবীকেই পরব্রহ্ম বলিয়া, অপর সকল তাঁহাহইতে সম্ভূত বলা হইয়াছে। ইহা কেবল তত্তৎ উপাসকদিগের উপাস্য-বিষয়ে নিষ্ঠা বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত। ইহাকে বাস্তবিক মিথ্যা বাক্যও বলা যায় না; কারণ বস্তুতই শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"

সমস্তই ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। তিনিই জীবের একমাত্র উপাস্য। সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শক্তি ইত্যাদি বাস্তবিকই ব্রহ্মের প্রকাশ। অপ্রকাশ নিরাকার পরব্রহ্মোপাসনা সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব। কারণ সাধারণ জীবের বুদ্ধি নির্ম্মল নহে। সাধারণতঃ সূক্ষ্ম পরমাণু অথবা বিস্তৃত আকাশ অতিক্রম করিয়া, তদতীত পরব্রহ্ম জীবের ধ্যানের বিষয় হইতে পারেন না; কোন প্রকার চিন্তা করিতে গেলেই, চিন্তা কোন না কোন প্রকার আকার ধারণ করে। কেবল সমাধি-প্রজ্ঞা-যুক্ত ব্যক্তিই নিরাকার-ধ্যানে সমর্থ হইতে পারেন। পরমাত্মা অথবা আত্মা (পুরুষ) সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহাদেরও ধ্যানগম্য হয়েন না; কেবল যাহা কিছু বুদ্ধিগম্য, তৎসমস্তহইতেই আত্মা অতীত জানিয়া জ্ঞানমার্গাবলম্বী যোগিগণ বুদ্ধিগম্য বস্তুজ্ঞান লয় করিয়া, আত্মস্বরূপ অবগত

হইবার নিমিত্ত, (আত্মার প্রকাশের নিমিত্ত) প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, তখন আত্মা প্রকাশিত হয়েন। পরাভক্তি-মার্গাবলম্বী যোগিগণের সাধন কিঞ্চিৎ অন্যরূপ হইলেও, এতৎ-সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং সাধারণ জনগণ বিষ্ণু, শিব, বিরিঞ্চি, রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী ইত্যাদি কোন না কোন প্রকাশরূপের ভজনেরই অধিকারী হয়। অতএব ভগবানের যে যে প্রকাশ-মূর্ত্তিতে উপাস্যরূপে ভক্তের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাঁহাকেই পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া, ঋষিগণ উপাসনার নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন এবং অপর-সকলকে তত্তুলনায় সৃষ্ট ও অল্পশক্তিধারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা কেবল সাধকের উপাস্য-বিষয়ে নিষ্ঠা বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত। এই উপাসনা করিতে করিতে, যখন চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং দ্বৈতবুদ্ধি দূর হয়, তখন স্বভাবতঃই সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা দূর হইয়া যায় এবং ঋষিদিগের বাক্যের যথার্থমর্ম্ম বোধগম্য হয়। * সুতরাং নানা সাধক-সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকা দেখিয়া, ঋষিদিগের মতদ্বৈধ কল্পনা করা উচিত নহে। পুরাণসকল সমস্তই বেদব্যাস-প্রণীত, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; অথচ এক এক শ্রেণীর পুরাণে এক এক প্রকার উপাসনার ও এক এক উপাস্যদেবতার শ্রেষ্ঠতা বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা

* ঈশ্বর-বোধে বিশেষ বিশেষ বিগ্রহ অথবা শক্তির উপাসনা অপরাপর দেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও প্রবর্ত্তিত আছে; যেমন কোন কোন রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় যীশুখ্রীষ্টকে ভগবান্ বলিয়া তাঁহার ও তাঁহার মাতা মেরীর মূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন, এইরূপ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। জরোষ্টার ধর্ম্মাবলম্বিগণ সূর্য্যদেবকে ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করেন; বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিগণ অনেকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আরাধনা করিয়া থাকেন। এইরূপ উপাসনা দ্বারা সকলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তবে উপাস্যের প্রকৃতি ও শক্তি ভেদে, এবং উপাসনার গাঢ়তা-ভেদে, ফলের তারতম্য হয়, সন্দেহ নাই।

স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপাস্য আপাততঃ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, মূলতঃ তাহাতে কোন বিরোধ নাই।

ঈশ্বরবুদ্ধিতেই ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের লোক আপন আপন অধিকার অনুসারে স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন এবং ক্রমশঃ উন্নত ভক্তি-সাধনাধিকার লাভ করেন। অতএব এইরূপ উপাসকগণও ভক্তিমার্গাবলম্বী বলিয়া গণ্য; সকাম নিষ্কাম প্রভৃতি ভেদে তাঁহারাও কর্ম্মী এবং যোগীদিগের শ্রেণীভুক্ত হয়েন; অবশেষে পরাভক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন।

পরন্তু এই বিষয় বিশেষরূপ বুঝিতে হইলে, জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়-বিষয়ক জগত্তত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব ও পরব্রহ্মস্বরূপ ঋষিগণ যেরূপ অবগত হইয়াছিলেন, তাহা কিঞ্চিৎ বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। যে বিদ্যা দ্বারা এই সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলে। এই ব্রহ্মবিদ্যা এক্ষণে প্রমাণসহ পরবর্ত্তী দুই পাদে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মবিদ্যা সম্যক্ আলোচিত হইলে, ঋষিদিগের দার্শনিক উক্তিতেও আর বিরোধ থাকা দৃষ্ট হইবে না। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যান্তে এই গ্রন্থের উপসংহারে পুনরায় এই বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা যাইবে। পাঠকবৃন্দের সুবিধার নিমিত্ত দর্শন-শাস্ত্রে বিবৃত ব্রহ্মবিদ্যা পৃথকরূপে দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা নামে প্রকাশিত করা হইল। কিন্তু তাহা এই গ্রন্থেরই অংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে অধিকারিভেদ বর্ণন নামক দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ ।

ওঁ হরিঃ ।

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ ।

ব্রহ্মবিদ্যা ।

আমি কে, আমার স্বরূপ কি, কোথাহইতে আমি আসিলাম, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কি, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয় কিরূপ ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত, ঋষিগণ একান্তচিত্তে ধ্যাননিমগ্ন হইলে, অশরীরা বাণী তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়া, জ্ঞাতব্য বিষয়সকলের তত্ত্ব প্রকাশিত করেন। সেইসকল অশরীরা বাণীই "শ্রুতি" নামে প্রসিদ্ধ। তত্ত্বসকল শ্রুতিমুখে অবগত হইয়া উপদিষ্ট সাধন অবলম্বন-পূর্ব্বক ঋষিগণ তাহা সম্যক্ দর্শন করতঃ পরে উপযুক্ত শিষ্যগণকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; এবং পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র, স্মৃতি, 'ইতিহাস ইত্যাদি রচনা করিয়া, সেই সকল তত্ত্ব সাধারণ জনগণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হইতে হয়। শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতিতে ব্রহ্মবিদ্যা যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যাহাতে সহজে বোধগম্য হয়, এই অভিপ্রায়ে নিম্নে সংক্ষেপতঃ বিবৃত হইতেছে।

১। চরাচর জগতের একমাত্র চরমকারণ পরব্রহ্ম; ব্রহ্মহইতে জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রহ্মেই ইহার লয় হয়।

২। পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ একদিকে সর্ব্বপ্রকারভেদবিবর্জিত সর্ব্বাত্মক

পূর্ণ অদ্বৈত ও অবিকারী; অপরদিকে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা, সর্ব্বরূপী, সর্ব্বান্তর্য্যামী, এবং সর্ব্বনিয়ন্তা।

৩। যেমন একখণ্ড প্রস্তর খুদিয়া, তাহা হইতে কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, শিব, গোপাল প্রভৃতি মূর্ত্তি ইচ্ছানুরূপে প্রকাশ করা যায়, কিন্তু ঐ প্রস্তরখণ্ডকে উক্ত প্রকারে খুদিবার পূর্ব্বে, তৎসমস্ত মূর্ত্তিই ঐ প্রস্তর-খণ্ডের সহিত এক হইয়া তাহার অন্তর্নিহিতরূপে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে মূর্ত্তিসকল ঐ প্রস্তর হইতে অভিন্ন; তদ্রূপ জগৎও পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হয়; পরন্তু প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে সকল অবস্থায়ই তাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যেমন মূর্ত্তিসকলের পরস্পরহইতে পৃথক্‌রূপে স্ফুরণ থাকে না, তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নাম ও রূপদ্বারা তদবস্থায় স্বীয় উপাদান প্রস্তর হইতে পৃথক্ করা যায় না; পরন্তু পরে প্রকাশিত সমস্তরূপই প্রস্তরের অন্তর্নিহিত থাকে; তদ্রূপ জগৎও পৃথক্ পৃথক্ নাম ও রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, ব্রহ্মের সহিত একরস হইয়া বর্ত্তমান থাকে, পরে প্রকাশিত নাম ও রূপসকল ব্রহ্মেরই অন্তর্নিহিত হইয়া তাঁহা হইতে অভিন্নরূপে অবস্থিতি করে।

৪। পৃথিবীস্থ মৃত্তিকা যেমন বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পত্র, পুষ্প, ফল, জীবদেহস্থিত অস্থি, মাংস, মল প্রভৃতি অসংখ্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়; পুনরায় এইসকল বৃক্ষলতাদি পদার্থ পৃথিবীতে পতিত হইয়া কাল-ক্রমে ঐ মৃত্তিকারূপেই পরিণত হয় ও স্বীয় স্বীয় পার্থক্য-বিরহিত হয়, তদ্রূপ জগৎও পৃথক্ পৃথক্ নাম-রূপাদি-বিশিষ্ট হইয়া, ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হয়, এবং প্রলয়ান্তে স্বীয় স্বীয় বিশেষত্ব-বিরহিত হইয়া, ব্রহ্মস্বরূপে এক অদ্বৈতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রশ্ন ঃ—পরন্তু মৃত্তিকা জড়বস্তু; পত্র, পুষ্প, ফল, মাংস, মজ্জা প্রভৃতিও জড়বস্তু; সুতরাং মৃত্তিকার পত্রাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্তি সম্ভব; কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্যময়, জগৎ জড়স্বভাব. ব্রহ্ম কিরূপে জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন? পূর্ব্বকথিত দৃষ্টান্ত কিরূপে সুদৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? *

উত্তর—(ক) জড় ও চৈতন্যের মূলতঃ অত্যন্ত প্রভেদ নাই।

প্রথমতঃ—বাহ্যজগতের দৃষ্টান্ত অনেকস্থলে জড় ও চেতনের অত্যন্ত ভেদজ্ঞাপক নহে; যাহা অন্য গোময়, অথবা অন্যজীববিষ্ঠা বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহাই কিছুদিন পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবসমষ্টিরূপে পরিণত হইতে অনেকস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌বর্গও জীব; তাহাদিগকে পৃথিবী হইতে উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। এতদ্দ্বারা জড় ও চেতনের মধ্যে যে অন্ততঃ অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং শ্রুতি ও আপ্ত-ঋষিগণ যে জগৎকে ব্রহ্মোপাদান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত জড় ও চেতনের দৃষ্টতঃ ভেদকে অকাট্য প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ—জীব যে চৈতন্যস্বরূপ, ইহা স্বীকার্য্য; এবং ইহা জীবের স্বভাবসিদ্ধ আত্মানুভব-সম্মত। চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বাহ্যজগৎ জড় বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে জীবের কোন একটি বাহ্যবস্তুর জ্ঞান কিরূপে

* তর্ক বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক সিদ্ধান্তসকল স্থাপন করা এই প্রকরণের অভিপ্রেত নহে; বাস্তবিক কেবল তর্কদ্বারা অতীন্দ্রিয় পদার্থবিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না; ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক সিদ্ধান্তসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য ও আপ্ত-ঋষিবাক্যই নিশ্চিত প্রমাণ; এবং তদবলম্বনেই এই প্রকরণে ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হইতেছে। এই স্থলে কেবল শ্রুতির উপদেশ বিশদরূপে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত এই আপত্তির উল্লেখ করা হইল; এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বোধগম্য করিবার পক্ষে যাহাতে সাহায্য হয়, কেবল তদ্রূপেই এই আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইল।

হয়, তদ্বিষয়ে বিচার করিলে, দেখা যায় যে, কোন একটি বাহ্যবস্তু কোন ব্যক্তির দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, ঐ বস্তুর অবয়ব প্রথমে দ্রষ্টা পুরুষের নেত্রে গৃহীত হয়; তৎপরে ইন্দ্রিয়প্রণালীদ্বারা তাহা দ্রষ্টার বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়; * বহিঃস্থিত বস্তুর এই অবয়ব ধারণ করিয়া, বুদ্ধি তদাকারে পরিণত হইলে, দ্রষ্টা জীব (যিনি বুদ্ধির সাক্ষী, তিনি) তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। পরন্তু বাহ্যবস্তু এবং তাহার অবয়ব উভয়ই জড়বস্তু। কিন্তু এই জড়বস্তু যখন জীবাত্মার অনুভবের বিষয় হইতেছে, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবচৈতন্য এবং ঐ জড়বস্তু সর্ব্বাংশে সাদৃশ্যবিহীন নহে; যদি সর্ব্বাংশে সাদৃশ্যবিহীন হইত, তবে উভয়ের মধ্যে এই প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারিত না। প্রতিবিম্বটি প্রতিবিম্বিত বস্তুরই রূপ; যে বস্তু প্রতিবিম্ব ধারণ করে, সেই বস্তুর উক্ত পতিবিম্বিতবস্তুর আকার ধারণ করিবার নিমিত্ত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। পরন্তু উভয় বস্তুর ধর্ম্মের কোন পকার সাদৃশ্য না থাকিলে, একবস্তু অপর বস্তুর আকার ধারণ করিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যে জল বা দর্পণ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার কারণ জল ও দর্পণের এবং সূর্য্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাদৃশ্য আছে; সূর্য্যও আয়তনবিশিষ্ট ভৌতিক বস্তু, জল এবং দর্পণও আয়তনবিশিষ্ট ভৌতিক বস্তু; সুতরাং একের আকার অপরে ধারণ করিতে পারে। এইরূপ চক্ষু যে বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে পারে, তাহারও কারণ এই যে, কোন কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সুতরাং দৃশ্যবস্তু ও দ্রষ্টা জীবচৈতন্যের মধ্যে যদি সর্ব্ববিষয়ে অত্যন্ত প্রভেদ থাকিত, তবে দৃশ্য বাহ্যবস্তু দ্রষ্টা

---

* কিরূপে ইহা ঘটিয়া থাকে, তাহা বিশেষরূপে এই স্থলে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই স্থলে প্রাসঙ্গিক নহে। পরে এই বিষয়ে বিশেষ বর্ণনা করা হইবে।

পুরুষের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইতে পারিত না। অতএব এই বিচারে জানা যায় যে, জড় ও চেতন স্বরূপতঃ অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থ নহে।

তৃতীয়তঃ—কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্তে বিচার করিলে, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, বাহ্য পদার্থ বিষয়ে যে দ্রষ্টা জীবের অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতি জীবাত্মার স্বীয় স্বরূপের অঙ্গীভূত; অর্থাৎ তাহা জীবাত্মার নিজস্বরূপ হইতে বিভিন্ন নহে। অনুভবকে বাহ্যবস্তুর অঙ্গীভূত বলিলে, জড় ও চৈতন্যের কোন ভেদই থাকে না। অনুভব চেতনেরই ধর্ম্ম, অচেতনের নহে; সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে অনুভবটি জীবচৈতন্যেরই অঙ্গীভূত। পরন্তু অনুভবকালে দৃশ্যবস্তুটি ঐ অনুভবের অঙ্গীভূত হয়; যদি তাহা না হয়, তবে প্রত্যেক অনুভব, দৃশ্যবস্তু নিরবলম্ব হওয়ায়, এক অনুভব ও অপর অনুভবে কোন প্রভেদ হইতে পারে না; অর্থাৎ সর্ব্ববিধ বিশেষজ্ঞান অসম্ভব হইয়া পড়ে। পরন্তু বিশেষজ্ঞান যে জীবের আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব অনুভবকালে দৃশ্যবস্তুটিকে অনুভবের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আবার অনুভবটি জীবচৈতন্যের অঙ্গীভূত; সুতরাং অনুভবকালে দৃশ্য বাহ্যবস্তুটিও দ্রষ্টা জীবচৈতন্যের অঙ্গীভূত হয়।* অতএব বাহ্য দৃশ্যবস্তু এইরূপে দ্রষ্টা জীবের অঙ্গীভূত

---

* পরন্তু এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, কোন কোন বৌদ্ধ মতাবলম্বিগণ যে জগতের "বিজ্ঞানবাদ" প্রচার করিয়াছেন, তাহাই সত্য। এই বিজ্ঞানবাদ যোগসূত্র ব্যাখ্যানে স্থানে স্থানে বিশেষরূপে খণ্ডন করা হইয়াছে। অপরাপর দার্শনিকেরাও তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা "দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা" পাঠে বিদিত হইবে। এবং এতদ্দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে না যে চৈতন্য জড়েরই ধর্ম্ম; এই পাদের শেষভাগে এবং বিশেষতঃ সাঙ্খ্যদর্শনে বিচার দ্বারা এতৎসম্বন্ধীয় মত নিরাকৃত হইয়াছে। বাহ্য বস্তু, অনুভব কালে জীবাত্মার অঙ্গীভূত হওয়াতে, জীবাত্মার ঐ বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয় অনুভবকে "পৌরুষেয় প্রত্যয়" নামে পাতঞ্জলদর্শনে আখ্যাত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে প্রকাশিত সমস্ত জাগতিক রূপই পরব্রহ্মে নিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত, ইহা এই পাদের উপসংহারে দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

হইবার উপযোগী হওয়ায়, জড় ও চৈতন্যের অত্যন্ত প্রভেদ নাই এবং চেতন ব্রহ্ম হইতে জড়বর্গ প্রকাশিত হওয়া বিষয়ে যে শ্রুতিবাক্য আছে, তাহা অনুমানদ্বারাও কোন প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হয় না।

(খ) জাগতিক ব্যাপারসকল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, স্থূলবস্তু সর্ব্বত্রই তদপেক্ষা সূক্ষ্মবস্তু হইতে উৎপত্তিশীল। সমস্ত দৃশ্যমান জড়বস্তু তাড়িৎ-শক্তিনামক এক অদৃশ্য অতিসূক্ষ্ম-শক্তির পরিণাম বলিয়া এইক্ষণে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ও অবধারণ করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য-দেশেই অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীব স্বীয় সংকল্পশক্তির বৃদ্ধিদ্বারা তড়িৎ-উৎপাদন করিতে পারেন, এবং তদ্দ্বারা জগতে অপর লোকের উপর অদ্ভুত কার্য্য-সকল প্রবর্ত্তন করিতেও সমর্থ হয়েন। Mesmerism, hypnotism প্রভৃতি নামে এই বিদ্যা পাশ্চাত্য-প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছে। বশীকরণ বিদ্যা যাহা ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে প্রভূত-পরিমাণে আলোচিত হইয়াছিল, এই সকল পাশ্চাত্য-বিদ্যা তাহারই এক বিশেষ প্রকারভেদমাত্র। উক্ত উভয়বিধ পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত সংযোজিত করিয়া, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে, কোন বিশেষ ক্ষমতাশালী পুরুষ কেবল স্বীয় সংকল্পবলে, অপর কোন বাহ্যবস্তুর সাহায্যবিনা, কোন কোন বিশেষ বিশেষ বস্তুও সৃষ্টি করিতে পারেন। ইচ্ছাশক্তিই যদি তড়িৎ-উৎপাদনে সমর্থ হয়, এবং তড়িৎই যদি অপর ভূতবর্গের উপাদান হয়, তবে

দ্রষ্টা পুরুষ ব্রহ্মেরই অংশ হওয়ায়, তিনি তদঙ্গীভূতরূপে অবস্থিত বস্তুকেই দর্শন করেন; পরন্তু তিনি স্বরূপতঃ অসমাক্‌দর্শী হওয়ায় ঐ বস্তুকে এবং আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করেন। এই পাদের পরবর্ত্তী অংশে যাহা লিখা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, এই বিষয় ভালরূপে বোধগম্য হইবে। অতএব বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ কালে তাহা দ্রষ্টা পুরুষের অঙ্গীভূত হয় বলাতে "পুরুষকে" বিকারী বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, কেবল তদ্দ্বারাই বাহ্য পদার্থ সৃষ্টি করা অসম্ভব বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষীয় যোগীদিগের এইরূপ ক্ষমতা থাকা অদ্যাপি কাহারও কাহারও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। খৃষ্টীয় বাইবেল গ্রন্থেও উক্ত আছে যে, একখানি রুটী দ্বারা যীশুখ্রীষ্ট অনেক লোকের উদর তৃপ্ত করিয়াছিলেন। জগৎকারণ ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি যে নিজ ইচ্ছামাত্র উপকরণ দ্বারা অপর উপকরণবিনা সৃষ্টি রচনা করেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; অতএব তাহা অনুমান-বিরুদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

৫। এই জগৎ দ্বিবিধ শক্তির সম্মিলনে গঠিত; একটি "দৃশ্য"-স্থানীয়, "জড়" নামে আখ্যাত; অপরটি "দৃক্" অর্থাৎ দ্রষ্টৃস্থানীয়। এই শেষোক্তটি জীব-চৈতন্য অথবা কেবল চৈতন্য নামে আখ্যাত হয়; এবং প্রথমোক্তটি "গুণ" নামে আখ্যাত হয়। জগৎ বলিতে দ্রষ্টা ও দৃষ্ট এতদুভয় হইতে অতীত বস্তু কিছু বোধগম্য হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রহ্মেই লয়-প্রাপ্ত হয়; সুতরাং দ্রষ্টা জীব ও দৃশ্য জগৎ এই উভয়ই পৃথক্ হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মস্বরূপে অভিন্নরূপে অবস্থিতি করে। সুতরাং পরব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা বোধগম্য করিবার নিমিত্ত এইরূপ চিন্তা করিতে হয় যে, "দৃক্" ও "দৃশ্য"-শক্তি অভিন্নরূপে তাঁহার সহিত এক হইয়া অবস্থিত, কোন একটির পৃথক্‌রূপে স্ফুরণ নাই। এইরূপ হওয়াতে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা বলিয়া কোন প্রকার ভেদ পরব্রহ্মস্বরূপে নাই। এবঞ্চ ব্রহ্মহইতে ভিন্ন কোন বস্তু না থাকাতে, তিনি পূর্ণ অদ্বৈত; গুণ ও গুণী, শক্তিও শক্তিমান্ বলিয়া যে ভেদ, তাহাও ব্রহ্ম-স্বরূপে বর্ত্তমান নাই। কোন প্রকার বিশেষ কার্য্য দ্বারাই গুণ পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত ও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; যে অবস্থায় কোন বিশেষ কার্য্য নাই,

কোন বস্তুর বিশেষরূপে প্রকাশ নাই, সেই স্থলে গুণ বলিয়াও কোন পদার্থ নাই। দৃশ্যস্থানীয় জড়শক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে তদবস্থায় অভিন্ন; সুতরাং তাহা তদবস্থায় জড়রূপে (অর্থাৎ জীবের দৃশ্যরূপে) অবস্থিত নহে; পরন্তু ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত। সেই রূপ কি প্রকার, তাহার বর্ণনা হইতে পারে না; কারণ বাক্য এবং মনঃ উভয়ই জগদন্তর্গত সৃষ্ট বস্তু হওয়ায় তদ্দ্বারা জগদতীত পরব্রহ্ম বর্ণিত ও আয়ত্তীকৃত হইতে পারেন না। দৃশ্যরূপে যে তাঁহার প্রকাশ তাহাকেই জড় বলা যায়, তাহা পরে আরও বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। দৃশ্যবর্গ স্বীয় জড়ত্ববিবর্জ্জিত হইয়া চৈতন্যশক্তির (দৃক্‌শক্তির) সহিত অভিন্নভাবে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হওয়ায়, পরব্রহ্মস্বরূপ জড় হইতে পারে না; পরন্তু তাঁহার স্বরূপকে অদ্বৈতরূপে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা বলিয়া ভেদ ব্রহ্মস্বরূপে না থাকায় এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে প্রকাশিত সর্ব্ববস্তু ব্রহ্মস্বরূপভুক্ত হওয়ায়, পরব্রহ্মস্বরূপ জীব-চৈতন্যের ন্যায় "বিশিষ্ট চৈতন্য" নহে, তাহা সর্ব্বময় ও বিভুস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয় *।

কোন প্রকার গুণ অথবা শক্তির পৃথক্‌রূপে স্ফুরণ পরব্রহ্মস্বরূপে না থাকায়, পরব্রহ্মকে নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। পরন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মেই ইহার লয়ও হয়; সুতরাং পরব্রহ্ম যেমন নিগুণ, তদ্রূপ অপরদিকে দৃক্‌-দৃশ্যাত্মক জগৎকে প্রকাশিত করিবার এবং ইহার পালন ও লয় বিধান করিবার শক্তিও পরব্রহ্মে আছে বলিতে হইবে; যে

---

* এই পাদের উপসংহার অংশে পরব্রহ্মের এই নিত্য সর্ব্বজ্ঞতার বিষয়ে বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছে।

দৃকশক্তি (জীবশক্তি) ও দৃশ্যশক্তি (জড়বর্গ) দ্বারা জগৎ বিরচিত, উক্ত জগৎপ্রকাশিকাশক্তি অবশ্য তাহাহইতে ব্যাপক। কারণ তন্মূলেই দৃক্শক্তি ও দৃশ্যশক্তি পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হয়। অতএব এই শক্তি পরব্রহ্মেই অবস্থিত, জীবে নহে। উক্ত শক্তিকে ঐশীশক্তি বলে; পরব্রহ্ম এই ঐশীশক্তিসম্পন্ন হওয়ায় তিনি সশক্তিকও বটেন। অতএব পরব্রহ্ম-স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে, তাঁহাকে একদিকে সর্ব্ববিধ ভেদ-বর্জ্জিত পূর্ণ অদ্বৈত বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়; অপরদিকে তাঁহাকে ঐশীশক্তিসম্পন্ন জগৎকর্ত্তা জগন্নিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বান্তর্য্যামী বলিয়াও স্বীকার করিতে হয়। শক্তিও গুণ শব্দ একই অর্থে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়। অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ (সশক্তিক) এবং সগুণ, এই দুইটি শব্দ একই অর্থব্যঞ্জক; এই অর্থে পরব্রহ্ম সগুণও বটেন। জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা এবং সর্ব্বনিয়ন্তা হওয়াতে, পরব্রহ্ম "ঈশ্বর" নামে আখ্যাত হয়েন। বাস্তবিক শ্রুতি যে তাঁহার সম্বন্ধে ব্রহ্মশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও এই নিমিত্ত যে, তাঁহার "বৃহৎ" (অপরিসীম, অনন্ত) গুণ (শক্তি) আছে, (বৃহন্তো গুণা যস্মিন্নিতি ব্রহ্ম)। এই শক্তি নিত্য পরব্রহ্মের স্বরূপভুক্ত হওয়ায়, তিনি আপনাহইতে নানা রূপে নানা নামে বিচিত্র জগৎকে প্রকটিত করেন ও ইহার রক্ষণ ও ধ্বংসবিধান করেন। সুতরাং তিনি জগতের "নিমিত্ত" এবং "উপাদান" কারণ উভয়ই। জগৎ দৃক্ দৃশ্য এই উভয়াত্মক হইলেও, সাধারণতঃ দৃশ্যাত্মক জড়বর্গকেই "জগৎ" নামে আখ্যাত করা হয়। এই জড়বর্গের অনন্ত রূপ আছে; যেমন এই অনন্ত দৃশ্যজগৎকে ঐশীশক্তিপ্রভাবে পরব্রহ্ম আপনা হইতে প্রকটিত করিয়াছেন, তদ্রূপ ইহাকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দর্শন ও ভোগ করিবার জন্য স্বীয় অংশীভূত দৃক্শক্তিরও প্রকটন-কর্ত্তা তিনিই। এই দৃক্শক্তিরই নাম জীব। সুতরাং ঈশ্বরাবস্থা, জীবাবস্থা ও জগদবস্থা এই তিনটিই

ব্রহ্মের রূপ, * এবং ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ ভেদবর্জ্জিত অবিকারী নিষ্ক্রিয় এবং পূর্ণস্বভাবও বটেন।

৬। এক্ষণে জীবের স্বরূপ বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে।

(ক) ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্; তিনি বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন, এবং বহুরূপে আপনাকে দর্শনও করেন। যে শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম বহুরূপে আপনাকে দর্শন করেন, বহুরূপে দর্শন করাই যে শক্তির কার্য্য, তাহাকে জীবশক্তি বলে। পরন্তু এই বহুরূপে দর্শনের দ্বিবিধ ভেদ আছে; প্রকাশিত জগৎ বহু হইলেও ব্রহ্মহইতে অভিন্নরূপে ইহার দর্শন একপ্রকার দর্শন এবং ব্রহ্মহইতে ভিন্নরূপে (অর্থাৎ ব্রহ্ম যে ইহার উপাদান ও প্রতিষ্ঠা, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, পৃথক্ অস্তিত্বশীল-রূপে ইহার দর্শন অন্য প্রকার দর্শন।

ইহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করা যাইতেছে:—স্থিরচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বৃক্ষসকল পৃথিবীর অংশ গ্রহণ করিয়াই পুষ্ট হয়; অতএব বৃক্ষের স্কন্ধ শাখা পত্র ফল প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গই পৃথিবীর বিকার †। বৃক্ষ পত্র ফল প্রভৃতি পৃথিবী-বিকার আহার করিয়া জীবদেহ বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং জীবদেহও পৃথিবী-বিকার; ইহা সত্য হইলেও, বৃক্ষ ও জীবের অবয়বসকল যে পৃথিবী হইতে অভিন্ন, ইহা সহজে

---

* একাধারে সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব বুদ্ধিতে ধারণা করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে; পরন্তু আপ্ত-ঋষিগণ, যাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা, এবং শ্রুতি স্বয়ং ব্রহ্মের স্বরূপ এইরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী পাদে এবং বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যানে ইহা প্রদর্শিত হইবে যে, যুক্তিতঃও এই সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপিত হয় না, এবং অপর কোন সিদ্ধান্তই ইহা অপেক্ষা অধিক সঙ্গত নহে এবং ইহা ও প্রদর্শিত হইবে যে, প্রত্যেক জীবের স্বীয় স্বরূপ-বিষয়ক আত্মানুভূতি এবং জাগতিক বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান ও এই সিদ্ধান্তেরই অনুকূল।

† সমস্ত জাগতিক বস্তুই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতাত্মক। পৃথিবীর অংশ দেহাদিতে অধিক বলিয়া এইস্থলে পৃথিবীকেই উপাদান বলা হইল।

সকলের বোধগম্য হয় না; অতএব নানাস্থানের নানাপ্রকার মৃত্তিকা প্রভৃতিতে পৃথিবীত্ব বোধ থাকিলেও, জীবদেহ এবং উদ্ভিদাদিতে পৃথিবীত্ব-বোধ সচরাচর আমাদের থাকে না। আলোচনাদ্বারা এতৎসমস্তের পৃথিবীত্ব-বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলেও ভেদ-সংস্কার সহজে দূর হয় না। সাধনবলে অভিমানবৃত্তির বহুল-পরিমাণে হ্রাস হইলে, এই সংস্কার দূর হয়। তদ্রূপ জগৎ ব্রহ্মাত্মক হইলেও, তাঁহার সহিত ইহার ভেদ-বিষয়ক বুদ্ধি সচরাচরই জীবের আছে। বিচারবলে কেহ কেহ জানিতে পারেন যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; কিন্তু জীবের ভেদ-সংস্কার এমন দৃঢ় যে, তাহা সহজে দূর হয় না। বহুসাধনবলে সংস্কারসকল দূর হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে, তবে আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন হয়। অতএব জীবের দর্শন দুইপ্রকার; সাধারণজীবের জ্ঞানে জীব স্বয়ং ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন; ইহাদিগকে বদ্ধজীব বলে। আর যাঁহারা প্রকৃত-জ্ঞান লাভ করিয়া, সর্ব্ববিধ ভেদসংস্কার-বর্জ্জিত হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাকে এবং বহুরূপী জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর জীবকে মুক্তপুরুষ বলে। কিন্তু উভয়বিধ জীবই ব্রহ্মের শক্তি-মাত্র, তাঁহার অংশবিশেষ। ব্রহ্ম সর্ব্ববিধজীব ও দৃশ্য-জগৎকে স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া রহিয়াছেন। অতএব জীব পরিচ্ছিন্ন, ঈশ্বর অপরিচ্ছিন্ন; জীব ঈশ্বরের অংশ মাত্র. ঈশ্বর অংশী। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে অনেক ভেদ আছে। পরন্তু জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহেন; কারণ তিনি তাঁহারই অংশ। অতএব জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধকে "ভেদাভেদ" সম্বন্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। বদ্ধজীবের জ্ঞানে ভেদাভেদ-সম্বন্ধের কেবল ভেদাংশই পরিগ্রহ হয়। সদ্‌গুরুর অনুগত হইয়া, যখন জীব ব্রহ্মের সহিত জগতের এবং তাঁহার নিজের অভেদসম্বন্ধ অবগত হইয়া, গুরূপদিষ্ট সাধন অবলম্বন করেন, তখন তদ্দ্বারা তাঁহার সর্ব্ববিধ ভেদ-

সংস্কার দূরীভূত হয়, এবং তিনি ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব প্রাপ্ত হয়েন. এবং সর্ব্ববিধ ক্লেশের মূল যে অজ্ঞান, তাহা আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। এই ভেদ-জ্ঞান-প্রবর্ত্তক অজ্ঞানকেই "অবিদ্যা" নামে আখ্যাত করা যায়। অবিদ্যা-প্রভাবে জীব স্বীয় ঈশ্বরাংশত্ব বিস্মৃত হইয়া, ঈশ্বর-কর্ত্তৃক-প্রকটিত দেহাদির সহিত সংযুক্ত হয়েন এবং তাহাতে আত্ম-বুদ্ধিকরতঃ আবদ্ধ হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাকেই "সংসৃতি" অথবা "সংসার" বলে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মদর্শন হইলে জীব স্বস্থ হয়েন, এবং এই সংসার-গতি হইতে মুক্তিলাভ করেন। অতএব ব্রহ্ম-স্বরূপ সাক্ষাৎকারকে "মোক্ষ" বলা যায়, এবং জীবের সংসারাবস্থাকেই "ভোগ" এবং "বন্ধ" নামে আখ্যাত করা হয়। পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার একবার লাভ হইলে, আর তাহা কখন অপগত হয় না; কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী; তিনি সকলেরই আশ্রয়; তিনি গুণী; জগৎ গুণ; সুতরাং সাধক সেই গুণীর স্বরূপ একবার দর্শন করিলে, তাঁহার সেই দর্শনের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে এমন কোন পদার্থ না থাকায়, তাহা সর্ব্বদা অপ্রতিহত থাকে, এবং জাগতিক সমস্তবস্তুর প্রতি তিনি ব্রহ্মবুদ্ধি-যুক্ত হয়েন।

(খ) জীবশক্তি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারে পুনরায় বর্ণিত হইতেছে। অদ্বৈত সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম নিজ ঐশীশক্তিবলে অনন্তরূপে প্রকাশিত হয়েন; এই সকল অনন্ত রূপকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার প্রত্যেক অংশে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন, এইরূপ অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি যেন অনন্ত সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হয়েন, এই সূক্ষ্ম অনন্ত অনুপ্রবিষ্ট শক্তিসকল যাহাকে দৃক্শক্তি বলে, তাহাই "জীব" নামে আখ্যাত। অতএব জীব সূক্ষ্ম অণুস্বরূপ, ব্রহ্মের অংশ; কিন্তু ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বজ্ঞস্বভাব, জড় নহেন, জীবও চেতনস্বভাব, জড়স্বভাব নহেন;

জীব-শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম আপনাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপেই দর্শন (জ্ঞান) করিয়া থাকেন। যে সকল বিচিত্র রূপে ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন, সেই সকল বিচিত্ররূপ উক্ত জীব শক্তির "দৃশ্য" রূপে মাত্র অবস্থিত হয়; অতএব ইহারা জ্ঞানাত্মক নহে, ইহারা জীবের জ্ঞানের বিষয়রূপে মাত্র অবস্থিত; সুতরাং "অচেতন" "জড়" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই জড় দৃশ্যের প্রত্যেক অংশে তাহার দ্রষ্টা হইয়া জীবশক্তিও অনুপ্রবিষ্ট আছে; অতএব জগতের প্রত্যেক অংশই দৃশ্যরূপে জড়; আবার তন্মধ্যে জীবশক্তি অনুপ্রবিষ্ট থাকাতে, তাহা জীবও বটে। জড় দৃশ্যাংশকে জীবের বাহ্য দেহ বলা যায়। তাহার সহিত সংযোগহেতু জীবের তাহাতে আত্মবুদ্ধি জন্মে।

(গ) দৃশ্য জড়-জগতের সূক্ষ্মতম অব্যক্ত অবস্থাকে "প্রকৃতি" বলে। এই প্রকৃতিই দৃশ্য জড় জগতের বীজরূপা ব্রহ্মশক্তি, প্রকৃতিতে পূর্ব্বোক্ত জীবশক্তি অনুপ্রবিষ্ট; অব্যক্তা প্রকৃতি অনন্ত আকৃতি ধারণ করিয়া, জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। জীবশক্তি স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম অণুস্বভাব হইলেও, ইহা প্রকৃতি হইতে বিকসিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত জাগতিক পদার্থের রূপ নিজ জ্ঞানের বিষয় করিতে সমর্থ; অতএব জীবকে স্বরূপতঃ অণুস্বভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গুণসম্বন্ধে তিনি বিভু হইবার যোগ্য বলিয়া শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

৭। পরন্তু জীব এবং দৃশ্য জড়বর্গরূপে প্রকাশিত হইয়াও, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক অদ্বৈতরূপেই অবস্থিতি করেন। সূর্য্যদেব এক হইয়াও যেমন ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে, ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে, প্রতিবিম্বদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, বিভিন্ন আকারে বিভিন্নরূপ কার্য্যোৎপাদন করেন এবং বিভিন্ন বলিয়া বোধগম্য হয়েন; তদ্রূপ ব্রহ্মও দৃশ্য জড়বর্গের প্রত্যেক অংশে জীবরূপে যেন প্রতিবিম্বিত হইয়া তদ্দ্বারা বিভিন্ন প্রকার কার্য্য সম্পাদন করেন; সুতরাং ব্রহ্মই জীবশক্তির কৃত সর্ব্ববিধ কর্ম্মের নিয়ন্তা ও বিধাতা। তিনি

জগৎ ও জীবরূপী হইয়াও এতদুভয়ের অতীত, এবং এতদুভয়ের নিয়ন্তা ও আশ্রয় হইয়াও নিষ্ক্রিয় এবং একাগ্রাদ্বৈত। *

৮। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির অসংখ্য রূপ-ভেদ আছে; তৎসমস্ত রূপেই জীব শক্তি সংযুক্ত হওয়ায় জীবও অনন্ত। জীব জড়রূপা প্রকৃতিতে অবস্থিতি করাতে, তাঁহাকে "পুরুষ" নামে আখ্যাত করা যায়; (পুরি শেতে ইতি পুরুষঃ)। এই সকল রূপ তন্নিষ্ঠ পুরুষের বহিরঙ্গ অথবা দেহ অথবা লিঙ্গ নামে আখ্যাত। পুরুষ তৎসহ নিত্য অবস্থিতি করাতে তিনি তাহাতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত হয়েন, এবং সুখ ও দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত পুরুষকে "ভোক্তা" এবং দৃশ্য প্রকৃতিবর্গকে তাহার "ভোগ্য" বলিয়া বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতির অবস্থাভেদে জীবদেহ ত্রিবিধ—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ; ইহাদের প্রভেদ বিশেষরূপে পরে ব্যাখ্যাত হইবে। ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা হইল। এইক্ষণে মুক্ত-পুরুষদিগের বিষয় আরও কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে বলা যাইতেছে।

৯। পরব্রহ্ম যেমন নির্গুণ ও সগুণ এই দুই অবস্থায়ই নিয়ত অবস্থিত আছেন, মুক্তপুরুষও তদ্রূপ উভয়বিধ অবস্থায় অবস্থিতি করেন; যেমন নির্গুণ হইয়াও পরব্রহ্ম গুণসকলকে প্রকাশ করিয়া এবং তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া বিশ্বরচনা করেন, মুক্তপুরুষও পরব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়া, যে বিশেষ দেহ-সংযোগে সাধন অবলম্বন করিয়া, জীবিতকালেই মুক্তিলাভ করেন, সেই দেহদ্বারা কর্ম্মসকল সম্পাদন করিতে থাকেন;

* ব্রহ্মের এই দ্বিরূপত্ব বিচারবুদ্ধির গম্য হওয়া সুকঠিন। ইহা এই পাদের উপসংহারাংশে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে; পরন্তু এই অধ্যায়ের পরবর্ত্তী পাদে এবং বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১৪শ প্রভৃতি সূত্র ও তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় পাদের ১১শ প্রভৃতি সূত্র ব্যাখ্যানে এবং প্রসঙ্গতঃ অপরাপর স্থানে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

কারণ, শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত প্রারব্ধকর্ম্ম,—যাহা ইহজন্ম উৎপাদন করিয়া, ফলোন্মুখী হইয়াছে, তাহা জ্ঞানোদয়েও বিনষ্ট হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম যেমন সমগ্র বিশ্ব-রচনারূপ কর্ম্ম করিয়াও নিয়ত তৎসমস্ত হইতে অতীত ও নির্লিপ্তভাবে বিরাজমান থাকেন, তদ্রূপ মুক্তপুরুষসকল স্থূলদেহমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, দেহদ্বারা কর্ম্মসকল সম্পাদন করেন, এবং দেহযুক্ত হইয়াও তৎসমস্ত হইতে অতীত ও নির্লিপ্তভাবে অবস্থিতি করেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যেমন স্থূল ভূতসকল বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া অব্যক্ত-প্রকৃতিরূপে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগাবসানে মুক্তপুরুষেরও স্থূলদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাঁহারা পরব্রহ্মহইতে অভিন্নরূপে অবস্থিতি করেন; তৎকালে তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহের উপকরণসকল ব্রহ্মরূপতা লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে তৎসমস্তের ভিন্নরূপে বিকাশ আর থাকে না, গুণ ও গুণিরূপে ভেদ বিদূরিত হয়; সুতরাং তাঁহারা নির্গুণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত সম্যক্ যুক্ত হওয়াতে, ঈশ্বরের ন্যায় তাঁহারা একদিকে যেমন নির্গুণ, অপরদিকে তেমন সগুণও হয়েন; সুতরাং তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন দেহ অবলম্বন করিতে পারেন, যে কোন দেহকে চিরস্থায়ী করিতে পারেন, এবং তাঁহাদের গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হয়; তাঁহাদের নিজের বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও (ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূত) অপর সাধক এবং ভক্তগণের আত্যন্তিক ইচ্ছাতে তাঁহাদের কখন কখন এইরূপ কর্ম্মে ইচ্ছার উদয় হয়। কিন্তু তাঁহারা যে কোন দেহ অবলম্বন করেন, তাহা সগুণ ব্রহ্মের অঙ্গীভূত হওয়ায়, মুক্ত হইলেও তাঁহারা ঈশ্বরের অংশরূপেই অবস্থিতি করেন। ঈশ্বর হইতে তাঁহারা স্বতন্ত্র নহেন; ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়াতেই তাঁহাদের আপেক্ষিক সর্ব্বশক্তিমত্তা জন্মে; সুতরাং দুই সম্পূর্ণ স্বাধীন পুরুষ কর্ম্ম-কর্ত্তা হইলে, তাঁহাদের কার্য্যের যেরূপ বিরোধ সম্ভাবনা হয়, বহু পুরুষ

মুক্ত হইলেও জাগতিক সৃষ্টিকার্য্যের তদ্রূপ কোন বিরোধের আশঙ্কা থাকে না; কারণ, সকলই এক ঈশ্বরের অঙ্গীভূত হয়েন। শাস্ত্রে ব্রহ্মের যেরূপ দ্বিরূপতা উক্ত হইয়াছে, মুক্ত পুরুষদিগেরও এইরূপ দ্বিরূপতা উক্ত হইয়াছে।

১০। পুরুষকে মুক্ত ও বদ্ধ এই দ্বিবিধ রূপে বর্ণনা করা হইল। পরন্তু "পুরুষ" শব্দ পরব্রহ্মসম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "পূর্ণমনেন সর্ব্বম্" এই অর্থে পুরুষশব্দ পরব্রহ্মবোধকও হয়। কিন্তু পরব্রহ্মসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে, অনেকস্থলে উত্তম-পুরুষ-শব্দেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যাহা হউক বিশেষ বিশেষ স্থলে বিবক্ষা-অনুসারে পুরুষশব্দের অর্থ অবধারণ করিতে হয়।

১১। এই বিশ্ব গুণাত্মক বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা বোধগম্য করিবার নিমিত্ত একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। আমি একটি গোলাপফুল দৃষ্টি করিতেছি; বিচার করিলে দেখা যায় যে, এতদ্দ্বারা শুক্ল লোহিত প্রভৃতি কোন একটি বিশেষ বর্ণের, একটি বিশেষ আকৃতির, একটি বিশেষ গন্ধের, একটি বিশেষ স্পর্শের, জ্ঞানমাত্র আমার হইতেছে; একটি বিশেষ রূপ, একটি বিশেষ গন্ধ, একটি বিশেষ স্পর্শ মাত্র এই স্থলে আমার অনুভবের বিষয়। যে ব্যক্তি আজন্ম অন্ধ, তাহার রূপ জ্ঞান হয় না; সে গন্ধ এবং স্পর্শমাত্র অনুভব করে; যদি জন্মাবধি কেহ আঘ্রাণ-শক্তি গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তবে রূপ ও স্পর্শমাত্র দ্বারা সে গোলাপকে জানিতে পারে। যদি কেহ জন্মাবধি রূপ, গন্ধ এবং স্পর্শ এই তিনটিই গ্রহণ করিতে শক্তি-বিরহিত হয়, তবে হয়ত আস্বাদমাত্রের প্রভেদদ্বারা "গোলাপ" বলিয়া একটি বিশেষ পদার্থ সে অবধারণ করিতে পারে; তাহার সম্বন্ধে গোলাপ শব্দে একটি বিশেষ স্বাদযুক্ত বস্তুমাত্র বুঝায়। কিন্তু এই গন্ধ, স্পর্শ, রূপ ও রস সকলই গুণমাত্র; গোলাপ গন্ধ-বিরহিত

হইয়াও থাকিতে পারে; শুষ্ক হইলে তাহার পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, স্পর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, গন্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, রসও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; সুতরাং এই রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি সকলই গুণমাত্র; কিন্তু "গোলাপ" শব্দে আমার এই বিশেষ বিশেষ গুণ-সমষ্টিরই বোধ হইয়া থাকে; গোলাপ নাম দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার এই গুণসমষ্টিই জ্ঞানগম্য হয়। এই সকল গুণের আশ্রয় যে এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু আছে, ইহাও আমার ধারণা আছে সত্য; কিন্তু তাহার স্বরূপসম্বন্ধে আমার কোন বিশেষজ্ঞান নাই। এইরূপে পদার্থজ্ঞান সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ গুণের বিমিশ্রণ ও তারতম্য দ্বারাই আমাদের পদার্থ-বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান গঠিত হইয়াছে। বাহ্যবস্তুসকল বোধ করিবার নিমিত্ত আমাদের শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা নামক পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে; তদ্ভিন্ন বাহ্যবস্তু বোধ করিবার আর কোন শক্তি নাই; সুতরাং পদার্থসকল এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে; কোন বাহ্যবস্তু-সম্বন্ধে আমাদিগের তদতিরিক্ত জ্ঞান নাই। ইন্দ্রিয়গম্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের আশ্রয়ীভূত বস্তু স্বরূপতঃ কি প্রকার, তাহা আমাদের বুদ্ধির গম্য নহে; সুতরাং পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই আমাদের সম্বন্ধে গুণাত্মক মাত্র। বিশেষ বিশেষ নাম দ্বারা বিশেষ বিশেষ গুণসমষ্টিই আমাদের নিকট বস্তুরূপে পরিচিত হয়। পরন্তু এই সকল গুণের আশ্রয়ীভূত বস্তু পরব্রহ্ম,—ইহা শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রুতিমুখে তাহা অবগত হইয়া, শ্রুতিপ্রণোদিত সাধন অবলম্বন করিলে, সেই আশ্রয়বস্তু-ব্রহ্মের জ্ঞান হয়। (আশ্রয়শব্দ যখন এইরূপ স্থলে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা গুণ ও গুণীর, আধার ও আধেয়ের সম্বন্ধমাত্র-বোধক বলিয়া জানিতে হইবে)।

১২। গুণ ত্রিবিধ; তাহাদের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। কিন্তু ইহারা

ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিমিশ্রিত হইয়া, অনন্ত জগৎরূপে প্রকটিত হইয়াছে; সুতরাং সমস্ত জগৎই ত্রিগুণাত্মক এবং জগতের পরমসূক্ষ্মাবস্থা যে প্রকৃতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাও সুতরাং এই ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্বগুণ জ্ঞানাত্মক, লঘু; রজোগুণ চলনাত্মক, ক্রিয়াশীল; তমোগুণ পূর্ব্বোক্ত দুই গুণের অবরোধক, মোহাত্মক ও গুরু; তাহা আলস্য, স্থিতিশীলতা ও জড়তা স্বরূপ। এই ত্রিবিধ গুণই সর্ব্বদা মিলিতাবস্থায় থাকে; যখন যেটি প্রধান হয়, তখন অপর দুইটি তাহার অনুগামী হয়।

১৩। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই গুণত্রয় নিষ্ক্রিয় ও সাম্যাবস্থায় ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া তাঁহাতে লীনভাবে থাকে। যেমন কোন উদ্দীপক বিষয় উপস্থিত হইলেই জীবে কামশক্তি, ক্রোধশক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পায়, অপর সময়ে ইহারা জীবের সহিত লীন হইয়া, তাহার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাদিগের কিছুমাত্র পৃথক্ স্ফুরণ থাকে না, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মে এই গুণত্রয় লীন হইয়া থাকে, পৃথকরূপে ইহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও স্ফুরণ থাকে না; তখন বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য কিছু প্রকাশিত না থাকায়, তৎকালে জীবশক্তিরও ব্রহ্মহইতে পৃথকরূপে স্ফুরণ থাকে না; জীবশক্তিও ব্রহ্মে শয়ান হইয়া তাঁহার সহিত একীভূতভাবে বর্ত্তমান থাকে। পুনরায় সৃষ্টিকার্য্য প্রাদুর্ভূত হইলে, প্রাকৃতিক গুণসকলের যখন বিশেষ বিশেষ অবস্থা-পরিণাম প্রকাশিত হয়, তখন জীবশক্তিও তৎসহ যুক্ত থাকিয়া নানা বিচিত্র দেহধারী জীবরূপে প্রকাশিত হয়।

১৪। অনন্ত শক্তিধারী ব্রহ্মহইতে যে জগৎকার্য্য রচিত হয়, ঋষিগণ তাহা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "তৎ" শব্দে প্রাকৃতিক-গুণাতীত পরব্রহ্ম বুঝায়; "তত্ত্ব" শব্দে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত জীবশক্তি ও গুণাত্মক চরাচর বিশ্ব বুঝা যায়। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্রহ্ম
পরমাত্মা, পরব্রহ্ম
১। নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত
২। ঈশ্বর, উত্তমপুরুষ
মহামায়া অথবা মায়াশক্তি
পুরুষ (দৃক্‌শক্তি)
অথবা
জীবশক্তি,
অথবা
জীবব্রহ্ম
প্রকৃতি (দৃশ্যশক্তি)
(প্রধান)
ইহা সত্ত্ব, রজস্তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক; এই গুণত্রয় নিষ্ক্রিয় সাম্যাবস্থায় অব্যক্ত থাকিলে, তাহাদিগকে প্রকৃতি বলে।
মহত্তত্ত্ব (অথবা বুদ্ধিতত্ত্ব) —ইহা সত্ত্ব গুণাত্মক, ইহাকে নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি বলে, এবং ইহা "মন" নামেও অভিহিত হয়। পুরুষ এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া "মহৎ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু এই তত্ত্বে অধিষ্ঠানকালে বুদ্ধিতে তাঁহার আত্মবুদ্ধি থাকে না, তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া তিনি বোধ করেন মাত্র। কিন্তু সর্ব্বদা বুদ্ধির সহিত যুক্ত থাকাতে, বুদ্ধি সতত তাঁহার দৃষ্টির বিষয়রূপে অবস্থিত থাকে, তিনি স্বীয় স্বরূপ অবগত হইতে পারেন না। বুদ্ধি তাঁহার বাহ্যদেহরূপে বর্ত্তমান থাকে।
(এই মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ, কার্য্যব্রহ্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।
অহংতত্ত্ব ... ... বুদ্ধিতত্ত্বে পুরুষ সংযুক্ত হইয়া তাঁহাকে আত্ম(স্ব) বলিয়া যখন বোধ করেন, তখনই এই অহংতত্ত্বের উদয় হয়। "আত্ম" এইরূপ বোধ অর্থাৎ অভিমান এই তত্ত্বের স্বরূপ।
প্রধানতঃ সত্ত্বাংশে
প্রধানতঃ তামসাংশে
করণ বলা যায়।

ব্রহ্ম

অহং ও বুদ্ধি এই ত্রয়োদশটিকে ত্রয়োদশ

মনঃ হইতে উপস্থ পর্য্যন্ত একাদশটি তত্ত্বকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলা যায়।

এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং

প্রধানতঃ রাজসাংশে

-মনঃ
এই মনঃ ও ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য।
(তমঃ ইহাতে অপ্রকাশ থাকে এবং ইহাতে রজোগুণের অতি অল্প-মাত্র স্ফুরণ থাকে)

কিঞ্চিৎ সত্ত্বাধিকাযুক্ত

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় যথা :—
১। শ্রোত্র।
২। ত্বক্।
৩। চক্ষুঃ।
৪। জিহ্বা।
৫। নাসিকা।

রাজসাংশাধিক্য

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—
(তমঃ ইহাতে কিঞ্চিৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হয়)
১। বাক্।
২। পাণি।
৩। পাদ।
৪। পায়ু।
৫। উপস্থ।

পঞ্চতন্মাত্র যথা :—
(ইহাতে সত্ত্ব প্রায় অপ্রকাশ ; রজঃ ও ক্ষীণ থাকে)
১। শব্দ
২। স্পর্শ
৩। রূপ
৪। রস
৫। গন্ধ

এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত প্রকাশ পায় যথা

৫। ব্যোম
৪। মরুৎ
৩। তেজঃ
২। অপ্
১। ক্ষিতি

এই সকলে সত্ত্ব অপ্রকাশ এবং রজোগুণও ক্রমশঃ অতিশয় ক্ষীণ হইয়া ক্ষিতিতত্ত্বে প্রায় অপ্রকাশ হয়।

ব্রহ্ম

১। পুরুষ, ২। প্রকৃতি, ৩। মহৎ, ৪। অহংতত্ত্ব, ৫। মনঃ, ৬।৭।৮।৯।১০। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ১১।১২।১৩।১৪।১৫। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ১৬।১৭।১৮।১৯।২০। পঞ্চ তন্মাত্র, ২১।২২।২৩।২৪।২৫। পঞ্চ মহাভূত, এই পঞ্চবিংশতিগণ পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের তুলনায় আশ্রয়রূপী পরব্রহ্মকে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস "ষড়বিংশ" অথবা "নিস্তত্ত্ব" বলিয়া মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বিশেষ-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

১৫। এক্ষণে পুরুষ-সমন্বিতা ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে মহদাদি ক্ষিতিপর্য্যন্ত তত্ত্বসকল যেরূপে বিকসিত হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে :—

(ক) যেমন সুষুপ্তিদশা-প্রাপ্ত ব্যক্তি কালক্রমে আপনাহইতেই জাগরিত হয়, এবং তাহার সুষুপ্তি অবস্থায় নিক্রিয়ভাবে-অবস্থিত ইন্দ্রিয়-সকল জাগরণকালে প্রকাশিত হইয়া, কার্য্যোন্মুখ হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি-অবস্থায় গুণসকল অব্যক্ত ও নিক্রিয়ভাব অবলম্বন করে; কালক্রমে চলনাত্মক রজোগুণ উদ্বুদ্ধ হইয়া, সত্ত্ব এবং তমোগুণ-সহকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। দৃক্‌শক্তি (পুরুষ) তৎকালে সর্ব্ববিধ দৃশ্যের অভাবহেতু পরব্রহ্মে শয়ান হইয়া থাকেন; কিন্তু তদবস্থায় তাঁহার পরব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান হয় না; সুষুপ্ত পুরুষের যেমন আত্মজ্ঞান হয় না, কেবল সূক্ষ্ম আনন্দময় অবস্থায় তিনি লীন হইয়া বিশ্রাম করেন, প্রকৃতিলীন পুরুষেরও তদ্রূপ স্বীয় আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না; তিনি তৎকালে স্বীয় দৃক্‌শক্তি মাত্ররূপে অবস্থান করেন। পরে ঈশ্বর-প্রেরণায় সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইলে, রজোগুণপ্রভাবে সত্ত্ব ও তমঃ পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে প্রকাশিত হয়। ঐ তমোগুণদ্বারা তখন ঐ পুরুষের (দৃক্‌শক্তির) স্বরূপ আবৃত হইয়া যায়, এবং কেবল সত্ত্বাত্মক জ্ঞানবৃত্তির সহিত পুরুষ প্রকাশিত হয়েন; ঐ

জ্ঞানবৃত্তিমাত্র তখন তাঁহার দর্শনের বিষয় হয়, এবং জ্ঞান হইতে তিনি পৃথক্, এই মাত্র তাঁহার বোধ থাকে। তৎকালে তমোগুণেরও কিঞ্চিৎ স্ফুরণহেতু প্রকৃতিলীনাবস্থায় পুরুষের যে নির্ম্মল উপাধিশূন্য চিদানন্দময় অবস্থায় অবস্থিতি ছিল, সেই চিদানন্দরূপতা ঐ তমোগুণদ্বারা আবৃত হইয়া যায়। গাঢ় তামসিক নিদ্রাকালে এবং মূর্চ্ছাকালে যেরূপ মনুষ্যের স্বরূপজ্ঞান তমোগুণের দ্বারা আবৃত হয়, ইহাও তদ্রূপ। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানবৃত্তি, যাহার সমষ্টিকে বুদ্ধিতত্ত্ব বলে, তাহা তৎকালে পুরুষের বহিরঙ্গ-রূপে কল্পিত হয়। এই অবস্থা উৎপাদন করাই সৃষ্টির প্রথম কার্য্য; ইহাকেই "মহত্তত্ত্ব" বলা হইয়াছে। ইহাকেই প্রজ্ঞাভূমিও বলে। এই ভূমিতে আরূঢ় পুরুষের এইরূপ জ্ঞান হয় যে, তিনি স্বরূপতঃ বুদ্ধি হইতে অতীত। এই বুদ্ধিতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ সৃষ্টির প্রথম পুরুষ।

(খ) মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষের রজোগুণ পুনরায় ঈশ্বর-প্রেরণায় ক্রিয়মাণ হইয়া উক্ত মহত্তত্ত্বকে পরিচালিত করে। তামসাংশ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষের প্রজ্ঞাকে আবৃত করে; সুতরাং পুরুষ মহত্তত্ত্বে অবস্থানকালে যে আপনাকে বুদ্ধিহইতে পৃথক্ জানিয়াছিলেন, তাঁহার সেই জ্ঞানও তখন লোপ প্রাপ্ত হয়; তিনি আপনাকে বুদ্ধি হইতে অতীত বলিয়া ধারণা করিতে অসমর্থ হয়েন; বুদ্ধি তাঁহার সহিত একতা প্রাপ্ত হয় এবং তিনি বুদ্ধিতে অহংভাবাপন্ন হয়েন। এই অহং-বুদ্ধিযুক্ত পুরুষকেই অহং-তত্ত্ব বলে। বুদ্ধিতে পুরুষের যে "অহং" রূপ মোহ জন্মে, তাহা তমোগুণ দ্বারাই সম্ভূত হয়। দীর্ঘকাল কোন গৃহ, কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত একত্র থাকিলে, বুদ্ধি মোহ প্রাপ্ত হইয়া, ঐ গৃহ অথবা বস্তুর সহিত যে আত্মভাবাপন্ন হয়, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত। এইসকল বস্তু অনাত্ম, এইরূপ বুদ্ধি প্রথমে মহত্তত্ত্বে বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু দীর্ঘকাল একত্র থাকিতে থাকিতে, বুদ্ধি আলস্যযুক্ত হয় (তমোগুণের দ্বারা আক্রান্ত হয়),

আর পার্থক্য-ধারণা করিতে সমর্থ হয়না; সুতরাং এইসকল বাহ্য বিষয়ের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। * মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষও এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া বাস করিতে করিতে, তাঁহার তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহার বিচারশক্তিকে শিথিল করিয়া দেয় এবং বুদ্ধি-হইতে তাঁহার পার্থক্য-জ্ঞানকে অবরোধ করে; সুতরাং সেই পুরুষ স্খলিত হইয়া, বুদ্ধিতে অভিমানাত্মক বৃত্তিযুক্ত হয়েন এবং অহং-বুদ্ধি-যুক্ত পুরুষরূপে পরিণত হয়েন।

(গ) ঈশ্বরেচ্ছায় কালক্রমে পুনরায় রজোগুণের শক্তিদ্বারা এই অহংতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ সম্যক্ পরিচালিত হইলে, অহংতত্ত্বের সত্ত্বাংশ, রাজসাংশ, ও তামসাংশের আধিক্যানুসারে ইহাদিগের নানাবিধ পরিণাম ঘটিয়া থাকে। একদিকে সত্ত্বপ্রবল অভিমানবৃত্তিযুক্ত বুদ্ধ্যংশহইতে মনোনামক ইন্দ্রিয়ের প্রাদুর্ভাব হয়, ইহাতে রজোগুণেরও কিঞ্চিৎ স্ফুরণ থাকায়, ইহা সংকল্পযুক্ত অর্থাৎ কিছু মন্তব্যবস্তু গ্রহণ করিবার জন্য স্বভাবতঃ উন্মুখ হইয়া থাকে; তামসাংশ ইহাতে অপ্রকাশ থাকিয়া মনের স্বরূপের স্থিরতা সম্পাদন করে।

অপরদিকে অহংতত্ত্বের তামসাংশ রজোগুণদ্বারা পৃথক্‌রূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, ইহার সত্ত্বগুণাংশ—বুদ্ধিকে বহুল-পরিমাণে আবরিত করিয়া ফেলে, এবং অভিমানাংশমাত্রকে অবলম্বন করিয়া, তাহাকে যেন ঘনীভূত

* যে গৃহকে "আমার" বলিয়া আমার অভিমান আছে, তাহার সহিত আমি এতদূর একতা প্রাপ্ত হই যে, অপর কেহ ঐ গৃহের কোন অংশের ক্ষতি করিলে, আমার যেন বক্ষে আঘাত লাগে, এবং আমি আপনাকে অতি দুঃখিত বোধ করি। আমার নিজশরীরে আঘাত করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, ইহাতেও প্রায় তদ্রূপই কষ্ট হয়। দেহে আঘাত করিলে, আমি যে দুঃখিত হই, তাহারও কারণ এই দেহের সহিত একতাবোধ। খাদ্য দ্রব্যের অংশই দেহরূপে পরিণত হয়, তাহা আমা হইতে বিভিন্ন বলিয়া জানি; কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপে বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হওয়াতেই তাহাতে আত্মবুদ্ধি জন্মে।

করতঃ পৃথক্‌ভাবে "শব্দ" মাত্র রূপে আবির্ভূত হয়। এই শব্দমাত্রের স্বরূপ বোধগম্য করা অতীব কঠিন। যে শব্দের জ্ঞান আমাদের সচরাচর আছে, তাহা কোন আঘাতের দ্বারা উৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা মিশ্রিতবস্তু; তাহা শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি-সংযুক্ত নাদ। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত শব্দমাত্র নাদ নহে; নাদ হইতে স্বতন্ত্র যে নির্ম্মল শব্দ আছে, তাহা কথঞ্চিৎ এইরূপে বুঝা যায় যে, জিহ্বা ও ওষ্ঠ পরিচালনা না করিয়া, কেবল মানসিকরূপে শব্দের স্মরণ ও জপ করা সম্ভব। বাস্তবিক তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন যে, শব্দ-শক্তি গ্রহণ না করিয়া, সচরাচর চিন্তাই করা যায় না। পদার্থসকল শব্দ স্পর্শাদি গুণাত্মক, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; বিশেষ বিশেষ গুণসমষ্টি বিশেষ বিশেষ নামপ্রাপ্ত হইয়া, আমাদের জ্ঞানে বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং বিশেষ বিশেষ বস্তুকে তাহার সামান্য অথবা জাতির অন্তর্গতরূপেই আমরা অনুভব করিয়া থাকি। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্ট করা যাইতেছেঃ—একটি বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থকে আমি "গো" বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলাম; কিন্তু এই "গো" শব্দটি জাতিবাচক, কোন বিশেষ-গো-বোধক নহে; ইহা সামান্যবাচী; অতএব গো-নামক যে জাতিজ্ঞান আমার আছে, তৎসঙ্গে সমন্বিত হইয়াই ঐ বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থ আমার নিকট "গো" বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়। কিন্তু এই যে গো-জাতি বা গো সামান্য ইহা "গো" এই শব্দমাত্র দ্বারাই আমি বোধ করি; বিশেষ বিশেষ পদার্থ হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থিত কোন গো-নামক সামান্য পদার্থ আমার প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই এবং বস্তুতঃও নাই। অতএব গো-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ঐ শব্দটিই সাধারণতঃ আমার চিন্তার প্রবর্ত্তক; তাহা অতিক্রম করিয়া, সচরাচর চিন্তা অবস্থিতি করিতে পারে না। এইরূপ শব্দমাত্রই প্রায় সামান্যবাচী; সুতরাং কোন বিষয়ে চিন্তা

করিতে হইলে, বুদ্ধি যখন কোন অবলম্বন ভিন্ন সচরাচর চিন্তা করিতে সমর্থ নহে, এবং সামান্য বলিয়া যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষীভূতও হয় না, এবং চিন্তা করিতে হইলেই যখন সামান্যজ্ঞান ভিন্ন সাধারণতঃ চিন্তাই হইতে পারে না, তখন শব্দাবলম্বন ভিন্ন যে সাধারণ জীবের চিন্তা হয় না, তাহা কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া বিচার করিলেই বোধগম্য হয়। কিন্তু এইশব্দ প্রকাশিত নাদ নহে। অতএব সাধারণ নাদ হইতে শব্দমাত্র যে অতি সূক্ষ্ম, তাহা এইরূপে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়।* প্রণবই এই শব্দের আদি ও সূক্ষ্মতম রূপ বলিয়া, শ্রুতি এবং ঋষিগণ একবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রণবের সূক্ষ্ম স্বরূপ কি, তাহা যোগিপুরুষ ভিন্ন কেহ সম্যক্ অবগত হইতে পারেন না। আমাদের উচ্চারিত ওঁকাররূপ প্রণবে তাহার আভাস যেপরিমাণে আছে, অন্য কোন প্রকার শব্দে তদ্রূপ নাই ; এই নিমিত্ত সর্ব্বশাস্ত্র ইহার প্রাধান্য বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক এই "শব্দমাত্র" যাহাকে "শব্দতন্মাত্র" বলে, তাহাই অহংতত্ত্বের তামসপ্রধান প্রথম বিকার।

এই তামসপ্রধান-বিকার শব্দতন্মাত্র প্রাদুর্ভূত হইলে, ঐ শব্দের স্বরূপ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত অহংতত্ত্বের রাজসাংশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া, "শ্রোত্রেন্দ্রিয়"রূপে পরিণত হয় ; শ্রোত্রেন্দ্রিয় উক্ত শব্দকে স্বীয়বিষয়রূপে সম্যক্ গ্রহণ করে। পরন্তু শ্রোত্রেন্দ্রিয় শব্দকে স্বীয়-বিষয়রূপে গ্রহণ করিলেও, অহংতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বগুণাংশের বিকারসম্ভূত মনের সাহায্যেই তামসবিকার ঐ শব্দের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ ; সুতরাং তাহার পৃথক্ কার্য্যও আছে,

---

* বস্তুতঃ অর্থবোধক একাধিক বর্ণ-গঠিত শব্দসকল বাহ্যবস্তু নহে ; বুদ্ধিই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণধ্বনিসকল একত্র সমাহার করিয়া, স্ফোটশব্দের ধারণা করে। তাহা পাতঞ্জল দর্শন ব্যাখ্যানে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কেবল শব্দজ্ঞান গ্রহণ করাই মনের একমাত্র কার্য্য নহে। অতএব মনঃ কখন শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া শব্দজ্ঞান গ্রহণ করে, কখন বা করে না। পরন্তু যখনই মনঃ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া, শব্দজ্ঞান গ্রহণের নিমিত্ত উন্মুখ হয়, তখনই শব্দও জ্ঞানগম্য হইয়া থাকে; কারণ অহংতত্ত্বের তামসাংশ হইতে শব্দ পৃথক্‌রূপে পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছে। অতএব মনঃ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব, শব্দাত্মক বস্তুকে, পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল স্থায়িপদার্থ বলিয়া, ধারণা করিতে শিক্ষা করে। দ্রষ্টা ও দৃষ্টরূপ যে ভেদজ্ঞান, তাহা এইরূপে সম্যক্ প্রবর্ত্তিত হয়। শব্দাত্মক এই সকল স্থায়ী বস্তুর নাম "আকাশ" তত্ত্ব। গুণসকল ব্রহ্মাশ্রয়ে অবস্থিত হওয়াতে, তাহাদের সম্বন্ধে দ্রব্যবুদ্ধি হওয়া, জীবের স্বভাবসিদ্ধ; গুণসকল তাহাদের সেই ইন্দ্রিয়াতীত আধারে অবস্থিতরূপেই দৃষ্ট হয়; অতএব তাহারা দ্রব্য বলিয়া গণ্য হয়। পরন্তু কেবল সেই আশ্রিতবস্তুর সহিত তুলনায়ই ইহারা পৃথক্‌রূপে গুণ বলিয়া আখ্যাত হয়। ইহাই বস্তুতত্ত্ব ও গুণতত্ত্ব। অতএব পূর্ব্বোক্ত আকাশদ্রব্য যখন শ্রোত্রে-ন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তখন শ্রোত্রেন্দ্রিয় ইহার গুণরূপে শব্দকে গ্রহণ করে; পরন্তু ঐ শব্দগুণ ভিন্ন শব্দাশ্রয় আকাশের সম্বন্ধে অন্য কিছু বিশেষ জ্ঞান সাধারণতঃ জীবের নাই।

শব্দতন্মাত্র, শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও আকাশের উৎপত্তি-প্রণালী ব্যাখ্যাত হইল। অপরাপর ভূতগ্রাম এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি-প্রণালীও এই রূপ। আকাশের তামসাংশ কালক্রমে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, তাহার সূক্ষ্মতা আবরিত হইতে থাকে এবং তাহা ঘনীভূতভাব ধারণ করে এবং তদবস্থায় ইহার স্পর্শগুণ প্রকাশিত হয়; এই স্পর্শগুণকে "স্পর্শতন্মাত্র" বলে; ইহাকে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত "ত্বক্" নামক ইন্দ্রিয় অহংতত্ত্বের রাজসাংশ হইতে শ্রোত্রেন্দ্রিয়বৎ প্রাদুর্ভূত হয়;

এবং এই ত্বগিন্দ্রিয়ের উদ্বোধকরূপে ঐ শব্দ-ও-স্পর্শগুণাত্মক স্থায়িবস্তু দ্বিতীয় মহাভূত "মরুৎ" নামে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং জীব ইহাকে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল দ্রব্য বলিয়া জ্ঞাত হয়েন। এই মরুৎ অবিচ্ছেদে ক্রমান্বয়ে স্পর্শবোধ জন্মাইতে থাকিলে, তাহা প্রবাহরূপে পরিজ্ঞাত হয়; সুতরাং স্পর্শ ও প্রবাহ (চলনশক্তি)-বিশিষ্টরূপে মরুৎ জীবের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়; অতএব মরুৎই আমাদের গতিবিষয়ক জ্ঞানের মূল উৎপত্তিস্থান। এই গতিজ্ঞান পুনরায় দূরত্বজ্ঞান উৎপাদন করে; তাহা হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান উপজাত হয়; এই ব্যাপ্তিকেই "দেশ" বলে। নিরবলম্ব আকাশতত্ত্বের স্বরূপ সমাধিপ্রজ্ঞায়ই প্রকাশিত হয় এবং সমাধিবলে অপরাপর ইন্দ্রিয়বৃত্তি যখন নিরুদ্ধ হয়, কেবল শ্রোত্রেন্দ্রিয়মাত্র প্রকাশিত থাকে, তখনই অবিমিশ্র নিরবলম্ব শব্দময় আকাশস্বরূপ প্রজ্ঞাতে প্রকাশিত হয়। পরন্তু সাধারণ জীবের যে আকাশবিষয়ক জ্ঞান, তাহা দূরত্বজ্ঞান এবং রূপজ্ঞান প্রভৃতি যাহা পরে প্রাদুর্ভূত হয়, তন্মিশ্রিত।

মরুত্তত্ত্ব এবং ত্বগিন্দ্রিয় প্রকাশিত হইলে, অহংতত্ত্বের তামসাংশ আরও বর্দ্ধিত হইয়া, তাহা হইতে "রূপতন্মাত্র" ও তদ্‌গুণাত্মকবস্তু "তেজঃ" নামক তৃতীয় মহাভূত, এবং তাহা ধারণা করিবার নিমিত্ত রাজসাংশে "চক্ষুঃ"-নামক তৃতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রাদুর্ভূত হয়। এবং এইরূপে "রস-তন্মাত্র" ও তদাত্মকবস্তু চতুর্থ মহাভূত "অপ্" এবং চতুর্থ, জ্ঞানেন্দ্রিয় "রসনা" এবং অবশেষে "গন্ধতন্মাত্র" ও তদাত্মকবস্তু পঞ্চম মহাভূত "ক্ষিতি" এবং পঞ্চম জ্ঞানেন্দ্রিয় "নাসিকা" প্রাদুর্ভূত হয়। *

(ঘ) এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বশেষোক্ত

* আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও দৃশ্যমান জগৎকে শক্তিসমষ্টির বিকাশ বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন; পার্থিব জলীয় ও তৈজস পরমাণুসকলকে তাঁহারা তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তড়িৎ-শক্তির রূপান্তর বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছেন। ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর

"ক্ষিতি"-নামক মহাভূতে প্রথমোক্ত চারিটি মহাভূত সন্নিবিষ্ট আছে, এবং পঞ্চ মহাভূতের গুণরূপে যে শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্তই ক্ষিতিনামক মহাভূতে বর্ত্তমান আছে। এইরূপ "অপ্"-নামক মহাভূতে প্রথমোক্ত তিনটি মহাভূত (আকাশ, মরুৎ ও তেজঃ) সন্নিবিষ্ট আছে, এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চতুর্ব্বিধ গুণ বর্ত্তমান আছে; "তেজো"-নামক মহাভূতে আকাশ ও মরুৎ সমন্বিত আছে, এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ এই ত্রিবিধ গুণ বর্ত্তমান আছে; "মরুৎ"-নামক মহাভূতে আকাশ সমন্বিত আছে, এবং শব্দ ও স্পর্শ এই দ্বিবিধ গুণ তাহাতে বর্ত্তমান আছে; "আকাশ"-নামক মহাভূতে অন্য কোন মহাভূত সমন্বিত নাই, এবং শব্দই ইহার এক মাত্র গুণ।

আমাদিগের দৃশ্যরূপে অবস্থিত এই জগৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমহাভূতাত্মক; কিন্তু এক একটি মহাভূতরূপ উপকরণে যে এক এক শ্রেণীর বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে; এই পঞ্চমহাভূতপরমাণু ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিলিত হইয়া, জাগতিক সমুদায় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক বস্তুই মিশ্রিত বস্তু; কিন্তু কোন বস্তুতে কোন মহাভূতের অংশ অধিক,

---

পূর্ব্বে অবধারণ করিয়াছেন যে, মরুৎ-নামক বস্তু (যাহা স্বয়ং গুণাত্মক, তাহা হইতে ক্ষিতি অপ্ ও তেজোময় পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তু আবির্ভূত হইয়াছে। চলন ক্রিয়া-শক্তিযুক্ত মরুৎকেই তড়িৎ অথবা বিদ্যুৎ বলে। আকাশ তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম, তাহাতে তড়িৎও লয় প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে—অশ্বমেধ পর্ব্বের ৪২শ অধ্যায়ে ব্রহ্মার উক্তি বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

দ্বিতীয়ং মারুতোভূতং তগবাত্মক বিশ্রুতম্।
স্প্রষ্টব্যমধিভূতঞ্চ বিদ্যুত্তত্রাধিদৈবতম্॥

ইহাদ্বারা ক্রিয়াশীল (চলন-শক্তিযুক্ত) মরুত্তত্ত্ব যে "বিদ্যুৎ"-নামক দেবতা অথবা তড়িৎ বলিয়া আখ্যাত হয়েন, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। তড়িতের এবং সূক্ষ্ম মরুত্তত্ত্বের স্বরূপ বিচার করিলেও তাহাই অনুমিত হয়।

অপর কোন বস্তুতে অপর মহাভূতের অংশ অধিক। যে বস্তুতে যে মহাভূতের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই বস্তুর নাম ও শ্রেণী, সেই মহাভূতের নাম অনুসারেই হইয়া থাকে যথা :—মৃত্তিকাতে ক্ষিতির অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; অতএব ইহাকে বিশেষরূপে ক্ষিতি বলে। সুবর্ণেও ক্ষিতির অংশ অধিক ; কিন্তু তৈজসাংশ মৃত্তিকা অপেক্ষা সুবর্ণে অধিক, সুতরাং সুবর্ণ কখন তৈজসবস্তুরূপেও আখ্যাত হয় ; কখন বা "ক্ষিতি" রূপেই আখ্যাত হইয়া থাকে। আমাদের পানীয়জলেও ক্ষিতির অংশ বর্ত্তমান আছে, এবং অপর চারি মহাভূতও বর্ত্তমান আছে ; কিন্তু তাহাতে "অপের" অংশ অধিক থাকাতে, তাহাকে অপ্ বলিয়াই আখ্যাত করা যায়। জলস্থিত তেজের অংশ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে, এই জল বাষ্পাকার প্রাপ্ত হয়, তেজের অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে বরফরূপে পরিণত হয় ; ইহা দ্বারাই জলে তেজের অংশ থাকা প্রমাণিত হয়। আমরা যে অগ্নি দর্শন করি, তাহাতেও পঞ্চ মহাভূত সমন্বিত আছে, তবে তৈজসাংশই তাহাতে অধিক, এইজন্য ইহাকে তেজঃপদার্থ বলা যায়। প্রকাশিত অগ্নির তীব্র স্পর্শগুণ ঘনীভূত মারুতিক-তড়িতের ধর্ম্ম ; অগ্নির রূপটি বিশেষরূপে তেজের ধর্ম্ম। কাষ্ঠমধ্যে যে তেজ আছে, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু ঘর্ষণের দ্বারা তাহা অগ্নিরূপে প্রকাশিত হয়। বাস্তবিক শ্বেতপীতাদি বর্ণ ও রূপবিশিষ্ট সকলবস্তুতেই তেজ বর্ত্তমান আছে জানিতে হইবে। বায়ুতে মরুদংশ অধিক, সুতরাং বায়ুকে মরুৎ-রূপেই আখ্যাত করা হয়। আকাশপদার্থ অতি সূক্ষ্ম ; সুতরাং তাহা সর্ব্বব্যাপী ; জাগতিক কোন বস্তু দ্বারা ইহা অবরুদ্ধ নহে ; তাহা শূন্যরূপেই আমরা জ্ঞান করিয়া থাকি ; কিন্তু তাহার সহিত সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত হইয়া প্রত্যেক বস্তু অবস্থিত আছে। বাস্তবিক রূপবিহীন আকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে।

পরপরবর্ত্তী মহাভূতসকলে যেমন পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী মহাভূতের সমন্বয় আছে, তদ্রূপ পরপরবর্ত্তী গন্ধাদি গুণসমূহেও পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী গুণসকল সমন্বিত আছে। যথা—গন্ধনামক গুণে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস সমন্বিত আছে; গন্ধজ্ঞানে ন্যূনাধিকরূপে এতৎসমস্তেরই জ্ঞান মিশ্রিতভাবে বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ অপরাপর গুণসকলকেও বুঝিতে হইবে।

পরন্তু পরিদৃশ্যমান জগতের সকল স্থূল বস্তুই মিশ্রিত বস্তু হওয়ায়, অবিমিশ্রিত মহাভূতসকলের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপও গুণ বিশেষরূপে নির্ব্বাচন করিয়া, ইহাদের স্বরূপ সম্যক্ অবধারণ করা সুকঠিন। সমাধি দ্বারাই বস্তুতত্ত্ব নিশ্চিতরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, ইহা ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন। *

মনস্তত্ত্ব ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তিপ্রণালী বিবৃত হইল। এক্ষণে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টিপ্রণালী বিবৃত হইতেছে।

মনের সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা মহাভূত সকলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ গুণ বোধগম্য হইলে, মনঃ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়বিশিষ্ট অহং-তত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষের রজোগুণ আরও অধিকরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিশালী বলিয়া অভিমান করেন; সুতরাং তামসাংশে যে পঞ্চ মহাভূত উৎপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার শব্দাদি গুণসকল স্বকীয়রূপে আয়ত্ত করিতে তিনি যত্নশীল হয়েন। মনস্তত্ত্বে অহংতত্ত্ব এবং বুদ্ধিতত্ত্ব সমন্বিত আছে; মনঃ, অভিমান (অহং) ও বুদ্ধি এই ত্রিতয়কে অন্তঃকরণ-বৃত্তি বলে। মহাভূতসকলের যে শব্দস্পর্শাদি পঞ্চবিধ গুণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা ঐ অন্তঃকরণ বৃত্তিদ্বারা বিভুত্বাভিমানী পুরুষ আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়াস করেন। আকাশের শব্দগুণ স্বয়ং ধারণ করিয়া, প্রথমে তিনি "বাক্"-নামক কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রকাশ করেন।

---

* নির্ব্বিতর্ক এবং সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধি দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম সমুদায় বস্তুর তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তাহা যোগসূত্র-ব্যাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে।

পরে স্পর্শাদি গুণসকল সম্যক্ ধারণ করিবার নিমিত্ত উক্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তিদ্বারা পুরুষ "পাণি"-নামক দ্বিতীয় কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রকাশ করেন; জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত মহাভূতসকলের এই সকল গুণ ধারণ করাই পাণি-নামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য। মরুতের "চলন" রূপ যে একটি বিশেষ শক্তি আছে, তাহাও ঐ বিভু পুরুষ উক্তপ্রকারে ধারণ করিয়া, অপর একটি কর্ম্মেন্দ্রিয় আবির্ভূত করতঃ তাহা স্বকীয়রূপে প্রকাশ করেন; এই চলনাত্মক কর্ম্মেন্দ্রিয় "পাদ" নামে আখ্যাত হয়। মহাভূতের উক্ত গুণসকল পাণি-নামক কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা ধৃত হইলে, ঐ বিভুপুরুষ "উপস্থ"-নামক অপর কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রকাশ করিয়া, তদ্দ্বারা ঐ গুণসকলের সহিত সম্যক্ মিলিত ও তৎসহ সমতা প্রাপ্ত হয়েন। ত্বক্-নামক যে স্পর্শ-গুণ-গ্রাহক জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, তাহাকে বিশেষরূপে পরিচালনা করিয়া, তৎসাহায্যে পাণিদ্বারাধৃত গুণাবয়বসকলের সহিত এই উপস্থ-নামক কর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিত হয়, এবং ঐ বিভুত্বাভিমানী পুরুষ তখন আপনাকে সম্যক্ শব্দাদিগুণসম্পন্ন বলিয়া বোধ করেন। পাণি ও উপস্থ নামক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বকীয়রূপে ধৃত গুণসকলের অপ্রয়োজনীয়াংশ বর্জ্জন করিবার নিমিত্ত পুনরায় "পায়ু"-নামক অপর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। অনাবশ্যক অংশ বর্জ্জন করিবার যে শক্তি, ঐ বিভুত্বাভিমানী পুরুষ প্রকাশিত করেন, তাহাই এই "পায়ু"-নামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্বরূপ।

মনঃ ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পুরুষ কর্ম্মেন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইয়া, ঐ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উক্তপ্রকারে শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চবিধ তন্মাত্র স্বীয় আয়ত্তাধীন করিয়া, তাহার সহিত অভিমান-বৃত্তিদ্বারা একতা প্রাপ্ত হয়েন; সুতরাং একাদশ ইন্দ্রিয়-সমন্বিত পঞ্চ তন্মাত্রাত্মক-রূপে তাঁহার একটি দেহ স্বকীয় রূপে পরিকল্পিত হয়। তাহাতে অভিমান-বৃত্তিদ্বারা আত্মবুদ্ধি করিয়া, তিনি ঐ দেহরূপী হইয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই তাঁহার

"সূক্ষ্ম শরীর" বলিয়া আখ্যাত হয় এবং সূক্ষ্মদেহ-বিশিষ্ট পুরুষই সচরাচর "জীব" নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। এই সূক্ষ্মদেহের সর্ব্বাংশে পুরুষের সম্যক্ আত্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, তিনি ঐ দেহের উপকরণরূপে স্থিত ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার নিজের শক্তিমাত্র বলিয়া বোধ করেন, এবং এই সকল শক্তিযুক্ত জীব নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া, তৎসাহায্যে বহিঃস্থিত ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোমাত্মক দেহে প্রবিষ্ট হয়েন। তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইলে, তিনি স্থূলদেহধারী জীবরূপে পরিণত হয়েন এবং নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া, তজ্জনিত সংস্কার-নিবন্ধন এক স্থূল দেহের অন্তে পুনরায় ঐ সংস্কারের উপযোগী অন্য স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে জীবের সংসারে বারংবার যাতায়াত ঘটিয়া থাকে।

১৬। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মনঃ এই তিনটি তত্ত্বকে একত্র অন্তঃকরণ-বৃত্তি বলে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে তাহা হইতে বিশেষ করিয়া "করণ" অথবা "করণবৃত্তি" বলা যায়। কারণ এই দশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই উক্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তি স্থূল দেহকে স্বকীয়রূপে আশ্রয় করে এবং তদ্দ্বারা কর্ম্ম-সকল সম্পাদন করে। * পুরুষের স্থূলদেহাবলম্বনকার্য্যে অন্তঃকরণ-বৃত্তিই তাহার প্রথম সহায় হয়। পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মদেহধারী পুরুষ (জীব) স্থূলদেহ-পরিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার অন্তঃকরণবৃত্তিই প্রথমে চালিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার ভৌতিক পিণ্ডসকলেই পঞ্চ মহাভূত মিশ্রিতভাবে বর্ত্তমান আছে। এই সকল স্থূলদেহে (পিণ্ডে)

---

* মনের সহিত সংযুক্ত না হইয়া উক্ত দশ ইন্দ্রিয় কোন কার্য্য করিতে পারে না। অতএব করণশব্দে প্রধানতঃ মনঃ ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে বুঝায়। পরন্তু অহংতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত সমন্বিত না হইয়া, মনেরও কোন কার্য্যসামর্থ্য হয় না। অতএব সাধারণভাবে একাদশ ইন্দ্রিয় অহং ও বুদ্ধি এই ত্রয়োদশটিই করণ। কিন্তু তন্মধ্যে দশটি বাহ্যেন্দ্রিয়েরই মুখ্য "করণত্ব" সিদ্ধি আছে।

যে বায়বীয় অংশ আছে; তাহাতে মরুত্তত্ত্বের আধিক্যবশতঃ, ঐ দেহমধ্যে স্পর্শগুণ সূক্ষ্মতম ভাবে ঐ বায়বীয় অংশেই স্থিত আছে, সুতরাং জীব প্রথমে স্বীয় পাণি ত্বক্ ও উপস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা স্থূলদেহস্থ ঐ বায়বীয় মরুদংশকে আয়ত্ত করিয়া, অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা তাহাকে আত্মরূপে গ্রহণ করেন। শব্দ-গুণাত্মক আকাশ সর্ব্বব্যাপী; কোন দেহ তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; কারণ তিনি অতি সূক্ষ্ম; বায়ু কিঞ্চিৎপরিমাণে স্থূলদেহে অবরুদ্ধ থাকেন; সুতরাং জীব প্রথমে বায়ুস্থিত মরুদংশের সূক্ষ্ম স্পর্শগুণকে পাণীন্দ্রিয়ের দ্বারা ধারণ করিয়া, স্পর্শ-শক্তি ও উপস্থ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বায়বীয় মরুদংশের সহিত মিলিত হয়েন; মিলিত হইলে, অভিমানবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে সংযুক্ত হয়; সুতরাং তিনি ঐ মরুতে স্বকীয় বুদ্ধিযুক্ত হয়েন; জীব-কর্তৃক আত্মবুদ্ধিতে গৃহীত মরুৎই "মুখ্যপ্রাণ" নামে আখ্যাত হয়েন। পরন্তু দেহস্থিত বায়ুর মরুদংশের সহিত জীব এইরূপে একতা-প্রাপ্ত হইয়া, তদবলম্বনে বায়ুর সহিতও একতা-প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে জীব দেহের বায়বীয়াংশাবলম্বনে স্থূলদেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে, তাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ উক্ত বায়ুকে স্বীয়রূপে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে অনু-প্রবিষ্ট হয় ও দেহের সর্ব্বাংশে তৎসাহায্যে আপন আপন স্বরূপগত শক্তি অনুপ্রবিষ্ট করায়। ইন্দ্রিয়শক্তির প্রেরণাধীন হইয়া, দেহস্থ বায়ু পঞ্চবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করে এবং তদনুসারে তাহার পঞ্চবিধ নামকরণ হয়। যথা;—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। *

---

* এই পঞ্চবিধ প্রাণের মধ্যে উচ্ছ্বাসাদি কর্ম্ম যাহা দ্বারা করা হয়, তাহাকে বিশেষ রূপে প্রাণ বলে; ইহার স্থান হৃদয় হইতে নাসিকা; অপান বায়ুর কার্য্য উৎসর্গাদি (মলমূত্র-ত্যাগাদি), ইহার স্থান নাভির অধোদেশ হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত। সমান বায়ুর স্থান নাভিদেশ, ইহার কার্য্য দেহস্থ রসসকলের সমতা-সম্পাদন করা। সর্ব্বশরীরগামী বায়ুর নাম ব্যান। উদ্ধ্ববৃত্তি বায়ুশ্রেষ্ঠের নাম উদান; ইহার স্থান নাসিকাগ্রভাগ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত।

এই পঞ্চবিধ প্রাণ-বায়ুর সাহায্যে জীব সম্যক্ স্থূলদেহের অপরাপর ভৌতিকাংশের সহিত মিলিত হইয়া, তদাত্মতা প্রাপ্ত হয়েন। তন্মধ্যে যে অংশে যে ইন্দ্রিয় বিশেষরূপ শক্তি প্রকাশ করে, সেই অংশের নামও সেই ইন্দ্রিয়ের নামের অনুগামী হয়। যথা ;—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ইত্যাদি। এই সকল বিশেষ বিশেষ যন্ত্র এবং সর্ব্বশরীরগামী স্নায়ুসকল অবলম্বনে, পূর্ণরূপে গঠিত স্থূলশরীরে, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ প্রাণ, স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ; এবং এতদুভয়-সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা জীব বাহ্যবস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ যেরূপে উপজাত হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে ;—

এই ভূর্লোকে সূর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৈজসাংশপ্রধান বস্তু; সাধারণতঃ সূর্য্যকিরণ-সাহায্যেই ইহলোকে জীবের দর্শন-কার্য্য সম্পাদিত হয়। কিরূপে ইহা ঘটিয়া থাকে, তাহা বিচার করিলে, দেখা যায় যে, সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ মূল সৃষ্টিপ্রকাশিনী বহির্ম্মুখগামিনী শক্তির প্রভাবে সূর্য্যের তেজ বহির্ম্মুখে প্রতাড়িত হইয়া, বহিঃস্থ সূক্ষ্মবায়ুর তৈজসাংশের সহিত মিলিত হয় এবং চতুর্দ্দিকে রশ্মির আকারে প্রবাহিত হইয়া, সবেগে দিগ্‌দিগন্তরে গমন করে। যখন এই সকল রশ্মি পৃথিবীকে প্রাপ্ত হয়, তখন তৎসহযোগে পার্থিব বায়ুর তৈজসাংশ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। অপরদিকে পার্থিববস্তু-সমুদায়ের রূপও তাহাদের তৈজসাংশসম্ভূত। ঐ"রূপ" উক্ত বস্তুসকলের অভ্যন্তরস্থ বহির্ম্মুখগামী স্বাভাবিকশক্তি-প্রভাবে বহির্দ্দিকে বিতাড়িত হইয়া, সূর্য্যকিরণদ্বারা উদ্বেলিত বহিঃস্থ বায়ুর তৈজসাংশের সহিত মিলিত হয় এবং চতুর্দ্দিকে রশ্মির আকারে প্রবাহিত হইয়া, দ্রষ্টা জীবের চক্ষুর্গোলকস্থ বায়বীয় তৈজসাংশকে প্রাপ্ত হয় ; এবং তথায় স্নায়বীয় বায়ুর তৈজসাংশের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া, ঐ স্নায়বীয় বায়ুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। অতি শৈশবাবস্থায় যতদিন জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হইয়া বিকসিত না হয়, ততদিন বাহ্যবস্তুর

রূপ স্নায়বীয় বায়ুতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবিষ্ট হইলেই, দর্শনেন্দ্রিয় তথা হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিতে অর্পণ করে, এবং দ্রষ্টা পুরুষ তখন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; এবং তদ্দ্বারা তাঁহার সুখভোগ অথবা দুঃখভোগ সাধিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষেরও দর্শনেন্দ্রিয় যখন মানসিক-ব্যাপারদ্বারা আংশিকরূপে বুদ্ধিতে অবরুদ্ধ হয়, তখন বাহ্যবস্তুর রূপসকল উক্তপ্রকারে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ স্নায়বীয় বায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়া,দর্শনেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিলে, তৎসম্বন্ধে জীবের জ্ঞান জন্মে। পরন্তু জীব শৈশবাবস্থায় দর্শনেন্দ্রিয়-সাহায্যে উক্তপ্রকারে চক্ষুর্গোলকাভ্যন্তরস্থ-স্নায়বীয়বায়ুস্থিত বাহ্যবস্তুর রূপসকলকে স্বীয় ভোগ্যবিষয়রূপে প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমশঃ ঐ রূপভোগেচ্ছায় দর্শনেন্দ্রিয়কে চক্ষুর্গোলক অতিক্রম করিয়া, বহির্দ্দেশে প্রেরণা করিতে প্রযত্ন করিতে আরম্ভ করে। উক্ত হেতুতে দর্শনেন্দ্রিয় স্বীয় শক্তি প্রসারিত করিতে গিয়া, সূর্য্য হইতে (অথবা অন্য তৈজসপদার্থ হইতে) প্রাপ্ত বহিঃস্থিত বায়ুর পূর্ব্বোক্ত তৈজস-রশ্মিসকল অবলম্বনে সম্মুখদিকে গমন করে; এবং জীব এইরূপে দূরস্থবস্তুর রূপসকলকে প্রাপ্ত হয়, এবং তাহা বোধগম্য ও উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাতেই কেবল দর্শনের দ্বারাও দূরত্ব জ্ঞান জন্মে। দর্শনেন্দ্রিয়ের দূরগমনের শক্তির প্রভেদই ভিন্ন ভিন্ন লোকের দূরদর্শনশক্তির নানাবিধ তারতম্যের একটি প্রধান কারণ। ইন্দ্রিয়গণ দূরস্থানে গমন করিতে সমর্থ হওয়াতেই যোগীরা দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ করিতে পারেন; এক্ষণে যে কেহ কেহ পরকীয়-মানস-জ্ঞান লাভে (thought reading) সমর্থ হইতেছেন, তাহারও কারণ ইহাই।

অতএব বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের দর্শন-কার্য্য ত্রিবিধরূপে হয়, কখন বাহ্যবস্তুর রূপ চক্ষুর্গোলকে উপস্থিত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ হয়; কখন জীব দর্শনেন্দ্রিয়কে বহির্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া, বাহ্যবস্তুর রূপ প্রত্যক্ষ ও ভোগ করিয়া থাকেন। কখন বা উভয়-বিমিশ্রণে দর্শনকার্য্য ঘটিয়া থাকে;

শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-সম্বন্ধেও ন্যূনাধিক-পরিমাণে এই প্রণালীতেই কার্য্য হয় বুঝিতে হইবে।

১৭। অহংতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্ষিতিতত্ত্বপর্য্যন্ত তত্ত্বসকল অর্থাৎ অহংতত্ত্ব, মনের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত এই ২২টি তত্ত্ব এবং তদাশ্রয়ীভূত মহত্তত্ত্ব এই ২৩টি তত্ত্বকে সমষ্টিভাবে দেহ-স্বরূপ করিয়া, যে পুরুষ বিরাজমান আছেন, তিনি ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ; ইঁহাকেই মহাবিরাট্‌ও বলে। ইনিই প্রকাশিত সৃষ্টির প্রথম-পুরুষ। আর প্রথমোক্ত ২২টি তত্ত্বসমষ্টিরূপ দেহ-সমন্বিত যে পুরুষ, তাঁহাকে বিরাট্, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি নামে আখ্যাত করা হয়। মহাবিরাট্—হিরণ্য-গর্ভকে বিশ্বাস্‌সৃষ্ট বলে। কারণ তিনি অভিমানাত্মক অহংধর্ম্মের অতীত থাকাতে, বুদ্ধিরূপ দেহে তাঁহার অহংবুদ্ধি নাই। সৃষ্টিপ্রকাশের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ২২টি তত্ত্ব হিরণ্যগর্ভ পুরুষে লীন হইয়া, অপ্রকাশিত ভাবে অবস্থিতি করে। অণ্ডমধ্যে যেমন অপ্রকাশিতরূপে জীব-দেহ বর্ত্তমান থাকে, কালক্রমে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, তন্মধ্য হইতে জীব-দেহ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ অণ্ডহইতে অভিমানাত্মক দ্বাবিংশতিতত্ত্বরূপে জগৎ ব্যক্তীকৃত হয়। এই নিমিত্ত হিরণ্যগর্ভ পুরুষের দেহরূপে অবস্থিত সমষ্টিকৃত পূর্ব্বোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বকে ব্রহ্মাণ্ড বলে।

১৮। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে অনন্তরূপে বিমিশ্রণের দ্বারা অনন্ত-রূপী এই জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং দৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই ন্যূনাধিক-পরিমাণে এই সমস্ততত্ত্বই নিহিত আছে। কোন দ্রব্যে সত্ত্বগুণাধিক্যযুক্ত তত্ত্বসকলের অংশ অধিক, কোন দ্রব্যে বা রজো-গুণাধিক্যযুক্ত তত্ত্বসকলের, এবং কোন দ্রব্যে বা তমোগুণাধিক্যযুক্ত তত্ত্ব-সকলের অংশ অধিক। দ্রষ্টা পুরুষও প্রত্যেক বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন; সুতরাং সকলই জীব; পরন্তু আত্মবোধে যে বিশেষপিণ্ডকে অবলম্বন

করিয়া কোন পুরুষ প্রকাশিত হয়েন, সেই বিশেষ পিণ্ডকে তাঁহার দেহ বলা যায় এবং সেই পিণ্ডাশ্রিত পুরুষকে দেহী বলা যায়, আর সেই পুরুষের ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে যে প্রধানতঃ পঞ্চমহাভূতাত্মক অপর দেহপিণ্ড-সকল বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগকে সেই পুরুষের সম্বন্ধে ভোগ্য বা দৃশ্য বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যখন এই সকল বহিঃস্থ বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব-সমষ্টিরূপ-পিণ্ড কোন পুরুষের কেবল দৃশ্য অথবা ভোগ্যরূপে পরিজ্ঞাত হয়, তখন তাহাদিগকে জড় বলা যায়। ইহাদিগের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যাংশের সহিত একত্র যখন ইহারা জ্ঞানগম্য হয়, তখন ইহারা জীব বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টি বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে। আমি একজন মনুষ্য, আমার স্বরূপ বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, আমি কোন বিশেষ বিশেষ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ-বিশিষ্ট, ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোমাত্মক, একাদশ-ইন্দ্রিয়সমন্বিত, অভিমানবৃত্তি-ও-বুদ্ধিবিশিষ্ট একটি চেতনাশীল পদার্থ। তন্মধ্যে ক্ষিতি-অপ্‌-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোমাত্মক যে অংশটি, তাহাতেও আমার আত্মবুদ্ধি আছে; ইহাই আমার ভোগায়তন দেহরূপে কল্পিত হয়; ইহাকে "স্থূল" দেহ বলা যায়; মৃত্যুতে এইটি মাত্র বিচ্ছিন্ন হয়, অপর সকলই থাকে। অবশিষ্ট যে বুদ্ধি, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চ-তন্মাত্রের সমষ্টি, তাহা তন্নিহিত চৈতন্যময় পুরুষের তখন বহির্দেহরূপে কল্পিত হয়। এই অষ্টাদশতত্ত্ব-সমন্বিত যে জীবদেহ, তাহাকে জীবের "সূক্ষ্ম শরীর" বলে; এবং যখন ঐ সূক্ষ্ম শরীর ও প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়কালে অব্যক্তা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া, অব্যক্তভাব ধারণ করে, তখন জীবচৈতন্য কেবল গুণত্রয়ের অব্যক্তাবস্থারূপ প্রকৃতিতত্ত্বে সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তখন এই অব্যক্তা প্রকৃতিই জীবের দেহরূপে কল্পিত হয়; ইহাকেই জীবের "কারণ-দেহ" বলে। কিন্তু এই ত্রিবিধ দেহ-সম্বন্ধে

বিশেষ এই যে, "স্থূলদেহ"-সমন্বিত হইয়াই জীব বিশেষরূপে জাগতিক বিষয়সকলকে প্রত্যক্ষ ও ভোগ করেন, "সূক্ষ্মদেহ" তদ্রূপ ভোগোপযোগী নহে; এবং "কারণ-দেহে" সমস্ত অপ্রকাশ থাকাতে, তাহাতে কোন প্রকার ভোগ সাধিত হয় না। আমার সম্বন্ধে তত্ত্ব-বিচার করিলে, এতাবন্মাত্র আমার স্বরূপ বলিয়া অবগত হওয়া যায়। অপর জীব সকলের সম্বন্ধেও এইরূপই জানিতে হইবে। আমি যখন আমার স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকি, তখন অপর স্থূলদেহসকল সাধারণতঃ আমার দৃশ্য এবং ভোগ্যরূপেমাত্র প্রতিভাত হয়; সুতরাং তাহাদিগকে জড় বলিয়া মনে করি। কিন্তু সেইসকল দেহেও পুনরায় দৃক্‌শক্তি (পুরুষ) বর্ত্তমান আছেন; অতএব দৃক্‌শক্তি-সমন্বিত বলিয়া, যখন সেই সকল দেহকে দর্শন করি, তখন তাহাদিগকে জড় না বলিয়া, জীবই বলিয়া থাকি। পরন্তু যে সত্ত্বগুণাত্মক বুদ্ধিতত্ত্বকে, জ্ঞানমাত্র বলিয়া, পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার অংশ সকলপ্রকার দেহে সমান নহে; যে দেহে যে-পরিমাণে সত্ত্বাংশ অধিক, সেই দেহবিশিষ্ট জীব সেইপরিমাণে উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ। কোন কোন দেহে এই জ্ঞানাংশ এত অল্পপরিমাণে বিমিশ্রিত যে, সাধারণতঃ তন্মধ্যে জ্ঞান আছে বলিয়াই বোধ হয় না; এইসকল বস্তু সচরাচর কেবল জড়বস্তু বলিয়াই পরিচিত হয়; পরন্তু ইহাদিগের মধ্যেও অস্ফুটরূপে জ্ঞানাংশ নিহিত আছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানপ্রণালী অবলম্বনে, কোন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সম্প্রতি ইহা প্রমাণীকৃত করিয়াছেন যে, আমরা যাহাকে জড়বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তন্মধ্যেও অতি ক্ষীণভাবে জ্ঞানাংশ বর্ত্তমান আছে; সুতরাং তাহারাও প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে। তত্ত্ববিৎ ঋষিগণেরও ইহাই উপদেশ।

১৯। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অহঙ্কার-সমন্বিত দ্বাবিংশতিতত্ত্ব-

সম্মিলনে জগৎ অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পরন্তু তত্ত্বসকলের বিমিশ্রণ দ্বিবিধ; সমষ্টিভাবে বিমিশ্রণ ও ব্যষ্টিভাবে বিমিশ্রণ। ইহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে;—আমার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু, প্রত্যেক মাংসকণিকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের দেহ; এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব আমার দেহে, আমাহইতে স্বতন্ত্রভাবে, অবস্থিতি করিতেছে; আবার ইহাদের দেহসমষ্টি একত্র আমি-স্বরূপ একটি জীবের দেহরূপে পরিগণিত। সমস্ত বিশ্বও এইরূপ দ্বিবিধ-সম্মিলনে গঠিত। পৃথিবীস্থ প্রত্যেক ধূলিকণা স্বতন্ত্র, আবার তৎসমস্ত একত্র একটিবস্তু পৃথিবী; ধূলিকণা সকল পৃথিবীর অঙ্গমাত্র। অতএব ব্যষ্টিভাবে তত্ত্বসকলের বিমিশ্রণে যেমন অসংখ্য পদার্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সমষ্টিভাবে সম্মিলনেও অসংখ্য পদার্থ রচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অহঙ্কার-সমন্বিত দ্বাবিংশতিতত্ত্ব-সম্মিলনে জগৎ অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা বুদ্ধিতত্ত্ব-সমন্বিত হইলে, ইহাকে "ব্রহ্মাণ্ড" নামে আখ্যাত করা হয়। অতএব তত্ত্বসকলের সম্মিলন সমষ্টিভাবেও অসংখ্য হওয়াতে এবং বুদ্ধি তৎসমস্তেরই সহিত সমন্বিত হওয়াতে, ব্রহ্মাণ্ডও অনন্ত।

এই পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রাণিগণ যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, তাহা ত্রিবিধ স্তরে বিভক্ত; এই প্রত্যেক স্তরকে এক একটি লোক বলা যায়। তন্মধ্যে প্রথম-স্তরস্থ সত্ত্বগুণাধিক্যযুক্ত লোকসকলকে স্বর্লোক অথবা স্বর্গ বলা যায়; সত্ত্বগুণের উত্তরোত্তর আধিক্যক্রমে স্বর্গ লোকের পাঁচটি স্তর আছে; তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্নের স্তরের নাম বিশেষরূপে স্বর্লোক, এবং তদুপরিস্থিত লোকসকলের নাম ক্রমশঃ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য লোক; মহর্লোককে প্রজাপতি-লোক বলে, এবং শেষোক্ত তিনটিকে ব্রহ্মলোক বলা যায়। যাঁহারা এই সকল স্বর্গলোকে বাস করেন, তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর দেবতা বলিয়া পরিচিত। দ্বিতীয়স্তরস্থ অন্তরীক্ষলোক-নামে অভিহিত

ভুবর্লোকও নানাবিধ দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, ভূত, প্রেত, পিশাচাদি-নামক প্রাণীদিগের বাসস্থান। তৃতীয়তঃ অতলাদি সপ্তপাতাল ও সপ্তনরক-সহিত ভূর্লোক, মর্ত্ত্য মানবগণের ও অপরবিধ দেবতা, দৈত্য, দানব, নাগেন্দ্র, এবং পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জীবের নিবাস-স্থান। সূর্য্যকিরণদ্বারা যে পর্য্যন্তস্থান আলোকিত হয়, তাহাকে ভূর্লোক বলে। সত্ত্ব-প্রধান জীবকে দেবতা বলে; রজঃ-প্রধান জীবকে অসুর বলে, এবং তমঃ-প্রধান জীবকে রাক্ষস, পিশাচ ইত্যাদি নামে বর্ণনা করা যায়। মনুষ্যের মধ্যে এই ত্রিবিধ-ভাব-সম্পন্ন লোকই দৃষ্ট হয়। দেব-ভাবাপন্ন লোকের অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ, তিতিক্ষা, তপস্যা, সত্যভাষণ, দয়া, তুষ্টি, বৈরাগ্য, দান, সরলতা, বিনয়, এবং আত্মরতি, এই সকল স্বাভাবিক গুণ। রজঃ-প্রধান লোকের অতিশয় বিষয়বাসনা, বিষয়লাভের নিমিত্ত দেবাদি-অর্চ্চনা, দর্প, যুদ্ধোৎসাহ, যশোলিপ্সা, স্তুতিপ্রিয়তা ইত্যাদি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তমঃ-প্রধান লোকের ক্রোধ, লোভ, মিথ্যাব্যবহার, হিংসা, যাচ্ঞাবৃত্তি, বঞ্চনা, কলহ, শোক, মোহ, আলস্য, দৈন্য, ভয় ইত্যাদি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং মনুষ্যের প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়াতে, তাহাদিগের উন্নতির নিমিত্ত আচরণীয় ধর্ম্মসকলও পৃথক্ পৃথক্। ঋষিগণ সকলশ্রেণীর লোকের উপযুক্ত ধর্ম্মই পৃথক্পৃথক্‌রূপে উপদেশ করিয়াছেন। এইসকল ধর্ম্ম আচরণ করিয়া, লোকসকল যেরূপ অবস্থা লাভ করেন, তদনুসারে মৃত্যুর পরে পরলোকে তাঁহাদের গতিলাভ হয়।

২০। উপরি উক্ত দেবলোক-সকলে অসংখ্য দেবতা বাস করেন, এবং তাঁহারা উপাসিত হইয়া, মনুষ্যের অশেষবিধ কল্যাণ বিধান করেন। এই সকল দেবতা একাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; এই একাদশ শ্রেণীর দেবতা একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাদেরই

উপাসনা বেদে কর্ম্মকাণ্ডে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। ভূর্লোক, অন্তরীক্ষ-লোক ও স্বর্লোক, এই তিন লোকে বিভিন্ন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইঁহারা কার্য্য করেন। এই নিমিত্ত একাদশকে ত্রিগুণিত করিয়া দেবতাগণের শ্রেণী-সংখ্যা তেত্রিশ বলিয়াও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। উক্ত একাদশ শ্রেণীর দেবতা এক্ষণে বিবৃত হইতেছেন;—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রথমে মহাভূত আকাশ সৃষ্ট হয়, এবং শব্দতন্মাত্র ইহার গুণ; কিন্তু পুরুষ (দৃক্‌শক্তি) ইহাতেও অনুপ্রবিষ্ট আছেন; সুতরাং শব্দগুণাত্মক আকাশ ঐ পুরুষের দেহরূপে কল্পিত হয়, আকাশরূপ দেহধারী পুরুষকে "দিক্" -নামক দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই "দিক্" দেবতার শব্দ গুণ গ্রহণ করিবার জন্যই শ্রোত্র নামক প্রথম জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রকাশ পায়। শাস্ত্রে এই শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে "অধ্যাত্ম, ইহার বিষয় শব্দকে "অধিভূত", এবং দিক্ নামক দেবতা, যৎকর্ত্তৃক শ্রোত্রেন্দ্রিয় উদ্‌বুদ্ধ হয়, তাঁহাকে "অধিদৈব" নামে আখ্যাত করা হয়। এইরূপ মরুৎ-নামক মহাভূতের গুণ স্পর্শ; এই স্পর্শগুণবিশিষ্ট পুরুষকে "বায়ু" দেবতা, অথবা "বিদ্যুৎ" দেবতা, বলা যায়। যখন দৃশ্যরূপেমাত্র মরুৎ জ্ঞাত হয়েন, তখন তাঁহাকে জড় দ্বিতীয় মহাভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়; কিন্তু তাহাতেও দৃক্‌শক্তির অধিষ্ঠান আছে; অতএব তিনিও জীব (দেবতা)। এই 'বায়ু"অথবা "বিদ্যুৎ"-নামক দেবতার স্পর্শশক্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ত্বক্-নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকাশ হয়, সুতরাং ত্বগিন্দ্রিয় "অধ্যাত্ম",তাহার বিষয়রূপে অবস্থিত স্পর্শগুণ"অধিভূত", এবং বায়ু অথবা বিদ্যুৎ "অধিদৈব" বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। এইরূপে "চক্ষুঃ" অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, এবং তেজোরূপ দেহ-বিশিষ্ট "অর্ক"-নামক দেবতা অধিদৈব; রসনা অধ্যাত্ম, রস অধিভূত, বরুণ অধিদৈব; এবং নাসিকা অধ্যাত্ম, গন্ধ অধিভূত, অশ্বিনীকুমার অধিদৈব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এইরূপ পুনরায় "বাক্"-নামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

বহ্নি; অতএব বাক্ অধ্যাত্ম, বাক্য অধিভূত, বহ্নি অধিদৈব; পাণি অধ্যাত্ম, গ্রাহ্য অধিভূত, ইন্দ্র অধিদৈব; পায়ু অধ্যাত্ম, বর্জ্জনীয় অধিভূত, উপেন্দ্র অধিদৈব; পাদ অধ্যাত্ম, গন্তব্য অধিভূত, মিত্র অধিদৈব; উপস্থ অধ্যাত্ম আনন্দ অধিভূত, প্রজাপতি অধিদৈব। এই পঞ্চ দেবতা বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উদ্দীপক ও অধিষ্ঠাত্রী। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম চন্দ্রমা। মনঃ অধ্যাত্ম, মন্তব্য অধিভূত. চন্দ্রমা অধিদৈব। এই একাদশ দেবতা বেদে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা যেসকল পিণ্ডে বিশেষরূপে অধিষ্ঠান করিয়া, স্বীয় স্বীয় বিশেষ শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগের নাম অনুসারে সেইসকল পিণ্ডেরও নামকরণ হয়। যেমন এই ভূর্লোকে সূর্য্যই অর্ক দেবতা, চন্দ্রই চন্দ্রমা দেবতা, ইন্দ্র-নামক দিক্‌পালই ইন্দ্র দেবতা ইত্যাদি। অপর সকল ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মনঃ শ্রেষ্ঠ এবং মনের সহিত সম্মিলিত ভাবেই বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল কার্য্যক্ষম হয়; সুতরাং মনোময় লোককে বিশেষরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রলোক বলা যায়। তদূর্দ্ধে অহংকারাত্মক মূল প্রজাপতি লোকসকল, অবস্থিত এবং তদুপরি জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মলোকসকল প্রতিষ্ঠিত। পরন্তু প্রত্যেক জীবদেহে মহদাদি ক্ষিতিপর্য্যন্ত সমস্ততত্ত্ব নিবিষ্ট আছে; সুতরাং উক্ত তত্ত্বরূপ দেহাভিমানী দেবতাসকলেরও অংশ প্রত্যেক জীবদেহে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও বিশেষ বিশেষ কর্ম্মদ্বারা উক্ত বিশেষ বিশেষ দেবতাংশের শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং তন্নিমিত্ত তদ্দ্বারা উক্ত তত্ত্বাধিষ্ঠিত দেবতাসকল আকৃষ্ট হইয়া, সাধকের নানাবিধ অলৌকিক শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া দেন। পরন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (মহাদেব) ইঁহারা সাধারণ দেবতারূপে গণ্য নহেন; ইঁহারা অপর দেবতাদিগের তুলনায় ঈশ্বর বলিয়া পুরাণসকলে আখ্যাত হইয়াছেন। নির্ম্মল বিজ্ঞানময় যে বুদ্ধিতত্ত্ব পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই ইঁহাদিগের অবস্থিতি।

বুদ্ধিতত্ত্বের সত্ত্বাংশে বিষ্ণু, রাজসাংশে ব্রহ্মা, তামসাংশে মহাদেব অধিষ্ঠিত। তাঁহাদিগের ধাম নিত্য অবিদ্যাবর্জ্জিত ও আনন্দময়। দেবতাগণ অসুর-দিগের আক্রমণে অতিশয় পীড়িত হইলে, সচরাচর এই ঈশ্বরসকলেরই শরণাপন্ন হয়েন এবং তাঁহারাই কোন দেহাবলম্বনে প্রকাশিত হইয়া, দেবকার্য্য সম্পাদন করেন এবং সত্যধর্ম্ম স্থাপন করিয়া, অবতাররূপে সর্ব্বলোকে বিদিত হয়েন।

২১। সৃষ্টি যে প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত হয়, কালক্রমে সেই প্রণালীতেই পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ (যিনি বাসুদেব নারায়ণ ইত্যাদি নামে পুরাণে আখ্যাত) তিনি যেমন স্বীয়গুণসকল চালিত করিয়া, বিচিত্র বিশ্ব রচনাপূর্ব্বক তাহার প্রত্যেক অংশ পৃথক্ পৃথক্ রূপে তাঁহার জীবশক্তির উপভোগযোগ্য করেন, তদ্রূপ আবার কাল-ক্রমে গুণসকল সম্যক্ আহরণ-পূর্ব্বক আপনাতে লীন করিয়া, নিজ স্বরূপানন্দও উপভোগ করাইয়া থাকেন। সৃষ্টির বিস্তার, পালন ও সংহার তাঁহার লীলাস্বরূপ; এই লীলা তাঁহার প্রকৃতিগত; সুতরাং সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতেছে ও পুনরায় তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে তাঁহার নিয়ন্তা কেহ নাই। এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ক্রিয়ারূপ শক্তিসম্পন্ন বলিয়া, তাঁহাকেই "কালনামে" ও আখ্যাত করা হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগব্যাপী কাল, যাহা প্রায় ৪৩ লক্ষ বৎসরে পূর্ণ হয়, তাহাকে এক মহাযুগ বলে; এইরূপ সহস্রযুগ-ব্যাপক কালের নাম কল্প। এই এককল্পকাল ব্রহ্মার একদিন বলিয়া গণ্য হয় এবং পুনরায় এক কল্প তাঁহার রাত্রি। এইরূপ দিবা ও রাত্রিকে একদিন গণনা করিয়া, ৩৬০ দিনে তাঁহার এক বৎসর হয়। এইরূপ দ্বিপরার্দ্ধ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ুঃ। ব্রহ্মার দিবাবসানে অহংতত্ত্ব হইতে ক্ষিতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়; তিনি অব্যক্তা প্রকৃতিতে শয়ান

হইয়া থাকেন। পুনরায় তাঁহার রাত্র্যবসানে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া, স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন ও সমুদয় জগৎ প্রকাশিত করেন। ব্রহ্মার পরমায়ুঃ শেষ হইলে, তিনি একেবারে পরব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন এবং তৎসহ তদঙ্গীভূত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মরূপতা লাভ করে। পরন্তু ব্রহ্মের সগুণত্ব নিত্য; সুতরাং সৃষ্টিপ্রকাশিনী শক্তিও নিত্য এবং অনন্ত। অস্মদাদি যে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, তাহার সম্বন্ধেই সৃষ্টিপ্রণালী ও জগত্তত্ত্ব এইস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য। পরন্তু অপর ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব আলোচনা করা আমাদের নিষ্প্রয়োজন। অতএব শাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ নাই; কেবল ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড যে অসংখ্য, তাহাই মাত্র শাস্ত্রকারগণ উপদেশ করিয়াছেন।

২২। কার্য্যসকল উৎপাদন করিয়া, সর্ব্ববিধ কারণস্থানীয় শক্তিই অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়; সর্ব্ববিধ জীব দিবাভাগে কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া রাত্রির আগমনে নিশ্চেষ্ট হইয়া নিদ্রা যায়; কালক্রমে আবার উদ্বুদ্ধ হইয়া ক্রিয়াশক্তি (রজোগুণ) অবলম্বন করিয়া, কর্ম্মসকল সম্পাদন করে। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাও রজোগুণদ্বারা সৃষ্টকার্য্য সম্পাদন করিয়া, অবশেষে শিথিলপ্রযত্ন হয়েন ও নিদ্রাদ্বারা অভিভূত হয়েন। ব্রহ্মা সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাতে অপর সকল জীব আশ্রয় লাভ করে ও তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা নিদ্রাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তিনি প্রকৃতিতে লীন হয়েন; এই প্রকৃতিলীনাবস্থাই তাঁহার নিদ্রিতাবস্থা। তিনি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, প্রকাশাত্মক জগৎ অহংতত্ত্বের সহিত অপ্রকাশিত হইয়া যায়। হিরণ্যগর্ভ প্রকৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, কেবল দৃক্শক্তি-রূপে তিনি অবস্থিত হয়েন। গুণসকলও তখন ঐ দৃক্শক্তিতে লীন হইয়া, অপ্রকাশাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গুণসকলকে পৃথক্‌রূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত, ব্রহ্মার তদবস্থায় একপ্রকার উন্মুখতা বর্ত্তমান থাকে। সাধারণ

নিদ্রিত জীবেরও এইরূপ অবস্থা; নিদ্রিত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় অপ্রকট হইয়া, নিদ্রিত পুরুষের কেবল এক অস্ফুট জ্ঞানমাত্র-স্বরূপে লীন হইয়া, তাঁহার সহিত একতাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু ইহারা একেবারে বিনষ্ট হয় না; নিদ্রিত পুরুষের জাগরণের নিমিত্ত উন্মুখতা থাকে; ঐ উন্মুখতাই রজোগুণ; নিদ্রিতপুরুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তি লয়প্রাপ্ত হইলেও এই রজোগুণ পুনরায় প্রকাশিত হইবার জন্য অবকাশ প্রতীক্ষা করিয়া স্বীয় বল সঞ্চয় করিতে থাকে। এইরূপে যখন রজোগুণের বল অধিক হয়, তখনই নিদ্রিত পুরুষ জাগরিত হয় এবং তাহার ইন্দ্রিয়সকল ক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়। ব্রহ্মার সম্বন্ধেও তদ্রূপ, তাঁহার প্রকৃতিলীনাবস্থায় রজোগুণও প্রশান্ত হয়; কিন্তু এই রজোগুণের বাজভাব লুপ্ত হয় না; সুতরাং তিনি পুনরায় কালক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়েন এবং তাঁহার রজোগুণ অঙ্কুরিত হইয়া জগৎ-রচনাকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়।

২৩। পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বাত্মক এই জগৎকে সমষ্টিভাবে চারিপ্রকার প্রভেদযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যথা একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত এই ২১টি তত্ত্ব-সমন্বিত সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে প্রকটিত জগৎ, এইটি প্রকাশিত প্রথম অবস্থা; ইহাকে "বিশ্ব" বলে; এবং তন্নিষ্ঠ পুরুষ বিশ্ব এবং বিরাট্ নামে খ্যাত হয়েন। ইহা জগতের সম্যক্ প্রকাশিতাবস্থা; এই নিমিত্তই এই "বিশ্বকে" এবং "তন্নিষ্ঠ পুরুষকে" জাগ্রৎ-স্থানীয় বলা যায়। এই ২১টি তত্ত্বের উৎপত্তিস্থান অহংতত্ত্ব; অহং-তত্ত্বে রজোগুণ অতি প্রবল; সুতরাং অহং-তত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ সর্ব্বদা সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত উন্মুখ ও ইচ্ছুক; কিন্তু জাগ্রৎ-স্থানীয় বিশ্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি ক্ষিতিপর্য্যন্ত তত্ত্ব যখন রচিত হয় নাই, তখন অহংতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষের কেবল এই উন্মুখতামাত্র থাকে; এই অবস্থাকে এই নিমিত্ত দ্বিতীয় "স্বপ্ন"-স্থানীয় অবস্থা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত করা হইয়াছে; এবং অহং-

তত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষকে "তৈজস" এবং প্রদ্যুম্ন নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। কোন জীব নিদ্রিত হইলে, প্রথমে সেইব্যক্তি স্বপ্ন দর্শন করিতে থাকে, তখন সে জাগ্রৎ কালের ন্যায় বিষয়সকল বোধগম্য করিতে পারে না, অথচ সম্যক্ সুষুপ্তি না হওয়ায়, একদা বিষয়-বোধেচ্ছারও লোপ হয় না; সুতরাং বিষয়ের আভাসসকল সে স্বপ্নরূপে দর্শন করিতে থাকে। তদ্রূপ বিশ্ব অহংতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষের সম্যক্ বোধগম্য হয় না; কারণ তখন তাহা প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে। এই নিমিত্তই অহংতত্ত্বনিষ্ঠপুরুষকে তৈজস নামে, এবং অহংতত্ত্বকে জগতের স্বপ্নাবস্থা বলিয়া আখ্যাত করা যায়। এইরূপ নির্ম্মল বুদ্ধিতত্ত্বকে জগতের "সুষুপ্তি" অবস্থা, ও তন্নিষ্ঠ হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষকে "প্রাজ্ঞ" নামে শাস্ত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে। সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত এই অর্থে তিনি প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞা তাঁহার স্বাভাবিক লক্ষণ। সাধনবলে যখন সাধক এই প্রজ্ঞা-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন তাঁহাকেও "প্রাজ্ঞ" বলা যায়। সাত্ত্বিক মনুষ্য সুষুপ্তিকালে এই প্রজ্ঞাভূমিকে স্পর্শ করিয়া স্থিত হয়েন সত্য; কিন্তু এই ভূমিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। জাগ্রৎ হইলেই তাহাহইতে বিচ্যুত হয়েন, এই ভূমি তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু সাধনসম্পন্ন যোগি-পুরুষ বিষয়-বাসনা সম্যক্ পরিত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়হইতে আহরণপূর্ব্বক বিশুদ্ধ জ্ঞানমাত্রস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন; সুতরাং এই প্রজ্ঞাভূমি তাঁহার সম্যক্ আয়ত্ত হয়; সুষুপ্তিদশাপ্রাপ্ত পুরুষের ন্যায় ইহা তাঁহার অনায়ত্ত থাকে না; ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল আর তাঁহাকে ক্লেশ দিতে পারে না; সুতরাং তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয়; এই অবস্থাতেই তিনি "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" ইত্যাদি গীতা-বাক্যের বিষয়ীভূত হয়েন। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকৃতি-লীনাবস্থা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ

এই তিন অবস্থার অতীত, এই অবস্থায় গুণসকল দৃক্‌শক্তিতে লীন হয়; অর্থাৎ গুণসকলের এই দৃক্‌শক্তিতে লীনাবস্থাকে "তুরীয়" (অর্থাৎ চতুর্থ) অবস্থা বলা যায়। এই অবস্থাকে প্রকৃতি-অবস্থাও বলা যায়, পুরুষাবস্থাও বলা যায়। কারণ, গুণত্রয় এই অবস্থায় একদা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, অপ্রকট ও বীজভাবাপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ইহাকে প্রকৃতি-অবস্থা বলা যাইতে পারে। আবার তৎকালেও দৃক্‌শক্তির (পুরুষের) অভাব হয় না; অতএব ইহাকে পুরুষাবস্থাও বলা যাইতে পারে। পুরুষের দ্বৈতভাব, যাহা ক্লেশের মূল, তাহা তৎকালে অপ্রকাশিত হয়; কারণ দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় তখন আর কিছু থাকে না। দৃশ্শক্তির (পুরুষের) সহিত বীজভাবাপন্ন গুণসকল একীভূত হইয়া থাকে; সুতরাং এই অবস্থাকে পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয় নামেই আখ্যাত করা যায়। *

যেমন জীব সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিতত্ত্ব লাভ করিয়াও, জাগরিত হইলে তাহাহইতে বিচ্যুত হয়, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাও তদ্রূপ শয়ানাবস্থায় প্রকৃতি-তত্ত্বাশ্রয়ে অবস্থান করেন এবং তদবস্থায় তাঁহার সর্ব্ববিধভেদবুদ্ধি লয়প্রাপ্ত হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং তিনি তৎকালে আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। সুষুপ্তিকালে যেমন বৃত্তিসকল অবাধে সূক্ষ্মভাবে প্রবাহিত

---

* এই নিমিত্তই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৭ম অধ্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে জীব (পুরুষ) ও গুণাত্মক জগৎ এই উভয়কেই একবার প্রকৃতি নামে আখ্যাত করিয়া, পুনরায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে উভয়কেই পুরুষ নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রেও প্রথমতঃ পুরুষ এবং প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে নানাপ্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া, পরে শেষ মীমাংসায় বন্ধপ্রকৃতিরই থাকা এবং প্রকৃতিই আপনি আপনাকে বন্ধ হইতে মুক্ত করা স্বীকার করিয়া জীব ও প্রকৃতির মূলতঃ অভিন্নতাই প্রকারান্তরে প্রদর্শন করিয়াছেন। সূক্ষ্মদেহের প্রাকৃতিক উপাদানসকলের পরব্রহ্মরূপতা লাভই বাস্তবিক মুক্তি; যখন এই ব্রহ্মরূপতা লাভ হয়, তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পার্থক্য ঘুচিয়া যায়; সুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতি বলিয়া ভেদযুক্ত কিছু আর থাকে না।

হইয়া সুষুপ্ত জীবের আনন্দ উৎপাদন করে; অতএব জাগরিত হইয়া, তিনি আনন্দাবস্থায় ছিলেন বলিয়া অনুভব করেন; তদ্রূপ ব্রহ্মারও শয়ান-অবস্থায় ক্লেশোৎপাদক ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হয়; সুতরাং তিনি পরমানন্দময়তা লাভ করেন। কিন্তু জাগ্রৎ হইলে, তিনি এই অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া উদ্বোধিত হয়েন, এবং সৃষ্টিকার্য্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং শয়নকালে তিনি যে আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে। পরন্তু সাধক-পুরুষগণ প্রজ্ঞাভূমিতে পূর্ব্বোল্লিখিতবৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সদ্‌গুরুর উপদিষ্ট সাধন অবলম্বনে সম্যক্ সমাধিনিষ্ঠ হইয়া, ঐ পূর্ণানন্দময়তা সম্যক্ আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হয়েন এবং অবশেষে তাঁহারা পুরুষরূপে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পরব্রহ্মের সহিত একীভূতভাবপ্রাপ্ত হয়েন। ইহাকেই "কেবল" অথবা মুক্তাবস্থা বলে। এই অবস্থা লব্ধ হইলে আর তাহা হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হয়েন না; সুতরাং গুণকার্য্যে আর আবদ্ধ হয়েন না।

২৪। পরব্রহ্মের সহিত ভেদবুদ্ধিবিরহিত হইয়া চিত্ত সম্যক্ নির্ম্মল হইলে, তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়; ইহাই পরমমোক্ষ। জগত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও পরব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, এই মোক্ষলাভার্থ যে সাধন, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা নামে শাস্ত্রে আখ্যাত হইয়াছে। এই সাধন বিভিন্নপ্রকার; তাহা সাধকের প্রকৃতিগত অধিকার অনুসারে সদ্‌গুরুমুখে অবগত হওয়া আবশ্যক। পরন্তু সাধারণভাবে বর্ণনা করিতে হইলে, ইহাকে ত্রিবিধ-ভাবে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। জীবাত্মাকে (অর্থাৎ সাধকব্যক্তি আপনাকে) জগদতীত পরব্রহ্মরূপে চিন্তা করা ব্রহ্মবিদ্যার প্রথম অঙ্গ। কেহ কেহ এই একটি মাত্র অঙ্গ অবলম্বন করিয়া, সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন; তাঁহারা জ্ঞানযোগী নামে আখ্যাত হয়েন। দৃশ্য জড়বর্গ হইতে আত্মাকে পৃথক্ জানিয়া, আত্মার নির্ম্মল নির্গুণস্বরূপ

ধ্যানই জ্ঞানযোগ নামে আখ্যাত। সমগ্র জগৎকে পরব্রহ্মরূপে ধ্যান ব্রহ্মবিদ্যার দ্বিতীয় অঙ্গ। এই সাধনে প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত ব্রহ্মের প্রধান প্রধান বিভূতিসকল অবলম্বনে ধ্যান প্রবর্ত্তিত করিতে হয়; যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সূর্য্য, আকাশ, মনঃ প্রভৃতি অবলম্বনে তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া, অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতে সর্ব্বশক্তিমত্তা সর্ব্বব্যাপিত্ব সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতি গুণ সমাধান করিয়া, ধ্যান প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। ভগবদবতার মূর্ত্তির ধ্যান প্রভৃতিও এই অঙ্গের অন্তর্ভূত। জীব ও জড়বর্গ এতদুভয়াতীতরূপে পরব্রহ্মের ধ্যান, ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয় অঙ্গ। প্রথমোক্ত দুই অঙ্গের সাধন স্থিরতাপ্রাপ্ত হইলেই, এই তৃতীয়াঙ্গের সাধন সম্যক্ প্রবর্ত্তিত হয়। এই ত্রিবিধ অঙ্গই পূর্ণ ভক্তিযোগের অন্তর্গত। পরন্তু সদ্‌গুরুশক্তি লাভ করিতে না পারিলে, এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠালাভ করে না। মন্ত্রশক্তি অবলম্বনে সদ্‌গুরু সাধনবল সঞ্চারিত করিলে, এই বিদ্যা স্থায়ী হয়। সুতরাং মন্ত্রসাধন অর্থাৎ সদ্‌গুরুকর্ত্তৃক শক্তিপুটিত প্রণবাদি পবিত্রমন্ত্র জপ ও তদর্থ প্রণিধান ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধসাধনের আরম্ভক এবং নিত্য অঙ্গীভূত ও পোষক বলিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রে ও সর্ব্ববিধ সাধককর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সূক্ষ্মশব্দই অহংতত্ত্বের প্রথম তামসিক বিকার ও বাহ্যজগতের সূক্ষ্মতম অবস্থা; সুতরাং দৃশ্যজগৎ অতিক্রম করিতে হইলে শব্দাবলম্বনই অতিশয় উপযোগী। এতৎসম্বন্ধে এই গ্রন্থের উপসংহারে আরও কিছু বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করা হইবে। পরন্তু বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মবিদ্যার উক্ত ত্রিবিধ অঙ্গ বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যানেই তাহা প্রমাণসহ বিশদরূপে বর্ণনা করা হইবে।

উপসংহার।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ এই উভয়-রূপতা দ্বারা পূর্ণ, এবং পূর্ণ অর্থে (পূর্ণমনেন সর্ব্বম্ এই অর্থে) পরব্রহ্মকে "পুরুষ"ও বলা যায়; পরন্তু অপর সকল পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, তিনি "উত্তমপুরুষ" নামে আখ্যাত হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি জড়বর্গ-বিশিষ্ট জগৎকে আপনা হইতে প্রকাশিত করেন; ব্রহ্মের জীবশক্তি ইহাকে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে অহংরূপে ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয় এবং এইসকল জাগতিক রূপকে অবলম্বন করিয়া অনবরত পরিবর্ত্তনশীল সংসারমার্গে ও মোক্ষসাধনে প্রবর্ত্তিত হয়; গুণময় পুরীতে অবস্থান করেন এই অর্থে জীবও "পুরুষ" নামে অভিহিত হয়েন (পুরৌ শেতে ইতি পুরুষঃ); উত্তম-পুরুষ ভগবান্ও জীবের অন্তর্য্যামিরূপে এবং জাগতিক কার্য্যের নিয়ন্তা ও আশ্রয়রূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট। অতএব পুরুষ দ্বিবিধ। ১। উত্তমপুরুষ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী এবং ঈশ্বর, ২। জীব, যিনি অসর্ব্বজ্ঞ অসর্ব্বব্যাপী সুতরাং বিশিষ্ট চৈতন্য। ঈশ্বর সর্ব্বদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকাতে তিনি সদাই মুক্ত, সৃষ্ট-জগতে অবিদ্যাজনিত ভেদবুদ্ধি তাঁহার নাই। জগতের প্রথম জীব হিরণ্যগর্ভেও স্বরূপজ্ঞান আবরিত থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; সুতরাং প্রকাশিত সম্যক্ জগতের জ্ঞান তাহার থাকিলেও তিনি পূর্ণজ্ঞ নহেন। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে যাবদীয় রূপ ও ক্রিয়া জগৎ-রূপে প্রকাশিত হয়, তৎসমুদায়েরই নিত্য দ্রষ্টা ঈশ্বর। মহদাদি ক্ষিতিপর্য্যন্ত সৃষ্টি যখন প্রকাশিত হয়, তিনি যেমন তৎসমস্তেরই দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী; তদ্রূপ প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়কালে যখন সমগ্র জগৎ ব্রহ্মের শক্তিরূপা মূল প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়, তখন এই লীনাবস্থারও দ্রষ্টা ঈশ্বর থাকেন; এবং পরে পুনরায় যখন সৃষ্টি

প্রাদুর্ভূত হয়, তাহারও দ্রষ্টা পরমেশ্বর। এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ক্রমান্বয়ে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; পরমেশ্বর সর্ব্বসাক্ষী ও ত্রিকালজ্ঞ হওয়ায়, তৎসমুদয়েরই নিত্য দ্রষ্টারূপে তিনি অবস্থিত; সুতরাং কালশক্তি তাঁহাতে অস্তমিত। জ্ঞানের অপূর্ণতা দ্বারাই কাল নিরূপিত হয়। কোন বস্তু বা ক্রিয়ার জ্ঞান আমার আছে, অপর কোন বস্তুর জ্ঞান নাই; তৎপরে সেই বস্তুর জ্ঞান আমার হয়; এইরূপে জ্ঞানের পরাম্পর্য্য দ্বারাই কাল নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞান যদি নিত্যই আমাতে বিরাজমান হয়, তবে আর কাল বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, পারম্পর্য্যরূপে জ্ঞানোৎপাদন করিয়াই যে কালশক্তি প্রকাশ পায়, তাহা জ্ঞানের পারম্পর্য্যের বিলোপে কাজেই বিলুপ্ত হয়। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরে কালশক্তির কোন কার্য্য নাই। পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ভারতবর্ষের সকল সাধক-সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন, এবং অপরাপর দেশের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকসকলেরও ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে সর্ব্বপ্রকারে প্রকটিত সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান নিত্য না থাকিলে, সর্ব্বজ্ঞ শব্দের কোন অর্থ থাকে না। অতএব পরমেশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। তাঁহার এই সর্ব্বজ্ঞত্ব যে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারাই জানা যায়, তাহাও নহে। এই ভারতভূমিতে বহুপুরুষ যোগাবলম্বী হইয়া, ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া, আপেক্ষিকরূপে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালবেত্তা হইয়া, তাঁহারা ত্রিকালেরই বিবরণ সময় সময় প্রকাশিত করিয়াছেন। কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মগ্রহণ করিবার বহু সহস্রবৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের সম্যক্ লীলা বর্ণনা করিয়া রামায়ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পুরাণসকলে প্রায়শঃ ভবিষ্যৎ বিষয়ের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কালের পারম্পর্য্যনির্ব্বিশেষে সকল যুগের ঘটনাসকল

যে কোন কালে প্রকাশিত ঋষিগ্রন্থে সমভাবে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং গ্রন্থের বিবরণ পাঠ করিয়া, তাহার কালনিরূপণ করা যায় না। এযাবৎ ভারতবর্ষে এইরূপ মহাপুরুষগণ বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা কৃপাবশ হইলে কাল ও দূরত্বকে অতিক্রম করিয়া, দূরস্থিত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়সকল অনুগত সেবকদিগের নিকট প্রকাশিত করেন।

বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিলেও এই সর্ব্বজ্ঞত্ব অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। জ্যোতির্ব্বিদ্যা অবলম্বন করিয়াও গ্রহাচার্য্যগণ কখন কখন ভবিষ্যৎ ঘটনা-সকল নিশ্চিতরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতির ভবিষ্যৎ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অতি সাধারণভাবের জ্ঞান, ইহা সত্য; কি প্রকার মেঘসকল সৃষ্ট হইবে, কতক্ষণ ধরিয়া কিরূপ ধারায় বৃষ্টি পড়িবে, ঝড় কতকাল ব্যাপী হইবে, এবং তদ্দ্বারা কি প্রকার কার্য্যসকল সংঘটিত হইবে, তৎসমস্ত পণ্ডিতগণ এযাবৎ বিশেষরূপে অবধারণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, সত্য; কারণ যে সমুদয় শক্তি জগৎকে পরিচালিত করিতেছে, তাহার অতি অল্পাংশই তাঁহারা এযাবৎ অবগত হইতে পারিয়াছেন; কিন্তু যদি কেহ তৎসমস্ত শক্তির জ্ঞানলাভ করেন, তবে তিনি যে জাগতিক বিশেষ বিশেষ ব্যাপার-সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবগত হইতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার আর কি কারণ হইতে পারে?

যোগবলে দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি ইত্যাদি যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অপস্মার (হিষ্টিরিয়া) রোগগ্রস্ত অনেক রোগী কখন কখন চক্ষু সম্যক্ মুদ্রিত করিয়া, পৃষ্ঠদেশস্থিত পুস্তক পাঠ করিতে সমর্থ হয়, ইহা অনেকে পরীক্ষা করিয়াছেন। এইসকল রোগী কখন কখন ভবিষ্যৎ ঘটনাসকলও প্রত্যক্ষীভূত করিয়া বর্ণনা করিয়াছে, এবং পরে তাহা সম্যক্ ফলিত হইয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে। স্বপ্নকালে কখন

কখন ভবিষ্যদ্‌ঘটনা, অপরিচিত মনুষ্যাদি, এবং অপরিচিত স্থানসকল কাহার কাহার দর্শন হয়, পরে সেইসকল স্বপ্নবৃত্তান্ত সত্য সত্য প্রত্যক্ষীভূত হইতেও দেখা গিয়াছে। সুতরাং শারীরিক চক্ষুর্যন্ত্রের সাহায্যব্যতীতও, দেশ এবং কালের দ্বারা ব্যবধানে স্থিত, বস্তুসকল ও ঘটনাসকল যে মনুষ্যের দৃক্‌শক্তির বিষয় হইতে পারে, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। অপস্মার-রোগীর এই শক্তি অল্পপরিমাণে প্রকাশিত হয়; পরন্তু উপযুক্ত সাধনের দ্বারা তাহা সম্যক্ বৰ্দ্ধিত হইলে, সমস্তলোকই যে দৃষ্টিশক্তির বিষয়ীভূত হইতে পারে, ইহা একদা অসম্ভব বলিবার কি হেতু আছে? এক্ষণে চিকিৎসকগণ যন্ত্রসাহায্যে চক্ষুর অন্তরালে স্থিত, দেহমধ্যে অবস্থিত অবয়বসকল দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছেন। ঋষিগণ সাধন অবলম্বন করিয়া, এই চক্ষু-র্যন্ত্রেরই অবয়বসকল এইরূপ পরিবৰ্ত্তিত ও উন্নত করিয়া লইতেন, এবং অদ্যাপি লইতেছেন যে, কোন বস্তুই তাঁহাদের দৃষ্টির আবরণ জন্মাইতে পারে না। সুতরাং কাল ও দূরত্ব-নির্ব্বিশেষে তাঁহারা জাগতিক বস্তু ও ক্রিয়াসকলের জ্ঞানলাভ করেন বলিয়া যে শাস্ত্রে উক্তি আছে, তাহা একদা অসম্ভব বলিয়া যুক্তিদ্বারাও প্রতিপন্ন হয় না। এইরূপ দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি শক্তির বৃদ্ধির সহিত জগতে ক্রিয়াশীল শক্তি-নিচয়ের জ্ঞান সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, অতীত ও অনাগত বিষয়সকল বৰ্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হওয়া একদা অসম্ভব বলিয়া কি প্রকারে মীমাংসিত হইতে পারে? সুতরাং জগৎকারণ পরমেশ্বর, যিনি জাগতিক শক্তিসমুদয়ের আশ্রয়, তিনি যে নিত্য, ত্রিকালজ্ঞ ও কালাতীত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিবলেও সিদ্ধ হয়।

কালশক্তি যেমন ঈশ্বরে অস্তমিত, এবং তাঁহার নিত্যসর্ব্বজ্ঞতার বাধা জন্মাইতে পারে না, তদ্রূপ দেশব্যবধানদ্বারাও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার খর্ব্বতা

হয় না। কারণ অনুভূতিসকলের পারম্পর্য্যই দেশজ্ঞান উৎপাদন করে। পর পর ক্রমান্বয়ে প্রবাহরূপে অনুভূতিসকলের উপলব্ধি হইলে, দূরত্ব-বিষয়ক জ্ঞান উপজাত হয়, এবং অনেক গুলি অনুভূতি এক সঙ্গে উপস্থিত হইলে, তাহাদ্বারা দেশ ও আয়তন জ্ঞান জন্মে। মরুত্তত্ত্ব ও স্পর্শে-ন্দ্রিয়ের উৎপত্তি-ব্যাখ্যানে এই বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং দেশজ্ঞান কালজ্ঞানের অধীন হওয়ায়, এবং সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরে কালপর্য্যন্ত অস্তমিত হওয়ায়, দেশব্যবহিততাদ্বারা ও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার হানি হয় না। কিন্তু আমরা যে জাগতিক বস্তুনিচয়কে আমাদিগের হইতে ও পরস্পরহইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করি, তাহা দেশ ও কালের দ্বারা ব্যবহিততা বশতঃই ঘটিয়া থাকে; দেশ ও কালের ব্যবহিততা দূর হইলে, পার্থক্যজ্ঞান আর কোন প্রকারে সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ ঈশ্বর যে সর্ব্বব্যাপী, তাহা সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রেরই সম্মত। অতএব নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে, ইহা বোধগম্য হইবে যে, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাদ্বারাই তাঁহার অদ্বৈতত্বও সংসাধিত হয় এবং ইহাই শ্রুতিস্মৃতিপ্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ-শব্দে কেবল সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞানমাত্র থাকা বুঝা যায় না; এই শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরমেশ্বরে যে কেবল ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান আছে, এইরূপ নহে; সর্ব্বপ্রকারের জ্ঞানও এই সর্ব্বজ্ঞ-শব্দের অন্তর্ভূত। ঈশ্বর যেমন পূর্ণজ্ঞ, সর্ব্ববিষয়ের নিত্যজ্ঞানযুক্ত, তদ্রূপ তিনি খণ্ডজ্ঞানযুক্ত হইয়াও নিত্য বিরাজমান আছেন। তিনি যেমন সম্যক্ জগতের নিত্যদ্রষ্টা, তদ্রূপ তিনি জগৎকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনন্তরূপে বিভক্ত করিয়া, তাহাতে অনন্ত পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক কালশক্তি সমন্বিত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ রূপেও দর্শন করিয়া থাকেন। যে শক্তিদ্বারা তিনি এইরূপ

এক ও সম্যগ্‌দর্শী হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ রূপে জগৎ-রচনা করিয়া তাহা পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শন করেন, সেই শক্তিকেই মহামায়া অথবা মায়া বলে এবং এই মায়া-শক্তিকেই পূর্ব্বে প্রকৃতি ও পুরুষ (জীব)-রূপা শক্তি বলা হইয়াছে। * সর্ব্বদ্রষ্টা উত্তমপুরুষ ঈশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ দৃগংশ, যাহা পৃথক্ দর্শনের নিমিত্ত দৃশ্যাত্মক প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ বৈকারিক অংশে অনুপ্রবিষ্ট, তাহারই নাম জীব। সুতরাং জীব অপূর্ণজ্ঞ, তিনি ঈশ্বরের অংশবিশেষ। নিত্য পূর্ণজ্ঞ পুরুষকে ঈশ্বর বলা যায় এবং তাঁহার যে অংশে তিনি জগৎকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন, তাহাকে জীব বলা যায়।

একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এই বিষয়টি কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যাত হইতেছে। বায়স্কোপ যন্ত্র অনেকেই দেখিয়াছেন। এই যন্ত্রদ্বারা জাগতিক অতীত ঘটনাসকল যেটির পর যেটি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসমস্ত অবিকল বর্ত্তমানের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন একদল সৈন্য নদীর একপারে আসিয়া বন্দুক কামান প্রভৃতি অস্ত্রসহকারে উপস্থিত হইল, নদীর উপর তাড়াতাড়ি করিয়া কাষ্ঠদ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিল, সেতুর উপর দিয়া কামানসহ সৈন্যদল নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিল, প্রতিপক্ষ অপরপারহইতে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নদীতে পতিত হইল, নদীতে তরঙ্গ উঠিল, সৈনিকগণ অবশেষে পরপারে উপস্থিত হইয়া, গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল ; ইত্যাদি ঘটনা বহুকালপূর্ব্বে সংঘটিত হইলেও ঐ ঘটনাসকল ঘটিবার কালে কোন ব্যক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহা যেরূপ দর্শন করিতে পারিতেন, এক্ষণেও ঠিক তদ্রূপ ঐ

* শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে কেবল প্রকৃতিকেই মায়ানামে আখ্যাত করা হইয়াছে সত্য ; তাহার অভিপ্রায় এইমাত্র যে, প্রকৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হওয়াতেই, জীব তদাত্মবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হয়, জগৎ-প্রকাশের পূর্ব্বে পার্থক্যজ্ঞান থাকে না।

যন্ত্রসাহায্যে বর্ত্তমানবৎ তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হইবার কালে ঐ যন্ত্রদ্বারা তাহাদের প্রতিবিম্ব সকল গৃহীত হইয়া, একত্র রক্ষিত হয়, পরে সেই যন্ত্র চালনা করিয়া, ঐ প্রতিবিম্বসকল একটির পর আর একটি ক্রমান্বয়ে এইরূপ দ্রুতবেগে প্রদর্শিত হয় যে, তাহাতেই উক্ত ঘটনার প্রতিবিম্বসকল পর পর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া, বর্ত্তমানবৎ বোধ হইতে থাকে। এইরূপ সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার ঘটনাবলী যেন চিত্রবৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত; কালশক্তিনামক চক্র তাহাতে নিয়ত যুক্ত থাকিয়া, অনবরত ঘূর্ণায়মান হইতেছে; তাহাতেই জাগতিক চিত্রসকল ক্রমে একটির পর আর একটি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জীবের নিকট প্রকাশিত হইতেছে। যে শক্তিদ্বারা ব্রহ্ম এই চিত্রসকল পর পর দৃষ্টি করিতেছেন, তাহাই জীব-শক্তি এবং সমগ্র একসঙ্গে নিত্য যাঁহার জ্ঞানের বিষয়, তিনি ঈশ্বর। এইরূপই জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ বুঝিতে হইবে। এই জীবই "হংস" নামে শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছেন।* এবং এই কালরূপ চক্রকে উল্লেখ করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন—"অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে" (এই ব্রহ্মচক্রে হংস নিয়ত ভ্রাম্যমাণ হইতেছেন)। পুরুষের এই দ্বিরূপত্ব বুঝাইবার নিমিত্তই শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া—
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥৬॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

* "হন্তি গচ্ছত্যধ্বানমিতি হংসঃ। ভ্রাম্যতে অনাত্মভূতদেহাদিমাত্মানং মন্যমানঃ সুর-নর-তির্য্যগাদি-ভেদভিন্ননানাযোনিষু"। ইতি শঙ্করাচার্য্যঃ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীতশোকঃ" ॥ ৭ ॥

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়)

(দুইটী সুন্দর পাখী, পরস্পর সখ্যভাবে একত্র সর্ব্বদা মিলিত হইয়া একই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তন্মধ্যে একটি ঐ বৃক্ষের ফল আহার করিয়া তাহার স্বাদ ভোগ করিতেছেন; অপরটি এই ফল আহার করেন না, কেবল উদাসীনভাবে দৃষ্টিমাত্র করিয়া থাকেন। ঐ একই বৃক্ষে থাকিয়া কিন্তু জীবরূপী পক্ষী (ফললোভে) বন্ধন-দশা-প্রাপ্ত হয়েন, আপনাকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হয়েন, এবং শোক করিতে থাকেন; পরে যখন তিনি অপর ঈশ্বররূপী পক্ষীকে ভজন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন; এবং তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করেন, তখন এই উপায় দ্বারা তিনি দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

এক্ষণে ইহা সহজে উপপন্ন হইবে যে, একই ব্রহ্ম ত্রিবিধরূপে অবস্থিত :—প্রথমরূপে তিনি নিত্য সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান সমন্বিত ও কালাতীত, এবং সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বনিয়ন্তা। ইহাকেই তাঁহার "স্বরূপ" বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি পরব্রহ্ম এবং ঈশ্বর নামে আখ্যাত হয়েন। দ্বিতীয় জীবরূপে ব্রহ্ম আপনাকে অনন্ত পৃথক্-রূপে দর্শন করেন; এই দর্শন অনন্তভেদযুক্ত হইয়া তাঁহার পূর্ণতা সম্পাদন করে, সুতরাং জীবও অনন্ত। তৃতীয়তঃ তিনি জীবশক্তির দৃশ্যস্থানীয় অনন্তরূপভেদযুক্ত জগৎ। ব্রহ্মই দৃশ্যজগৎ-রূপে স্বয়ং প্রকটী-ভূত হইয়া, জীবশক্তির দ্বারা তাহা অনন্তরূপে অবলোকন করেন। এই দুই অবস্থার অতীত পরব্রহ্মেই শেষোক্ত দুই অবস্থার সংযোজকত্ব এবং নিয়ন্তৃত্ব আছে, ও থাকা সম্ভব; ইহাদিগের দুইটির মধ্যে কোন একটিতে তাহা থাকিতে পারে না; সুতরাং পরব্রহ্ম যথার্থই ঈশ্বর-

পদবাচ্য এবং ঐশীশক্তি-সম্পন্ন। পরন্তু ইহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক যে, জগদ্ব্যাপারসাধন উপলক্ষেই পরব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব-সিদ্ধি আছে। কিন্তু সর্ব্বকালে প্রকাশিত জাগতিক বস্তুসকল তাঁহার স্বরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত থাকাতে, তিনি সেই পূর্ণরূপে নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত; সুতরাং তদ্রূপে কোন প্রকার ক্রিয়ার বিবক্ষা নাই ও হইতে পারে না। পুনশ্চ তিনি জগদ্ব্যাপার যে সম্পাদন করেন, তাহাও সত্য। অতএব সর্ব্বশক্তিত্ব (ঈশ্বরত্ব) এবং নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতত্ব—এতদুভয়দ্বারা পরব্রহ্মের "স্বরূপ" বর্ণিত হইয়া থাকে, এবং ৯৬।৯৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বে বর্ণন করা হইয়াছে। *

---

* জীবশক্তির অনন্ত ভেদহেতু কোন জীব এই ব্রহ্মবিদ্যা ধারণ করিতে সমর্থ, কোন জীব সমর্থ নহে। যিনি এই বিদ্যা অবগত হইয়াছেন, তিনি অন্তরে সর্ব্বদা এইরূপ ধ্যান করিতে যত্ন করেন যে, তিনি স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এবং সমস্ত জগৎ এবং অপর সমস্ত জীবও তদ্রূপই। এই ধ্যান দ্বারা অল্পে অল্পে তাঁহার সর্ব্বত্র সমদর্শন প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে; সুতরাং সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ প্রভৃতি জাগতিক ব্যাপারে তিনি নির্লিপ্ত হইয়া পড়েন, সংসারকে তিনি ক্রীড়াভূমিরূপেমাত্র দর্শন করিতে থাকেন; তিনি এইরূপ জ্ঞান করেন যে, ব্রহ্ম জীবরূপ অবলম্বনে আপনি আপনাকে অনন্তরূপে দর্শন ও আস্বাদন করিতেছেন। বিচিত্র বিভিন্নপ্রকার সৃষ্টিতে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব কিছুমাত্র নাই. তিনি নিজে লীলাময়, অনন্তরূপে নিজেই লীলা করিতেছেন মাত্র। এইরূপ জ্ঞানপ্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধির সহিত সাধকের চিত্ত হিংসা দ্বেষ ও মোহ-প্রভৃতি-বিবর্জ্জিত হইয়া সাগরবৎ গাম্ভীর্য্য প্রাপ্ত হয় এবং নির্ব্বাতপ্রদীপবৎ একাগ্রতা লাভ করে; তৎপরে অবিদ্যা-জনিত সর্ব্ববিধ ভেদবুদ্ধি সম্যক্ বিনষ্ট হয়, এবং সাধক স্বীয় ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মবিদ্যার এইরূপই প্রভাব যে, যে সাধক এই বিদ্যা সম্যক্ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্ববিধ আলস্য অনায়াসে দূর হইয়া যায়, তিনি আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া, সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য স্বভাবতঃ সুমহৎ কষ্ট স্বীকার করিতেও পরাঙ্মুখ হয়েন না। অতএব ব্রহ্মবিদ্যাকে একপ্রকার নিশ্চেষ্টতা বলিয়া যেন কেহ আপনাকে প্রতারিত করেন না।

সকল জীব এই বিদ্যা ধারণ করিবার যোগ্য নহে। অযোগ্য পুরুষ যদি এই বিদ্যা মৌখিক শিক্ষা করে, তবে কোন কোন স্থলে জনসমাজে তাহার আলস্য এবং অপকর্ম্মের সমর্থনার্থ সে ইহার আশ্রয় অবলম্বন করিতে পারে সত্য; কিন্তু তাহার চরিত্রই তাহার অসমদর্শিত্ব প্রকাশ করিয়া, এই বিদ্যাধারণবিষয়ে তাহার অক্ষমতা জনসমাজকে জ্ঞাপন

করিবে এবং যাহারা এই বিদ্যা ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহারা যদি ইহা কেবল মৌখিক শিক্ষা করে, তবে তাহাদের আভ্যন্তরিক প্রবৃত্তির প্রেরণার কার্য্যকালে তাহারা ইহা বিস্মৃত হইয়া, আপনার প্রবৃত্তির অনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব এবংবিধ লোকের প্রতি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ নিষ্ফল ও অসঙ্গত বলিয়া ঋষিগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত নির্ম্মলচিত্ত পুরুষেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার। যে প্রকৃতির পুরুষ যেপ্রকার কর্ম্মাচরণ করিলে ক্রমশঃ নির্ম্মলতা লাভ করিতে পারে, তাহা দিব্যদর্শী ঋষিগণ স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন; অতএব অনলস চিত্তে বুদ্ধি পূর্ব্বক তৎসমস্ত অনুষ্ঠান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

(২) পরন্তু কেহ কেহ এইরূপও আপত্তি করেন যে, জীবকে ব্রহ্মের অংশ এবং জাগতিক সমস্ত ব্যাপারকে নিত্যরূপে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলাতে মনুষ্যের মানসিক ব্যাপার সমস্তই নিয়মাধীন ও অলঙ্ঘনীয় এবং কর্ম্ম-চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া পড়ে, কোন কার্য্যের নিমিত্ত কাহার দায়িত্ব কিছুমাত্র থাকে না, এবং পাপপুণ্যের প্রভেদ এবং কার্য্য-কারণ—সম্বন্ধ লোপ প্রাপ্ত হয়। অতএব হিন্দুশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত এইরূপ মত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, তদ্দারা জগতের অকল্যাণই সাধিত হইবে; সুতরাং এইরূপ উপদেশ কখন সঙ্গত হইতে পারে না।

কিন্তু নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, এই আপত্তি সর্ব্বথা মূলহীন। মনুষ্যের মানসিক ব্যাপার বাহ্য ভৌতিকব্যাপারের ন্যায় বস্তুতঃই নিয়মাধীন; বাহ্য ভৌতিক ব্যাপার যেমন কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান আছে, মনুষ্যের মানসিক ব্যাপারও তদ্রূপ। সৎসংসর্গে থাকিলে পুত্রটি সৎ হইবে, অসৎ সংসর্গে থাকিলে অসৎ হইবে, বালককাল হইতে ভাল লোকের অধীন থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, তাহার মানসিক বৃত্তিসকল উত্তমরূপে বিকসিত হইবে; তদ্রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে হইবে না; ইত্যাদি ধারণা যে মনুষ্যসমাজে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার যথার্থতা বিষয়ে বোধ করি কাহারও মনে সন্দেহ হইতে পারে না। দণ্ডনীতি যাহা মনুষ্যসমাজে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, তাহাও মানসিক প্রকৃতির সংশোধন ও গঠন বিষয়ে একটি বিশেষ শিক্ষা স্বরূপ। অবশ্য দেশ কাল পাত্রভেদে শিক্ষার ফলের প্রভেদ হয়, এবং চরিত্রগঠন-সম্বন্ধে অনেকগুলি কারণের মধ্যে শিক্ষা একটি কারণ মাত্র; কিন্তু মানসিকপ্রকৃতির গঠন বিষয়ে যে শিক্ষা ও ফলোৎপাদক হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। পরন্তু এইটি স্বীকার করিলেই, মনুষ্যের মানসিক বৃত্তিসকলও যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের অধীন, তাহা স্বীকার করিতে হইল; যেমন ভৌতিক এক বস্তু অপর বস্তুর সংসর্গে রূপান্তরিত হয়, মনুষ্যের মনও তদ্রূপই অপরবিধ সংসর্গ দ্বারা রূপান্তরিত হয়। বাহ্য জড়বস্তু যে মনের উপর কার্য্য করে, ইহা নিত্যই প্রত্যেক মনুষ্য অনুভব করিতেছেন; ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ বাহ্য জড়বস্তুর সহিতই হয়, এবং তদ্দারা নানাবিধ মানসিক ব্যাপার প্রবর্ত্তিত হয়; এবঞ্চ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যের মন ও বাহ্যজড়

বস্তুর সমশ্রেণীর পদার্থ; কোন ঔষধ ব্যবহার করিয়া মনুষ্য পাগল হইয়া যায়, কোন ঔষধ ব্যবহার করিলে পাগলও প্রকৃতিস্থ হয়; অধিক মদ্য পান কর, মানসিক বৃত্তি তৎক্ষণাৎ একরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে; মদ্য পান হইতে বিরত হও তদ্রূপ হইবে না। এতৎসমস্তই মানসিকব্যাপার; কিন্তু তাহা আহার্য্য জড় বস্তু দ্বারা সংঘটিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। শারীরিক অবস্থার উপর মানসিক অবস্থা যে বহুলপরিমাণে নির্ভর করে, ইহা প্রত্যেকের নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। এক্ষণে পাশ্চাত্য প্রদেশবাসী পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, তড়িৎ (অথবা বিদ্যুৎ) হইতে অপর ভূত-সকল উৎপন্ন হইয়াছে; এবং ইহাও এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানসিক ইচ্ছাশক্তি তড়িৎক্রিয়া উৎপাদন করিতে সমর্থ। প্রাচীন ঋষিগণ নিশ্চিতরূপে উপদেশ করিয়াছেন যে, মনও জড়প্রকৃতিরই বিকার মাত্র। সুতরাং মনুষ্যের মনও যে অপর জড় বস্তুর সমশ্রেণীর বস্তু ও তদ্রূপই নিয়মাধীন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই বিষয়ে অধিক বিচার নিষ্প্রয়োজন।

মানসিক ব্যাপারসকল নিয়মের অধীন হওয়ায় এবং মন ও বাহ্যজড়বর্গের সমশ্রেণীভুক্ত পদার্থ হওয়ায়, জগতে যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভবিষ্যৎ ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে মনুষ্যের জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তদ্রূপই ভবিষ্যৎ মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধেও জ্ঞানোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রদ্বারা যে মনুষ্যের ভবিষ্যৎ-জীবনের শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ ঘটনা অনেক স্থলে নিশ্চিতরূপে জানা যায়, তাহা পাশ্চাত্য প্রদেশেও এক্ষণে প্রমাণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব যখন জাগতিক শক্তিনিচয়ের জ্ঞানবৃদ্ধি হইলে ভবিষ্যৎ মানসিক ও অপর ভৌতিকঘটনা সম্বন্ধে সমভাবেই জ্ঞান লাভ করা যায়, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সর্ব্ববিধঘটনাই এক অর্থে অবশ্যম্ভাবী ও পূর্ব্বাবধারিত। ঋষিগণও তাহাই বলিয়াছেন। অতএব ঋষিগণের বাক্য যে সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের জ্ঞানে সমস্তব্যাপারই নিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহা সত্য জ্ঞান, তদ্দ্বারা অন্তিমে জগতের অকল্যাণ হইবার আশঙ্কা অমূলক।

পরন্তু নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে, জাগতিক, সর্ব্ববিধ ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী, এই কথার অর্থ এইরূপ নহে যে কর্ম্মচেষ্টা নিষ্ফল। যে ব্যাপারটি ঘটিবে, তাহা যেমন অবধারিত আছে, তদ্রূপ যে যে কর্ম্ম করিবার পর যে যে নিয়মে তাহা ঘটিবে, তাহাও অবধারিত আছে; সুতরাং আমি কর্ম্ম করি বা না করি, অবধারিত ফল অবশ্য ঘটিবে, এই মত সত্য নহে; যেমন ফলটি অবধারিত, তদ্রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচেষ্টাও অবধারিত, তাহাও করিতেই হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচেষ্টার সহিত নিরপেক্ষ-ভাবে ফল ফলিবে না।

পরন্তু এইরূপ হইলে, কাহার কোনপ্রকার কর্ম্মের জন্য দায়িত্ব না থাকা স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া যে আপত্তি, তাহাও সঙ্গত নহে। দায়িত্ব শব্দে এইমাত্র বুঝায় যে,

যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের ফল তাহারই প্রাপ্য; কারণ সে সেই কর্ম্মের কর্ত্তা। পূর্ব্বোক্ত উপদেশের সহিত এই বিষয়ের কোন বিরোধ নাই। প্রত্যেক জীব অবধারিত কর্ম্মসকল করিয়া তদনুরূপ অবধারিত ফলসকল প্রাপ্ত হয়; একজনের কৃতকর্ম্মের ফল অপরে প্রাপ্ত হয় না, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। অতএব দায়িত্ব-বিষয়ক আপত্তিও মূলহীন।

পাপপুণ্যের প্রভেদ লোপ হওয়া বিষয়ে আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। কর্ম্মের ফল একরূপ নহে, তাহার অসংখ্য প্রভেদ আছে। যে কর্ম্ম কৃত হইলে, ইহ অথবা পরকালে সুখোৎপাদন হওয়ার নিয়ম আছে, তাহার নাম পুণ্য; যে কর্ম্ম কৃত হইলে ইহ অথবা পরকালে দুঃখোৎপাদন হওয়ার নিয়ম থাকা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাকে পাপ বলে। ঋষিগণ কর্ম্মের গতি অবগত হইয়া কোনটিকে পুণ্য, কোনটিকে পাপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কর্ম্মের গতি অবধারিত থাকাতেই পাপপুণ্য নাম সার্থক হয়। সুতরাং এতৎসম্বন্ধীয় আপত্তিও অসার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ লোপ-প্রাপ্ত হওয়া বিষয়ক আপত্তিও তদ্রূপ অমূলক। একটি বিশেষ কার্য্য পূর্ব্বে বর্ত্তমান হইলে, পরে অপর একটি বিশেষ কার্য্য প্রকাশিত হওয়া নিয়মাবদ্ধ আছে; সুতরাং পূর্ব্বের কার্য্যটির অবর্ত্তমানে পরের কার্য্যটি প্রকাশিত হয় না। এই অলঙ্ঘ্য নিয়মই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নামে উক্ত হয়। অতএব কর্ম্মের নিয়মাবদ্ধতা ও অলঙ্ঘনীয়তা-বিষয়ক শাস্ত্রীয় উপদেশ দ্বারা কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অপলাপ হয় না।

এই সকল আপত্তির মূলে বাস্তবিক আর একটি ভাব নিহিত আছে, তাহা হইতেই এই সকল আপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে; তাহা এই যে, যদি প্রত্যেক জীবই এইরূপে অবধারিত কর্ম্ম করিতেই বাধ্য আছে, তবে তাহাকে কর্ত্তা বলিয়া তৎপ্রতি দোষারোপ করা অসঙ্গত; কারণ সকল কর্ম্মেরই মূলকর্ত্তা পরমেশ্বর; এবং সর্ব্ববিষয়ে পরমেশ্বরেরই প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব হইলে, জীবের তৎফল ভোগ করা অন্যায়। বস্তুতঃ নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে, এই আপত্তিও অসার বলিয়া বোধ হইবে। কারণ জীব রূপেই ব্রহ্ম কর্ম্ম করিয়া থাকেন; সুতরাং জীবরূপেই তৎফলভোগ করা উচিত; জীব ব্রহ্মেরই অংশ; সুতরাং পক্ষপাতিত্বেরও কোন স্থল নাই। যে অংশে ব্রহ্ম কর্ম্মসম্পাদন ও কর্ম্মফল ভোগ করেন, সেই অংশেরই নাম জীব, জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্মের জীবশক্তি নিত্য; সুতরাং কর্ম্মও অনাদি, এবং জীবের ভোগও অনাদি কাল হইতে প্রবর্ত্তিত। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা যাইতেছে। কলিকাতায় গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান হইয়া যদি কেহ গঙ্গার উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি দেখিবেন যে, গঙ্গা বরাহনগর-নামক স্থান হইতে আসিয়াছেন;, ইহা সত্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু বরাহনগরে যদি তিনি গিয়া উপস্থিত হয়েন, তবে দেখিবেন যে, গঙ্গা আরও অনেক দূরবর্ত্তী কোন্নগর নামক স্থান হইতে আসিয়াছেন; এইরূপে অবশেষে হিমালয়কে গঙ্গার মূল উৎপত্তিস্থান বলিয়া তিনি জানিতে পারিবেন। পরন্তু হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছেন বলাতে কলিকাতায় গঙ্গা বরাহনগর হইতে

আসেন নাই, বুঝিতে হইবে না; উভয় বাক্যই সত্য; বরাহনগর হইতে আসা হিমালয় হইতে আসার অন্তর্গত। জীবের কর্তৃত্ব ও এইরূপ ঈশ্বরকর্তৃত্বের অন্তর্গত উভয় পরস্পর বিরোধী নহে; কারণ জীব ঈশ্বরাধীন এবং তদংশমাত্র। জীবের কর্ম্ম জীব হইতে উৎপন্ন, আবার জীব ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন ও তদধীন; এইমাত্র সার জানিলে, আর বিচার্য্য বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিবে না।

উপাসনাদি কর্ম্মও জীবের কর্ম্মমধ্যে গণ্য, তাহারও ফলবত্তা নিয়মিত আছে। উপাসনাদি কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মের ফলদাতৃত্বশক্তি উদ্বোধিত হয়। ইহাই তাঁহার নিয়ম। অনন্ত ভেদযুক্ত জীবশক্তিকে কর্ম্মে প্রেরণা করা যেমন আদিকারণ পরব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত, তদ্রূপ কর্ম্মসকলের ফলদাতৃত্বও সেই আদি কারণেরই স্বরূপান্তর্গত। পরন্তু তিনি বিশেষ বিশেষ জীবশক্তিদ্বারা সেই সকল ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

ব্রহ্ম এইরূপে জগন্নিয়মিত করিয়াও স্বয়ং অবিকারী থাকেন। তাঁহার সম্বন্ধে এতৎসমস্তই লীলামাত্র। শত পুরুষ একই গৃহে শয়ান থাকিয়া, শত প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে; সেই স্বপ্নে কেহ ব্যাঘ্রভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে, কেহ অসহ্য রোগযাতনায় পতিত হইয়া হাহাকার করে, কেহ রাজমুকুট ধারণ করিয়া নানাবিধ ঐশ্বর্য্যভোগ করে। যদি অপর এক ব্যক্তি জাগরিত থাকিয়া, স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষসকলের স্বপ্নচেষ্টা দর্শন করিবার উপযুক্ত চক্ষুলাভ করে, তবে সেই সকল স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের সুখদুঃখাদি ভোগ দৃষ্টে যেমন সেই জাগরিত ব্যক্তি তাহাদের ন্যায় মোহপ্রাপ্ত হয় না, পরমেশ্বর সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অধিকন্তু সেই সকল স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ যদি সেই জাগরিত পুরুষেরই অংশস্বরূপ হয়,—তাহারই নানাপ্রকার প্রকটিত বিভূতিমাত্র হয়, তবে স্বপ্নদ্রষ্টার অসংখ্য পুরুষরূপে নানাবিধ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলভোগ, যেমন সেই জাগরিত পুরুষ সম্বন্ধে ক্রীড়া মাত্র বলিয়া যথার্থ পক্ষেই বর্ণনা করা যাইতে পারে, তদ্রূপ জগদ্ব্যাপারও ব্রহ্মের লীলা-মাত্র; এই লীলা তাঁহার নিত্য স্বরূপান্তর্গত হওয়ায়, তৎসম্বন্ধে তাঁহার প্রবর্তক অপর কোন কারণেরও অপেক্ষা নাই এবং ইহাতে তাহার কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষও স্পর্শ করে না।

(৩) শাস্ত্রীয় উপদেশ-সকলের ব্যাখ্যা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য,—কেবল তর্কজাল বিস্তার করা এই গ্রন্থের অভিপ্রেত নহে; সুতরাং শাস্ত্রের মর্ম্ম উপযুক্তরূপে ধারণা-বিষয়ে সাহায্যের নিমিত্তই এই সকল আপত্তির মীমাংসা সংক্ষেপতঃ উক্ত হইল। নাস্তিক মত অনেক আছে; তাহা যে অমূলক, ঋষিগণই দর্শনশাস্ত্রবিচারে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন; "দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা" নামক গ্রন্থ-পাঠে তাহা বোধগম্য হইবে। এই স্থলে সংক্ষেপতঃ এইমাত্র বলা যাইতেছে যে—

(ক) জীব যে স্থূল শরীরহইতে অতিরিক্ত, ঋষিগণ তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন; তাহা কেহ অপ্রমাণিত করিতে পারে না। স্থূলবস্তু সংযোগে কেহ জীবাত্মা প্রস্তুত করিতে পারে নাই; সুতরাং জীব-চৈতন্য যে শারীরিক স্থূলবস্তু-সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বলিতে কাহারও অধিকার নাই। এই স্থূলদেহের মৃত্যুর পরও যে জীব অবস্থিতি

করেন, স্থূলদেহের লয়ের সহিত যে জীবেরও লয় হয় না, তাহা ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে; মৃত জীবের সহিত যে অপর জীবিত পুরুষের আলাপ ব্যবহার হইতে পারে, তাহাও কেহ কেহ প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছেন; পৃথিবীর সকল দেশে, সকল কালে, সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই, অনেকস্থলে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে; অদ্যাপি তাহা হইতেছে। মৃতজীবকে আকর্ষণ করিয়া, তাহার সহিত আলাপ ব্যবহার করিবার উপায় ঋষিগণ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন; সেই উপায় অবলম্বন করিয়া, ভারতবর্ষে অদ্যাপি কেহ কেহ তাঁহাদের ইচ্ছা পুরণ করিতেছেন; পাশ্চাত্য-প্রদেশেও এক্ষণে অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়া, অনেকে এই বিষয়ে সফল-মনোরথ হইতেছেন। সকলকেই মিথ্যাবাদী অথবা ভ্রান্ত মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন না। যাঁহারা নিজে অনুসন্ধান এবং উপদিষ্ট কর্ম্মের আচরণ না করিয়া, কেবল অহঙ্কারবশতঃ অপর সকলকে ভ্রান্ত অথবা মিথ্যাবাদী বলেন, তাঁহারা তাহাদের নিজের বাক্যের যথার্থতা ও অভ্রান্ততা-বিষয়ে কোন প্রমাণ দিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহারা অপরের বিশ্বাসযোগ্য নহেন। যাহা সাধারণ প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে বিশেষসাধন ও শক্তিসম্পন্ন পুরুষের বাক্যে অশ্রদ্ধা করিবার কোন হেতু নাই। যাঁহাকে অপর সকল বিষয়ে সত্যবাদী বলিয়া জানা যায় এবং যিনি অপরিসীম ধীশক্তিসম্পন্ন, এবংবিধ পুরুষ, অপরের নিকট অনিশ্চিত ও অপ্রকাশিত বিষয় কোন বিশেষপ্রকারে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিলে, বিরুদ্ধপ্রমাণাভাবে কি হেতুতে তাহা অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে? ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ মুক্তকণ্ঠে একবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্থূলদেহের বিনাশের সহিত জীবের বিনাশ হয় না; তাঁহারা মৃত জীবকে নিজশক্তিবলে আহ্বান করিয়া, অপরের দৃষ্টিগোচর করাইয়াছেন বলিয়া, শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; অদ্যাপি কেহ কেহ এইরূপ শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ আছেন বলিয়া অনেকে প্রমাণ পাইয়াছেন। আধুনিক-কালের শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য, গুরুনানক, শ্রীগৌরাঙ্গ, যীশুখ্রীষ্ট, সেইণ্টপল, কন্‌ফিউসিয়াস্, মহাম্মদ প্রভৃতি যে অপরিসীম ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ-ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং তাঁহারা যে সত্যবাদী, স্বার্থত্যাগী ও সত্যানুসন্ধায়ী ছিলেন, তদ্বিষয়েও কাহার কোন মতভেদ নাই; তবে তাঁহারা যে একবাক্যে এই বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিবার কি হেতু হইতে পারে? ভারত-বর্ষীয় যোগিগণ অনেকে জীবিত থাকিতেই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে গমন করিতে পারেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে; এবং কিরূপ সাধন অবলম্বন করিলে, অপরেও এইরূপ শক্তিলাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে উপদেশসকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব যাঁহারা স্থূলদেহাতিরিক্ত-জীবের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহাদের বাক্যে আস্থাস্থাপন করিবার কোন হেতু নাই।

(ক) স্থূলদেহের প্রত্যেক পরমাণু কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, মানসিক চিন্তাসকলও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু জীব-চৈতন্য সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া প্রত্যেক

মনুষ্য বোধগম্য করিয়া থাকে; অসংখ্য অবস্থা আমার অতীত হইলেও "আমি" একই আছি, ইহা প্রত্যেকের আত্মানুভবসিদ্ধ। জীবচৈতন্য জড়বর্গের অতীত না হইলে, এইরূপ আত্মানুভব সিদ্ধ হইতে পারে না। এবঞ্চ অদ্য আমার দেহে যে সকল পরমাণু আছে, তন্মধ্যে একটিও কয়েক বৎসর পরে থাকিবে না, ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবলেও প্রমাণিত হইয়াছে; তবে কাহাকে অবলম্বন করিয়া গত-বিষয়ের স্মৃতি এবং কাহাকে অবলম্বন করিয়া জীবের একত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত থাকে? এই বিষয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, বাহ্য স্থূলদেহ হইতে অতিরিক্ত সূক্ষ্ম মন ও ইন্দ্রিয় আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া স্মৃতি অবস্থিতি করে। সেই স্থূলদেহাতিরিক্ত মনকে অবলম্বন করিয়াই চিন্তাশক্তিও প্রবর্ত্তিত হয়; সুতরাং এই স্থূলদেহাতিরিক্তরূপে যে মনপ্রভৃতি-উপকরণবিশিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ আছে বলিয়া ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যাঁহারা স্থূলদেহকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা যতই অমূলক ও অপ্রমাণিত কল্পনার সৃষ্টি করিয়া স্মৃতিপ্রভৃতি ব্যাপার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করুন; কিন্তু তৎসমস্ত সম্যক্ ব্যাখ্যা করিতে তাঁহারা কখনই সমর্থ হয়েন না এবং প্রত্যেক জীবে সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অনবরত পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে আত্মপ্রতীতি দৃষ্ট হয়, তাহা কোন প্রকারে কেবল জড়ত্ববাদ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তীপাদে ও অপরাপর স্থানে আরও বিশেষ বিচার করা হইয়াছে। অতএব জীবচৈতন্য জড়বর্গ হইতে স্বতন্ত্র নহে বলিয়া যে নাস্তিক মত, তাহা আদরণীয় নহে। সর্ব্ববিধ ধাম্মিকবর্গের উপদেশে উপেক্ষা করিয়া এই নাস্তিকতাবাদ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন প্রকার প্রমাণ নাই।

(৩) জড়প্রকৃতি যে জগৎকারণ নহে, ঈশ্বরই যে জগৎকারণ, তাহা বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত করা হইয়াছে; সুতরাং এই স্থলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিচার প্রবর্ত্তনা করা অনাবশ্যক ও পুনরুক্তিমাত্র। সাধারণতঃ এইস্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বনিষেধক কোন প্রমাণ নাই; এবঞ্চ কেবল তর্ক-দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত অথবা অপ্রমাণিত হইতে পারে না; কারণ সাধারণ তর্ক সমস্তই প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত; সেই প্রত্যক্ষ সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অতীত; সুতরাং সাধারণ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত তর্কবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত অথবা অপ্রমাণিত হইতে পারে না। তবে সাধারণ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ঈশ্বরাস্তিত্ব স্থাপনের অনুকূল,—প্রতিকূল নহে; এই পর্য্যন্ত তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে এবং ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, এই তর্কবলে ঈশ্বরের অস্তিত্বাভাব কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না। দার্শনিক-বিচারে ইহা পরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাঁহারা "অজ্ঞেয়ত্ববাদী" অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব কিছুই স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের নিকট বক্তব্য এই যে, তর্কবলে যে ঈশ্বরাস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত হয় না, ইহা সত্য।

এক্ষণে প্রকৃতিলীন জীব ও মুক্তপুরুষের প্রভেদ-সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা উল্লেখপূর্ব্বক এইপাদ শেষ করা যাইতেছে।

প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ে জগৎ অব্যক্ত-প্রকৃতিরূপ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং জীবসকলও তৎকালে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অভাবহেতু ব্রহ্মে লীন হইয়া,

---

কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত তর্কই সত্যের অবধারণ বিষয়ে মনুষ্যের একমাত্র সহায় নহে। বিশেষ বিশেষ সময়ে ভগবৎ-শক্তি প্রকাশিত হইয়া, বিশেষ বিশেষ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মনুষ্যের নিকট ঈশ্বরাস্তিত্ব ও তদ্দর্শন-প্রণালী প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং উপদিষ্ট সাধন অবলম্বনে সিদ্ধমনোরথ হইয়া, ঐ সকল বিশেষ মনুষ্য ঈশ্বরদর্শন লাভ করিয়া অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াছেন। অপরের অজ্ঞাতবিষয়ে তাঁহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিবার কোন হেতু নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা তাঁহাদের উপদেশের অনুসরণ করিয়া, সাধনাবলম্বন করেন, অদ্যাপি তাঁহাদের নিকট উক্ত উপদেশসকলের সত্যতা প্রকাশিত হয়। অতএব "অজ্ঞেয়ত্ববাদ" অবলম্বনে ভজন উপাসনাবিষয়ে উদাসীন হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। আমার এই স্থূলদেহে যেমন "আমি-নামক" একটি জীবচৈতন্য অধিষ্ঠিত থাকাতেই, এইদেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের কর্ম্ম দৃষ্টিতঃ বিভিন্ন হইলেও, তৎসমস্ত একেরই অভীষ্টসাধক, তদ্রূপ অসংখ্য দৃষ্টিতঃ পৃথক্ পৃথক্ অংশে এই বিশ্ব বিভক্ত হইলেও, জীব জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৎসমস্ত সম্মিলিতভাবে একই অধিষ্ঠাতা চৈতন্যময় পুরুষে অভীষ্টসাধক বলিয়া, জানিতে পারে। এই অনন্ত বিশ্বের যে সর্ব্বাংশ একই নিয়মতন্ত্রে গ্রথিত, তাহা এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবলেও সপ্রমাণ হইয়াছে। প্রত্যেক জীবদেহের কার্য্যের শৃঙ্খলা-দর্শনে যেমন প্রত্যেকদেহে এক এক জীবের অধিষ্ঠান থাকা জানা যায়, তদ্রূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ অনন্ত বিশ্বরূপ দেহেরও অধিষ্ঠাতা এক চৈতন্যময় পুরুষ আছেন, ইহা সহজ অনুমান। ভিন্ন ভিন্ন জীবের কৃতকর্ম্মও সম্মিলিতভাবে বিশেষ বিশেষ অভীষ্টসাধক বলিয়া, জ্ঞানচর্চ্চার বৃদ্ধির সহিত, সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং সকল জীবের নিয়ামক যে এক চৈতন্যময় পুরুষ আছেন, এই অনুমান অলঙ্ঘনীয়। এইরূপ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, ভিন্ন ভিন্ন জীবের বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে, স্বীয় অবিদিতভাবে, প্রবৃত্তি হওয়া, এবং তৎফল প্রাপ্ত হওয়া কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না। অতএব ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনুমান যতদূর সম্ভব ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষাতীত এই চৈতন্যময় পুরুষের অস্তিত্ব সাধনেরই অনুকূল। অতএব অনুমানও এই চৈতন্যময় বিশ্বব্যাপীপুরুষের অস্তিত্ব-বিষয়ক মহাপুরুষবাক্যের সম্পূর্ণ অনুকূল। এই পুরুষকেই শাস্ত্রে বিরাট্ পুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এই বিরাট পুরুষের ধ্যান পরিপক্ক হইলে, শাস্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বরধারণা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া পড়ে; অতঃপর ঈশ্বর-বিষয়ক মীমাংসাতে আর সন্দেহ উপস্থিত হয় না। এই বিরাটপুরুষই ভগবানের অনিরুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া শাস্ত্রে আখ্যাত হইয়াছেন।

তৎসহিত একতা প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু পুনরায় সৃষ্টি প্রারব্ধ হইলে, নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় পুনরায় সূক্ষ্মদেহযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ স্থূলদেহ লাভ করিয়া, সংসারে প্রবিষ্ট হয়েন এবং পুনরায় নূতন নূতন কর্ম্ম করিতে থাকেন। প্রকৃতিলীনাবস্থায় প্রকৃত্যাত্মক যে অব্যক্ত জীবদেহ, তাহাকেই কারণদেহ বলিয়া আখ্যাত করা হয়; ঐ দেহ অব্যক্তা প্রকৃতির সহিত অভিন্নভাবে থাকে। পার্থিব জল যেমন সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইয়া, বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া, অদৃশ্য বায়ুর সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়, তৎপরে পুনরায় ঘনীভূত হইয়া প্রথমতঃ অভ্র, তৎপরে মেঘ, তৎপরে জলরূপ ধারণ করিয়া, পৃথিবীতে পতিত হইয়া, পূর্ব্বাবস্থা ধারণ করে; জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহের পরিবর্ত্তনও এইরূপেই সংঘটিত হয়। প্রকৃতিলীনাবস্থায় তাঁহারা মুক্তবৎই হইয়া থাকেন; কারণ তৎকালে তাঁহাদের বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য কোন বিষয় থাকে না। কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের নিকট গুণাতীত নিঃশক্তিক আশ্রয়রূপী পরব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত না হওয়ায়, তাঁহারা তৎকালে প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্ত বলিয়া গণ্য হয়েন না। কেবল দৃশ্যবস্তুসমুদয় তৎকালে অব্যক্তরূপা প্রকৃতিতে লীন হওয়াতে, তাঁহারা দৃক্‌শক্তিরূপেই বর্ত্তমান থাকেন। কিন্তু দৃশ্য কিছু আবির্ভূত হইলেই, তাহা দর্শন করিবেন, এইরূপ উন্মুখতা, তৎকালে তাঁহাদের বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং সৃষ্টি আবির্ভূত হইলে, তাহাতে তাঁহারা পুনরায় আবদ্ধ হয়েন।

মুক্ত পুরুষগণ উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিয়া, সংসারোন্মুখী বহির্ম্মুখী বৃত্তিসকল সম্যক্ নিরুদ্ধ করিয়া, উত্তমপুরুষ ব্রহ্মে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়েন। তাঁহারা সংসার-বাসনা-বিহীন হওয়াতে, প্রকৃতিলীন-পুরুষের ন্যায় তাঁহাদের সংসারোন্মুখতা থাকে না; সুতরাং তাঁহারা উত্তম পুরুষ পরমেশ্বরে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, সম্যক্ অদ্বৈত-ভাবাপন্ন হয়েন। তদবস্থায় গুণাতীত আশ্রয়রূপী ব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হয়েন, এবং তাঁহাদের

সূক্ষ্মদেহও তৎকালে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়। অতএব তাঁহারা ব্রহ্ম-স্বরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁহাদের আর সংসারবন্ধন ঘটে না; তাঁহারাও ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য সগুণ ও নির্গুণ এই দুই ভাবে অবস্থিতি করেন। কিন্তু ঈশ্বর ও তাঁহাদিগের মধ্যে প্রভেদ এই, ঈশ্বর সর্ব্ববিধ দেহ ও সৃষ্টিকার্য্যের দ্রষ্টা ও সাক্ষী নিত্যই আছেন; কিন্তু মুক্তপুরুষ সকল ব্রহ্মময় হইলেও, তাঁহারা ব্রহ্মময় বিশেষদেহযুক্ত হইয়া বিরাজ করেন; তাঁহারা ব্রহ্মভাবাপন্ন হইলেও ব্রহ্মস্বরূপান্তর্গত; তাঁহাদিগের এই বিশেষ-দেহই তাঁহাদিগের মুক্তির পূর্ব্বে বদ্ধজীবাবস্থার পরিচয় প্রদান করে। এই নিমিত্ত তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞতাও আপেক্ষিক; তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞতা ধ্যান-সাপেক্ষ; তাঁহারা ধ্যানমাত্র যে কোন বিষয় জানিতে সমর্থ। কিন্তু ঈশ্বরের যেমন নিত্যই সর্ব্ববিষয় পরিজ্ঞাত আছে, তাঁহাদের তদ্রূপ নহে। সনক-সনন্দাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, ব্যাস ও শুকদেবাদি পরমহংসগণ সকলেই মুক্ত; কিন্তু তাঁহারা সময় সময় ভক্তগণকে দর্শন দিয়া থাকেন। ভক্তপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, নৃসিংহ ইত্যাদি বিগ্রহ, যাঁহাদিগের ভগ-বত্তা সকলশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাঁহারাও ভক্তজনকে দর্শন দিয়া থাকেন। সুতরাং মুক্তাবস্থায় যদিও সর্ব্বপ্রকার দেহাভিমান ও দ্বৈতভাব সম্যক্ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত জগৎই ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি দেহসকলের সম্যক্ বিনাশ হয় না। স্থূলদেহধারী জীবিত ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে এবং এই জীবিতাবস্থায়ই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় বলিয়াই, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের স্থূলদেহের বিনাশ হয়; কারণ স্থূলদেহ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের দ্বারা সঞ্চিত; সুতরাং ভোগদ্বারা সেই কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই, তৎফলস্বরূপ দেহও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানোদয় হওয়াতে তাঁহারা দেহ-সম্বন্ধীয় ভোগে কোন প্রকার লিপ্ত হয়েন না;

ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হওয়াতে, তাঁহারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী হয়েন; অতএব দেহ-সম্বন্ধীয় কোন কর্ম্ম তাঁহাদের জ্ঞানের আবরণ জন্মাইতে পারে না; সুতরাং তাঁহাদের স্থূলদেহ বিনাশ করিতে, তাঁহাদের ইচ্ছারও উদয় হয় না। পরন্তু সর্ব্ববিধ ভোগে তাঁহারা নির্লিপ্ত থাকাতে, স্থূলদেহাবলম্বনে বাসও তাঁহাদের একপ্রকার লীলা মাত্র। স্থূলদেহের বিনাশান্তে তাঁহাদের সূক্ষ্ম দেহের উপকরণসকল সম্যক্ ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়; ব্রহ্মহইতে ভিন্নরূপে ইহাদের অবস্থিতি বিলুপ্ত হয়; সুতরাং প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ও তাঁহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন যে, তাঁহারা "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।" তাঁহারা সৃষ্টি এবং প্রলয়ধর্ম্মাধীন না থাকাতে, তাঁহাদের দেহ প্রাকৃত উপকরণে নির্ম্মিত হইলেও তাহা অপ্রাকৃত। প্রাকৃত সর্ব্ববিধ-রূপই প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে পরব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে; ব্রহ্মের ঐশীশক্তি-প্রভাবে পরে পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হয়; সুতরাং বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের সূক্ষ্মদেহ যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করে, ইহা বিচিত্র নহে। এই নিমিত্ত তাঁহাদের দেহকে শাস্ত্রে অনেকস্থলে অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ তাঁহাদের চিতিশক্তি জীবের ন্যায় কখন আবরিত না হওয়ায়, তাঁহারা ঈশ্বরের ন্যায়, সর্ব্বদা চিন্ময় থাকেন; বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহাদের দেহে অভিমানও নাই এবং হিরণ্যগর্ভের ন্যায় দেহেতে পৃথক্‌বুদ্ধিও নাই; প্রলয়কালে প্রকৃতিলীন পুরুষের ন্যায় তাঁহাদের প্রকাশোন্মুখতাও থাকে না; তাঁহারা সর্ব্বদা অদ্বৈতরূপে বিরাজ করেন। প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ে অপর সকল সূক্ষ্মদেহ অব্যক্তা প্রকৃতিতে লুক্কায়িত হইয়া যায়, এবং পুনরায় সৃষ্টিপ্রারম্ভে প্রকাশ পায়; কিন্তু পরমেশ্বর যেমন প্রলয় ও সৃষ্টি উভয়কালের নিত্যদ্রষ্টা; সুতরাং তাঁহার নিকট সকলই নিত্য

এবং স্বীয় স্বরূপান্তর্গত, মুক্ত পুরুষগণের সম্বন্ধেও এইরূপ। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের দেহেরও বিনাশ নাই; প্রকৃতিতে 'লীন' হইলেও অপরের নিকটই তাহা অব্যক্ত; তাঁহাদের নিকট অব্যক্ত নহে। এই ঈশ্বররূপী মুক্ত পুরুষদিগের অধিষ্ঠানভূত চিন্ময়-দেহ-সমন্বিত ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থিত লোকসকলকে গোলোক, বৃন্দাবন ইত্যাদি নামে কোন কোন পুরাণে উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং ঐ সকল পুরাণে ঐ সকল ধাম নিত্য ও অপ্রাকৃত বলিয়াও উল্লিখিত আছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ে অপর জীবের পক্ষে তাহা বিনষ্ট বলিয়া বোধ হইলেও, তদধিষ্ঠাতা মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধে তাহা নিত্য; সুতরাং প্রাকৃতিক হইলেও এই সকলকে অপ্রাকৃত বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

ফলকথা এই যে, প্রত্যেক জীবই ব্রহ্মের এক বিশেষ প্রকার দৃক্‌শক্তি। ঐ দৃক্‌শক্তি যখন বহির্মুখে প্রবাহিত হয়, তখন কেবল জাগতিক বাহ্যরূপ ও দেহাদি পদার্থসকল ইহার বিষয়ীভূত হয়; এবং তদবস্থায় ঐ জীবকে বদ্ধজীব বলা যায়। প্রকৃতিলীনাবস্থায় জাগতিক সর্ব্ববিধ দেহাদিবস্তু অপ্রকট হইয়া যায়; ঐ দৃক্‌শক্তির বিষয়ীভূত হইতে পারে, এমন কোন বিশেষদেহাদি পদার্থ তৎকালে থাকে না; সুতরাং প্রত্যেক জীবশক্তি তখন স্বরূপে (বিষয়াবলম্বনশূন্য দৃক্‌শক্তিমাত্ররূপে) অবস্থান করে। যখন মুমুক্ষুপুরুষ উপযুক্ত সাধন লাভ করেন, তখন ঐ দৃক্‌শক্তি দেহাদি প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে বিপরীত দিকে আকৃষ্ট হইয়া অন্তর্ম্মুখী হয়; অবশেষে সমস্ত প্রাকৃতিক বিশেষপদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া, যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন স্বীয় স্বরূপপ্রাপ্ত দৃক্‌শক্তির ও আশ্রয়ীভূত পরব্রহ্মস্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়; তিনি তাহাতে লীন হয়েন। ইহাই তাঁহার মুক্তাবস্থা; কারণ ঐ দৃক্‌শক্তি (বিশেষ

জীব) ব্রহ্মরূপতা লাভ করিলে, তাহাহইতে আর চ্যুত হইবার কোন্ কারণ নাই; তখন সর্ব্বত্রই তাঁহার ব্রহ্মরূপতা দৃষ্টিগোচর হয়। বস্তুতঃ কোন একটি দৃক্‌শক্তি (জীব) বিনাশশীল নহে, সকলই অনাদি ও নিত্য। মুক্তাবস্থায়ও প্রত্যেক দৃক্‌শক্তি অবস্থান করে এবং জীবের সূক্ষ্মদেহও অবস্থান করে; কিন্তু উভয়ের প্রতিষ্ঠাস্থান যে পরব্রহ্ম, তাহা মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত জীবের সাক্ষাৎকার হওয়াতে, তিনি ভেদবুদ্ধি হইতে সম্যক্ বিবর্জ্জিত হয়েন এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়েন। সূক্ষ্মদেহ-সমন্বিত জীব নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত স্থূলদেহকে আশ্রয় করেন; সুতরাং জীবিত কালে মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত হইলেও ঐ দেহসংযোগ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় না; কারণ তাহা বিনাশ করিবার নিমিত্ত বিশেষ কোন কারণ মুক্তাবস্থায় উপজাত হয় না। মুক্তপুরুষ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী হওয়াতে ঐ স্থূলের স্থিতিকাল খর্ব্ব করিতে তাঁহাদের বিশেষ কোন ইচ্ছার উদয় হয় না। স্থূলদেহ-সম্বন্ধ প্রত্যেক জীবের পক্ষেই অস্থায়ী হওয়াতে, তাহা মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধেও চিরপ্রকটিত থাকে না। অতএব অবধারিত কালাবসানে তাহা পতিত হয়। স্থূলদেহাবলম্বী মুক্তপুরুষকে জীবন্মুক্ত বলা যায় এবং স্থূলদেহের অবসান হইলে, তাঁহাদিগকে বিদেহমুক্ত বলা যায়। বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের ব্যাখ্যানে জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের স্বরূপ বিশেষরূপে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে; উক্ত ব্যাখ্যান পাঠ করিলে, তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান হইবে।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, নিয়ত-সর্ব্বজ্ঞতা দ্বারা ঈশ্বররূপী ব্রহ্মের জীব হইতে ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু নিবিষ্ট হইয়া, চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে যে, ঈশ্বরের এই নিয়ত-সর্ব্বজ্ঞতা বদ্ধজীবের সম্যক্ বুদ্ধিগম্য নহে। ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম প্রকৃতপ্রস্তাবে অনির্ব্বচনীয়; তিনি বাক্য ও মনের অগোচর; কারণ বাক্য ও মনের শক্তি

সীমাবদ্ধ। তিনি অপরিসীম। এই পর্য্যন্তই আমরা বলিতে পারি যে, জীব-সমন্বিত ত্রিকালাত্মক জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মস্বরূপ এবং ইহাকে অতিক্রম করিয়াও তিনি আছেন। কিন্তু তাঁহার জগদতীত স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। এই ঈশ্বরাখ্য ব্রহ্ম কোন প্রকার যুক্তিতর্কের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারেন না; কারণ যে সকল দৃষ্টান্তদ্বারা যুক্তিতর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তৎসমস্ত হইতে বিরূপ। কেবল শ্রুতিবাক্যে তাঁহার অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে জানা যায়, এবং শ্রুতির উপদিষ্ট সাধনপ্রণালী সদ্‌গুরুমুখে অবগত হইয়া, তাহা অবলম্বন করিলে, এই গুণাতীত গুণাশ্রয় ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন। এইরূপে তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া, ভারতবর্ষীয় আচার্য্য ঋষিগণ স্মৃতিমুখে তাঁহার অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। এইক্ষণে পরবর্ত্তী পাদে মূল, শ্রুতি ও স্মৃতি-বাক্যসকল কিঞ্চিৎপরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা যে প্রণালীতে ভারতবর্ষে প্রথমে উপদিষ্ট হইয়াছিল, তাহার দিগ্দর্শন করা হইবে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যা নামক তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥

ওঁ তৎ সৎ ॥

ওঁ হরিঃ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ—

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ।

ব্রহ্মবিদ্যার প্রমাণ।

এক্ষণে শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যসকলের পর্য্যালোচনাদ্বারা সংক্ষেপতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে।

(১) শ্রুতি।

শ্রুতি বলিতেছেন :—

১। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" (বৃহদারণ্যক)।

২। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।
স ইমাল্লোঁকানসৃজত।" (ঐতরেয়োপনিষৎ)॥

৩। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি॥" (ছান্দোগ্য)।

এইসকল স্থানে 'ইদম্'-শব্দ চরাচরবিশ্ববোধক। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন—"এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন।"

ঐতরেয়শ্রুতি বলিতেছেন,—"এই বিশ্ব অগ্রে এক আত্মারূপে অবস্থিত ছিল; অন্য কিছুরই স্ফুরণ ছিল না; পরে সেই আত্মা এইরূপে ঈক্ষণ (দৃষ্টি) করিলেন, লোকসকলকে সৃষ্টি করিব কি? পরে তিনি লোকসকল সৃষ্টি করিলেন।"

ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন—"হে সৌম্য! এই জগৎ অগ্রে (অর্থাৎ নাম ও রূপদ্বারা পৃথকৃরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে) ভেদরহিত একমাত্র সদ্বস্তুরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল; সেই সৎ ঈক্ষণ (মনন) করিয়াছিলেন 'আমি বহু হইব; আমার বহুরূপে সৃষ্টি হউক।'"

এইসকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের সম্বন্ধে চারিটি অবস্থা বর্ণিত হইল; জগৎ পৃথকৃরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, প্রথমে ব্রহ্মমাত্র সদ্বস্তু ছিলেন; জগৎ যে ছিল না, তাহা নহে; জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে বর্ত্তমান ছিল; ব্রহ্ম হইতে পৃথকৃরূপে কিছুরই স্ফুরণ ছিল না; কোনপ্রকার স্পন্দন বা ক্রিয়া তৎকালে প্রকাশ পায় নাই (নান্যৎ কিঞ্চিনমিষৎ)। এইটি প্রথম অবস্থা। ইহা বর্ণনা করিয়া, শ্রুতি পরে ব্রহ্মের সৃষ্টিবিষয়ক ঈক্ষণশক্তি-যুক্ততা বর্ণনা করিলেন। এই দ্বিতীয়াবস্থায় প্রকাশিত ঈক্ষণ-শক্তির স্বরূপ ঐতরেয়শ্রুতি এইরূপে ব্যাখ্যা করিলেন যে, ইহা "সৃষ্টি করিব কি" এই সৃষ্টিবিষয়ক উন্মুখতা মাত্র। অধিকন্তু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহা করিতে পারেন, এইরূপ শক্তিবোধও ঐ ঈক্ষণশক্তির সহিত তদবস্থায় সন্নিবিষ্ট আছে; ইহাই জগতের বীজশক্তি; ইহা ঐ দ্বিতীয়াবস্থায় ঈক্ষণশক্তির অঙ্গীভূত হইয়া আছে ("স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি")। অতঃপর তৃতীয়াবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া, ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিলেন যে, বহু হইবার নিমিত্ত নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি প্রথমে ব্রহ্মে উদয় হইল। ঐতরেয় শ্রুতি বলিলেন যে, অবশেষে চতুর্থাবস্থায় তিনি বহুরূপী জগৎকে প্রকাশিত করিলেন। প্রথমাবস্থায় জগৎ ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ এক হইয়া, ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে; দ্বিতীয়াবস্থায় "ঈক্ষণশক্তি" উদ্বুদ্ধ হয়, এবং জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথকৃভাবে প্রকাশিত হইবার বীজ ব্রহ্মে প্রকাশিত ঈক্ষণশক্তির সহিত মিলিত হইয়া, অপ্রকাশভাবে থাকে; তৃতীয়াবস্থায় ব্রহ্মে সৃষ্টি-বিষয়িণী নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়; এবং সর্ব্বশেষে চতুর্থাবস্থায়

জগৎ স্পষ্টরূপে পৃথক হইয়া ভাসমান হয়। প্রথমাবস্থা ব্রহ্মের সম্যক্ নিষ্ক্রিয়াবস্থা; দ্বিতীয়াবস্থা তাঁহার ঈক্ষণশক্তিবিশিষ্ট অবস্থা, যাহাকে জগৎপ্রকাশোন্মুখাবস্থাও বলা যাইতে পারে; তৃতীয়াবস্থা নিশ্চয়বুদ্ধি-যুক্তাবস্থা; এবং চতুর্থাবস্থা পৃথক্‌রূপে জগতের সৃষ্টিসম্পাদনাবস্থা। এই চতুর্ব্বিধ অবস্থায় ব্রহ্ম পূর্ণ। জীবজ্ঞানে এই সকল অবস্থা পরপর প্রকাশিত হয়; পরন্তু সকল অবস্থাই ব্রহ্মের নিত্যস্বরূপান্তর্গত। তাহা ধারণা করা কঠিন; সুতরাং শ্রুতি তাহা পৃথক্ করিয়া পরপর ভাবে জীববুদ্ধির অনুগামিরূপে প্রকাশিত করিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের প্রথমে ও উপসংহারাংশে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এই অবস্থাভেদ বোধগম্য করা বিষয়ে সাহায্য হইবে।

ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত প্রথমাবস্থার বিচারে দেখা যায় যে, শ্রুতিসকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই চরাচর জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মই একমাত্র সৎপদবাচ্য। জগৎ যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে; ("ইদং" জগৎ) ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল ("ব্রহ্ম আসীৎ"); শ্রুতি বলিলেন, ঐ প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মই একমাত্র সত্তাশীল; জগৎ তাঁহা হইতে অভিন্ন; তিনি চরাচর সকলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া রহিয়াছেন। এই প্রথম অবস্থাই বিশেষভাবে ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা বলিয়া আখ্যাত হয়। ব্রহ্মের এই স্বরূপাবস্থা সম্বন্ধে শ্রুতি বলিলেন, "নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ"; অর্থাৎ তদবস্থায় অন্য কিছুরই স্ফুরণ ছিল না; তদবস্থায় কোন প্রকার শক্তির প্রকাশ নাই, কার্য্য নাই। সৃষ্টিবিষয়িণী "ঈক্ষণ"-শক্তি, যাহা, পরে প্রকাশিত হইল বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রহ্মের উক্ত স্বরূপাবস্থায়, তাহারও কোন কার্য্য নাই। কিরূপেই বা থাকিবে? তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন :—

"যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং

পশ্যেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ; যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি।" (বৃহদারণ্যক)।

অস্যার্থ:—যখন এই আত্মার সম্বন্ধে সকলই আত্মাই ছিল, (যখন সমগ্র বিশ্ব আত্মাহইতে পৃথক্ হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, সমস্তই আত্ম-স্বরূপে অবস্থিত), তখন কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কে কাহাকে অনুভব করিবে? যাঁহাদ্বারা এই সকল জানা যায়, তাঁহাকে কে জানিবে, যিনি স্বয়ং একমাত্র বিজ্ঞাতা, সেই পরমাত্মাকে আর কে কি চিহ্ন দ্বারা জানিবে?

তদবস্থায় যে পৃথক্‌রূপে কিছুমাত্র শক্তির স্ফুরণ নাই, যদ্দ্বারা পর-মাত্মাকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন:—

"আসীদিদন্তমোভূতম্"

এই চরাচর বিশ্ব প্রথমে "তমো"-মাত্র ছিল; অর্থাৎ তখন কিছুরই প্রকাশ ছিল না। সর্ব্বপ্রকার গুণ এবং শক্তি, যদ্দ্বারা কোন বস্তু প্রকাশ পায়, তৎসমস্তই অপ্রকাশ ছিল। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৩৪৭ অধ্যায়ে বেদব্যাস স্বয়ং উক্ত বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা;—

"অব্যক্তে পুরুষং যাতে, পুংসি সর্ব্বগতেঽপিচ। তম এবাভবৎ সর্ব্বং ন প্রজ্ঞায়েত কিঞ্চন। তমসো ব্রহ্মসম্ভূতং তমো মূলামৃতাত্মকম্"। (অব্যক্তা প্রকৃতি পুরুষে লীনা হইলে, এবং পুরুষ সর্ব্বাত্মক পরব্রহ্মে লীন হইলে, সমুদয় তমোময় হইল, তখন আর কিছুমাত্র প্রকাশিত রহিল না। এই তমঃ হইতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা প্রকাশিত হইলেন; এই তমঃ পরমামৃত পরব্রহ্মাত্মক তাঁহারই স্বরূপ। সুতরাং পরব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা কোন বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত

করা যায় না। তবে তিনি সদ্বস্তু,—আছেন,—"নাই" নহেন, এইমাত্রই তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে; তদতিরিক্ত কিছু নাই; অতএব তিনি অনন্ত পূর্ণাদ্বৈত; তাঁহাকে বিভাগ করা যায় না; কারণ সকলই তিনি, কাহা হইতে কে কাহাকে বিভাগ করিবে? এবং কি চিহ্ন দ্বারাই বা বিভাগ করা যাইবে? ব্রহ্মমাত্রই বস্তু। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন;—

"অত্র হ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি"

সমস্ত বিশেষণই আত্মাতে একতা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং আত্মা নির্ব্বিশেষ, অর্থাৎ কোন বিশেষ লিঙ্গ (চিহ্ন) দ্বারা তাঁহাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। অতএব শ্রুতি পুনরায় বিশেষরূপে বলিতেছেন;—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে"॥ (কঠোপনিষৎ)॥

তিনি শব্দরহিত, স্পর্শরহিত, রূপরহিত, ক্ষয়রহিত, রসরহিত, গন্ধ রহিত, তিনি অনাদি, অনন্ত, মহৎ হইতেও মহৎ, ধ্রুব; এইরূপ তাঁহাকে জানিয়া সাধক অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

অতএব যাহা কিছু প্রত্যক্ষীভূত অথবা অনুমিত বস্তু, পরমাত্মা, তাহার অননুরূপ; সুতরাং শ্রুতি বলিয়াছেন;—

"স এষ নেতি নেত্যাত্মা গৃহ্যো" (বৃহদারণ্যক ৪র্থ অধ্যায় ২য় ব্রাহ্মণ) যাহা কিছু দৃশ্যানুমিত বস্তু, তদ্রূপ তিনি নহেন; কেবল ইহা নয়, ইহা নয়, এইরূপেই তাঁহাকে জানা যায়।

পরন্তু শ্রুতি পরব্রহ্মসম্বন্ধে আবার এইরূপও বলিয়াছেন দেখা যায় যে,—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)।

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত। নিম্নোক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পরমাত্মাকে আনন্দস্বরূপও বলা হইয়াছে, যথা :—

"ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং—পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।...তং হোবাচ।

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা......আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

অস্যার্থঃ—বরুণের পুত্র ভৃগু; তিনি পিতা বরুণের নিকট গমন করিলেন, বলিলেন,—ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। তাঁহাকে বরুণ বলিলেন, যাঁহা হইতে এই ভূতগ্রাম সৃষ্ট হইয়াছে, যৎকর্তৃক জাত জীবসকল জীবিত আছে, যাঁহাতে জীবসকল পুনরায় প্রত্যাগত হয় এবং লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে তুমি বিশেষরূপ জ্ঞাত হইতে যত্ন কর, তিনিই ব্রহ্ম। তখন ভৃগু ধ্যান নিমগ্ন হইলেন, এবং ধ্যান করিয়া জানিলেন যে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, সেই আনন্দস্বরূপ হইতেই এই সমস্ত প্রাণিবর্গ জাত হইয়াছে, এই আনন্দকর্তৃকই জীবসকল জীবিত আছে, এবং সেই আনন্দতেই পুনরাবর্ত্তিত ও লীন হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সকল শ্রুতিতে, এবং এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিতে, ব্রহ্মকে যে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও অনন্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষরূপে নির্দ্দেশিত করা শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া বুঝিতে হইবে না; ব্রহ্ম যে জীব ও জড়বর্গের অতীত, তাহাইমাত্র শ্রুতির অর্থ। পরব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদের স্ফুরণ নাই, কেবল "নেতি নেতি" এইরূপ বিচার দ্বারা দৃষ্ট ও কল্পিত পদার্থসকলহইতে তাঁহাকে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়। পরব্রহ্ম দৃশ্যমান জড়বর্গের ন্যায় জড় নহেন, এই অর্থে

মাত্র তিনি জ্ঞানস্বরূপ; জীব ও জড় জগতের ন্যায় অসর্ব্বব্যাপী সীমাবদ্ধ ও আকৃতিবিশিষ্ট নহেন, এই অর্থে তিনি অনন্ত; জীবের ন্যায় অনাদি বাসনা ও অভাব এবং অজ্ঞানদ্বারা ক্লিষ্ট নহেন, এই অর্থে তিনি আনন্দস্বরূপ।: জ্ঞেয়বস্তুর সহিত সম্বন্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া, জ্ঞানশব্দ বোধগম্য হয়; অথবা ইহা কেবল একটি জ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তিমাত্র বুঝায়; কিন্তু পরব্রহ্ম সর্ব্বময় সর্ব্বাত্মক; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞেয় বলিয়া পৃথক্ বস্তু নাই; পরব্রহ্ম জ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তিও নহেন, তাঁহাকে এইরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা উক্ত শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। তদ্রূপ আনন্দও কোন ভোগ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধে বোধগম্য হয়, এবং তাহা চিত্তের বৃত্তিসকলের অবাধে চলনশীলতাকেও বুঝায়। * কিন্তু পরব্রহ্ম তৎস্বরূপ নহেন; তাঁহাকে তদ্রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা শ্রুতির কথনও অভিপ্রায় হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতিতে তৎসমস্তেরই লয় উক্ত আছে। অতএব সর্ব্বপ্রকার জীবধর্ম্ম হইতে অতীত বলিয়া তাঁহাকে বর্ণনা করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে।

এইরূপ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "সৎ" বস্তু অথবা সত্যস্বরূপ বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে, তাহাও তাঁহার স্বরূপনির্দ্দেশ করিবার জন্য নহে। "সৎ" শব্দে সাধারণতঃ স্থিতিশীল বুঝায়। কিন্তু স্থিতিশীল বলিলেই আমরা কোন পরিচ্ছিন্ন আকারবিশিষ্ট বস্তুর ধারণা করিয়া থাকি। পরন্তু পরব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন অসীম, সুতরাং আকাররহিত। শ্রুতি যে তাঁহাকে "সৎ" বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, তিনি সৃষ্টজীবের ও সৃষ্টবস্তুর ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নহেন; তিনি অচল, ধ্রুব। তিনি "সৎ", বিশ্ব "জগৎ"। গম্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া জগৎ শব্দ সাধিত হইয়াছে। ইহার অর্থ গমনশীল, পরিবর্ত্তনশীল; জগৎ নিয়তই

---

* প্রগাঢ় সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন বাহ্যবস্তুর জ্ঞান থাকে না, জ্ঞান স্বনিষ্ঠ হয়। তখন চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানধারা প্রবাহরূপে চলিতে থাকে। তৎকালে নিরবলম্ব, অনুপম আনন্দ অনুভূত হয়। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি পরে যোগসূত্রে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ঈশোপনিষদে শ্রুতি বলিয়াছেন, "যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" (জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই পরিবর্ত্তনশীল), এই অর্থে জগৎকে "অসৎ" বলিয়া শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু পরব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনশীল, সর্ব্বদাই এক অবিচলিতরূপে এবং যথার্থই স্থিত আছেন। এই বিশেষ অর্থেই শ্রুতি তাঁহাকে "সৎ" বলিয়া আখ্যা করিয়াছেন। পরব্রহ্মস্বরূপের এই একান্ত অদ্বৈতত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে "নির্গুণ" বলিয়া বর্ণনা করা হয়; কারণ, গুণ অথবা গুণী বলিয়া কোন প্রকার ভেদ ব্রহ্মের উক্ত স্বরূপে বর্ত্তমান নাই; ব্রহ্মের এই অবিচলিত সত্তার সহিত একরস হইয়া জগৎ অভিন্নরূপে বিদ্যমান আছে।

পরন্তু পরব্রহ্মস্বরূপ একদিকে এইরূপ হইলেও পূর্ব্বোদ্ধৃত তৈত্তিরীয় এবং অপরাপর শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ("যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি") সমগ্র বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই জীবিত থাকে এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পরব্রহ্মে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়-সম্পাদিকা শক্তি যে বিদ্যমান আছে, তাহাও শ্রুতি স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত শক্তির প্রকাশোন্মুখাবস্থাই দ্বিতীয়াবস্থা বলিয়া এই পাদের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। এই শক্তি যখন জগতের উৎপত্তির মূল, তখন ইহা পরব্রহ্মেরই স্বরূপান্তর্গত শক্তি; এই শক্তিদ্বারা তিনি জগৎ প্রকাশিত করেন, এবং প্রকাশিত করিয়া তাহা ধারণ ও নিয়মন করেন। অবশেষে ইহার লয়ও সম্পাদন করেন। পরব্রহ্মের এই শক্তিকে ঐশী শক্তি বলে এবং পরব্রহ্ম এই ঐশীশক্তিসম্পন্ন হওয়াতে, তিনি "ঈশ্বর" এবং "পরমেশ্বর" নামে অভিহিত হয়েন। ব্রহ্মাশ্রিত এই ঐশী শক্তি হইতে জগৎ প্রকাশিত হয়, এই শক্তিতেই আশ্রিত হইয়া জগৎ অবস্থিতি করে, এবং ইহাতেই জগতের লয় হয়; জগতের

অন্য কোন উপাদান নাই। এই শক্তিহইতে উৎপত্তি প্রাপ্ত হওয়াতে, এই জগৎ উক্ত শক্তিরই পরিণাম অর্থাৎ রূপান্তরমাত্র; সুতরাং জগৎ গুণস্বরূপ (শক্তি ও গুণ উভয় শব্দ এইস্থলে একই অর্থব্যঞ্জক)। পরমেশ্বর এই গুণরূপ-বিশ্বের আশ্রয়স্থান; বিশ্ব গুণ, তিনি গুণী; বিশ্ব শক্তিস্বরূপ, তিনি শক্তিমান্। কোন আশ্রয় ভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে না; গুণ বলিলেই কাহারও গুণ বুঝায়, এবং শক্তি বললেই কাহারও শক্তি বুঝায়; পরব্রহ্ম সেই গুণী এবং শক্তিমান্, নিত্য সদ্বস্তু; বিশ্ব তাঁহার গুণ অথবা শক্তি। কিন্তু এতদ্দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, পরব্রহ্মের ঐশী শক্তি বিশ্বরূপেই পর্য্যন্ত; বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া, তিনি তাঁহার স্বরূপগত ঐ শক্তিবলে বিশ্বকে ধারণ ও নিয়মিত করেন এবং প্রলয়কালে তাহা আপনাতে আকর্ষণ করিয়া লীন করেন। অতএব বিশ্ব ঐশী শক্তির একাংশ মাত্রের বিকাশ। সুতরাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,— "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। গুণী হইতে পৃথক্রূপে গুণ অথবা শক্তি অবস্থিতি করিতে পারে না; সুতরাং জগৎও ব্রহ্মাশ্রয় ভিন্ন পৃথক্রূপে অবস্থিতি করিতে পারে না। পরন্তু গুণী বস্তুর সত্ত্বা গুণের দ্বারা পর্য্যাপ্ত নহে; গুণকে অতিক্রম করিয়া গুণী বস্তুর স্বরূপ বর্ত্তমান থাকে। পরব্রহ্মও সুতরাং স্বরূপতঃ তাঁহার গুণসকল হইতে অতীত হইয়াও আছেন। ইহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে; যথা :—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ"॥

৯ম অঃ ৪র্থ শ্লোক॥

অন্বয়ার্থ :—অব্যক্তরূপে আমি এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছি;

চরাচর ভূতসমুদায় আমাতে অবস্থিত; কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি (আমি তৎসমস্ত অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছি)।

এইরূপে পরব্রহ্মকে একদিকে গুণাতীত (নির্গুণ), অপরদিকে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বাশ্রয়, চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বোধগম্য করিলে, সমস্ত শ্রুতি সমন্বিত হয় এবং ইহা প্রকাশ করাই সমস্ত শ্রুতির অভিপ্রায়। শ্রুতি তাঁহার "ঈশ্বর" অথবা "পরমেশ্বর" নাম দ্বারা তদীয় এবংবিধ স্বরূপই জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া, দ্বিতীয় আর কোন বস্তু নাই; এই নিমিত্ত তিনি "পরম অদ্বৈত"; তিনি সর্ব্বব্যাপক, এই অর্থে "বিষ্ণু"; তিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ও স্থিতিশীল, এই অর্থে "কৃষ্ণ"; সকল প্রকার শক্তি ও গুণ তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, এই অর্থে "রুদ্র"; তিনি বৃহৎ অপেক্ষাও বৃহৎ, এই অর্থে 'ব্রহ্ম"। তিনি পূর্ণ, অপর কিছুর অপেক্ষা করেন না, এই অর্থে তিনি "পুরুষ" অথবা "পরম পুরুষ' অথবা "উত্তম পুরুষ"। অতএব পরব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিতে, তাঁহাকে একদিকে নির্গুণ—বাক্যমনের অগোচর, অপরদিকে সর্ব্বশক্তিমান্ সগুণ বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়; নির্গুণ সগুণ এই উভয়রূপে তিনি পূর্ণ।

গুণাত্মক জগতের আশ্রয়রূপে যে অনির্দ্দেশ্য কোন সদ্বস্তু বর্ত্তমান আছেন, তদ্বিষয়ে সকল জীবেরই স্বাভাবিক-আত্মপ্রতীতি আছে; তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে :—

আমি একটি বৃক্ষ দেখিতেছি,—এই বাক্যের অভিপ্রায় বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ একটি বিশেষরূপ আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপটিই যে বৃক্ষ, তাহা আমার ধারণা নহে; বৃক্ষ-নামক একটি স্বতন্ত্র বস্তু আছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার গুণরূপে এই রূপটি বিদ্যমান আছে; এই রূপের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে ও নিয়ত ঘটিতেছে; যথা—তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ও নিয়ত হইতেছে,

এবং ইহার অপরাপর গুণসকলেরও এইপ্রকার নিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; কিন্তু বৃক্ষরূপ বস্তু, যাহা উক্ত রূপাদির আশ্রয়, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে আছে, ইহাই আমার ও অপরসকলের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা। রূপের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর নামেরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে; যেমন এক সময়ে যে বস্তুর নাম মৃত্তিকামাত্র, পরক্ষণে তাহারই নাম সরাব, ঘট, কলস ইত্যাদি হইতে পারে; কিন্তু সকল নামেরই অন্তরালে পরিবর্ত্তনশীল রূপাদিব্যতিরিক্ত তদ্রাশ্রয়রূপে কোন এক বস্তু সর্ব্বদা একভাবে বর্ত্তমান আছে, ইহা সকল মনুষ্যেরই স্বভাবসিদ্ধ ধারণা। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনরহিত আশ্রয়বস্তু, যাহাকে অবলম্বন করিয়া রূপাদি গুণসকল বর্ত্তমান আছে, তাহার স্বরূপ কি, তাহা কেহ অবধারণ করিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু এরূপ যে একটি বস্তু আছে, তাহাইমাত্র সকলের স্বভাবসিদ্ধ ধারণা। শ্রুতি বলিতেছেন যে, সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাশ্রিত, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাঁহারই শক্তি অথবা গুণমাত্র; অর্থাৎ যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় অথবা অনুমান করা যায়, তৎসমস্তই কোন এক বস্তুর গুণ; সেই গুণী বস্তু অপরিবর্ত্তনীয় সদ্বস্তু; তিনি সর্ব্বপ্রকার গুণ ও গুণকার্য্যের অতীত হওয়াতে, জাগতিক গুণাত্মক কোন বস্তুদ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশিত করা যায় না, কোন বাহিরের চিহ্নদ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, কারণ ঐ স্বরূপের সদৃশ বস্তু আর নাই; সেই পরমাশ্রয় বস্তুই ব্রহ্ম। আশ্রয়বস্তুর অস্তিত্ববিষয়ে আমাদের যে স্বাভাবিক ধারণা আছে, তাহা মিথ্যা নহে। পরন্তু কোনপ্রকার কল্পনা দ্বারা সেই আশ্রয়বস্তুর স্বরূপ জানা যায় না, কেবল শ্রুতিপ্রদর্শিত সাধন অবলম্বন করিয়া মনুষ্যলোকে ভারতবর্ষের আর্য্যঋষিগণ তাঁহাকে অবগত হইয়াছিলেন। সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমাশ্রয় পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞান হইলে, জীব সম্যক্ অজ্ঞানতার পাশ হইতে মুক্ত হইয়া, অজ্ঞানজনিত অবশ্যম্ভাবী ক্লেশসমূহ

হইতে বিমুক্ত হয় ও পরমানন্দ লাভ করে। পরব্রহ্মকে এইরূপ নিত্য সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া জানিলে, সহজেই ইহা বোধগম্য হয় যে, তিনি শব্দাতীত, স্পর্শাতীত, রূপাতীত, রসাতীত, অক্ষয় এবং জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিহীন এবং নির্গুণ; সুতরাং যিনি সেই পরমাশ্রয় পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি যথার্থই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ এবং তিনি জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি গুণগত অবস্থা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বাশ্রয় বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত "অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে এই সত্যই প্রকাশ করা হইয়াছে। আবার গুণসকল ব্রহ্মেরই, এবং তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়; সুতরাং ব্রহ্ম সগুণও বটেন। অতএব সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয়ই ব্রহ্মের সম্বন্ধে বাচ্য।

পরব্রহ্মের স্বরূপগত দ্বিরূপতা উক্ত হইল; এক্ষণে এই পাদের প্রারম্ভে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসকলের বিশেষ ব্যাখ্যাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত দ্বিরূপতা আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে :—

পূর্ব্বোল্লিখিত ঐতরেয় শ্রুতি "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" এই পর্য্যন্ত বলিয়া, পরে বলিলেন ("স ঈক্ষতে লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমাল্লোঁকানসৃজত") লোকসকলকে সৃষ্টি করিব কি? এই অভিপ্রায়ে তিনি ঈক্ষণ (দর্শন) করিলেন, তৎপরে তিনি এই লোকসকল সৃষ্টি করিলেন।" এই শেষোক্ত বাক্যের প্রথমাংশের অভিপ্রায় এক্ষণে বিচার করা যাইতেছে। শ্রুতি বলিলেন, "লোকসকল সৃষ্টি করিব কিনা, এই অভিপ্রায়ে পরমাত্মা দর্শন করিলেন" অর্থাৎ তিনি যেন নিদ্রিত ছিলেন, প্রবুদ্ধ হইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এইটি তাঁহার দ্বিতীয়াবস্থা। প্রথম অবস্থায় এই ঈক্ষণ কার্য্যেরও অভাব ছিল, তাহা স্পষ্টরূপে "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" এই বাক্যাংশে শ্রুতি প্রথমেই বর্ণনা করিয়াছেন; ইহা ব্রহ্মের স্বরূপগত

গুণ-গুণি-ভেদ রহিত পূর্ণাদ্বৈতাবস্থা, (যাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে)। যে শক্তিদ্বারা দর্শনকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহাকে দৃক্‌শক্তি বলে; কিন্তু দৃশ্য (জ্ঞাতব্য—দৃক্‌শক্তির বিষয়রূপে অবস্থিত) কিছু না থাকিলে দর্শনকার্য্য হইতে পারে না। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয়াবস্থায় দৃশ্য কিছু প্রকাশিত হয় নাই; কারণ শ্রুতি বলিলেন, "লোক সকল সৃষ্টি করিব কি?" এই অভিপ্রায়ে পরমাত্মা ঈক্ষণ করিলেন; তদ্দ্বারা জানা যায় যে, দৃশ্য লোক-সকল তখন কিছুই প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শক্তি ব্রহ্মে আছে। অতএব শ্রুতির মর্ম্ম এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম দ্বিতীয়াবস্থায় কেবল দৃক্‌শক্তিবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত আছেন, দৃশ্য-জগৎ অব্যক্ত অপ্রকাশিত শক্তিরূপে তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। এই অব্যক্ত দৃশ্যস্থানীয় শক্তিকে জগতের উপাদানস্বরূপে তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ; কিন্তু এই অবস্থায় তাঁহার সৃষ্টিবিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয় নাই। আবার যে "দৃক্‌শক্তি"-বিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম তদবস্থায় প্রকাশ পাইতেছেন, তাহা এইরূপ শক্তি, যদ্দ্বারা লোকসকল পরস্পর হইতে বিভিন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে; (ইহা পূর্ব্বোদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতি "তদৈক্ষত বহুস্যাং" বাক্যে আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন)। এতৎসঙ্গে তৈত্তিরীয়শ্রুত্যুক্ত "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইত্যাদি পূর্ব্বব্যাখ্যাত বাক্যসকল এবং এই মর্ম্মের অপরাপর শ্রুতিবাক্যসকল সংযোগ করিয়া, শ্রুতির অভিপ্রায় অনু-সন্ধান করিলে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, জগৎকে বহুরূপে সৃষ্টি এবং ইহার ধারণ পালন এবং লয়সাধন, এই ত্রিবিধ শক্তি ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত আছে। ইহাই তাঁহার সগুণত্ব—তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব। এই সৃষ্টিশক্তির উদ্বোধন অর্থাৎ কার্য্যোন্মুখী হওয়াই উক্ত দ্বিতীয়াবস্থা। ইহাকে সাধারণতঃ ঈশ্বরাবস্থাও বলা যায়। কারণ, এই অবস্থায় পরব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রথম প্রকাশিত হয়,

জগতের পালন এবং সংহারকার্য্যও এই অবস্থা হইতেই হয়। নির্গুণাবস্থা, যাহা বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়, তাহা বুদ্ধির গম্য নহে। কারণ, তাহা দৃশ্যস্থানীয় সর্ব্ববিধ বস্তুর অসদৃশ; ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরন্তু এই দ্বিতীয় উদ্বোধিত সগুণাবস্থা বুদ্ধিকর্তৃক ধারণার একদা অযোগ্য নহে। এই অবস্থায় দৃশ্য কিছু প্রকাশিত হয় নাই সত্য; কিন্তু প্রকাশিত দৃক্শক্তির (ঈক্ষণশক্তির) সহিত তাহা এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ব্রহ্মসত্তায় অবস্থিত আছে যে, নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি ব্রহ্মে প্রকাশিত হইলেই তাহা প্রকাশিত হইতে পারে। বাস্তবিক অব্যক্তদৃশ্যশক্তি তৎকালে প্রকাশিত দৃক্শক্তির সহিত অভিন্নরূপেই অবস্থিতি করে। কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে, এই অবস্থা বুদ্ধির একদা অগম্য নহে। আমাতে ক্রোধ-নামক শক্তি বর্ত্তমান আছে, অবসরপ্রাপ্ত হইলেই তাহা প্রকাশ পায়; যখন অপ্রকাশিত থাকে, তখন যে তাহার অস্তিত্ব নাই, এইরূপ বলা যায় না; অতএব বলিতে হইবে যে, অব্যক্তরূপে তাহা আমার স্বরূপে তৎকালে মিলিত হইয়া থাকে, উদ্দীপক বিষয় কিছু উপস্থিত হইলেই প্রকটিত হয়। এইরূপ জগতের উপাদানস্বরূপ যে দৃশ্যশক্তি, তাহা সৃষ্টি প্রকাশের পূর্ব্বে ব্রহ্মের দৃক্শক্তির সহিত অভিন্নরূপে মিলিত হইয়া, অপ্রকাশভাবে বিদ্যমান থাকে। এই দৃক্দৃশ্যাত্মকশক্তিই জগতের বীজাবস্থা; অব্যক্তরূপা দৃশ্যশক্তিকেই "প্রকৃতি" নামে আখ্যাত করা যায়। এই অবস্থায় উক্ত দৃক্দৃশ্যাত্মক শক্তি পরব্রহ্মের বাহ্যরূপ-স্থানীয়। "দৃশ্য" অংশ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, জগদ্রূপে প্রকাশিত হয়, এবং তাঁহার প্রত্যেক অংশে দৃক্শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, জীবনামে আখ্যাত হয়। পরন্তু ব্রহ্মের এই প্রকাশিত শক্তিবিশিষ্ট অবস্থা এবং নির্গুণ-স্বরূপাবস্থা, এই উভয়ের প্রভেদ বিশেষরূপে বোধগম্য করা প্রয়োজন। স্বরূপাবস্থায় ব্রহ্ম স্বীয়-স্বরূপান্তর্গতরূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সর্ব্ববিষয়ের এককালীন (নিত্য)

দ্রষ্টা ; তাহা পূর্ব্বপাদের উপসংহার অংশে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কালশক্তি উক্ত স্বরূপে সম্যক্ অস্তমিত হওয়াতে, এবং তদবস্থায় জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা বলিয়া কোন প্রকার ভেদ না থাকাতে, তদবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ বিশেষণও তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নহে। এক বিশুদ্ধ, অদ্বৈত ব্রহ্মই নিষ্ক্রিয় অচলবৎ প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইমাত্রই তদবস্থাসম্বন্ধে বলিতে পারা যায় ; সুতরাং শক্তি অথবা গুণ বলিয়া উক্তস্বরূপে কিছুরই স্ফুরণ নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় অবস্থায় ব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়কার্য্যে উন্মুখ হইয়াছেন। প্রলয়কালে ব্রহ্ম সম্যক্ দৃশ্য জগৎ আপনাতে লয় করিয়া, কেবল দৃক্শক্তিরূপেই প্রকাশিত থাকেন। পরন্তু তৎকালে দৃশ্যশক্তি তাঁহাতে লীন হইয়া, পুনরায় প্রকাশের নিমিত্ত উন্মুখ থাকে ; এই উন্মুখতামাত্রই "স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (লোক সকলকে কি সৃষ্টি করিব ?) এই বাক্যদ্বারা শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু জগতের এই বীজাবস্থা, এবং ইহার প্রকাশিত অবস্থা, এতৎসমস্তই ত্রিকালজ্ঞ পরব্রহ্মস্বরূপে নিত্য অবস্থিত ; সুতরাং সেই ত্রিকালজ্ঞ স্বরূপাবস্থা ও দৃক্শক্তিবিশিষ্ট অবস্থা বিভিন্ন। শেষোক্ত অবস্থায় পরব্রহ্ম যেন স্বীয় সর্ব্ববিধভেদবর্জ্জিত পূর্ণজ্ঞ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, লীলাবশতঃ শক্তিমান্ হইয়া, স্বীয় স্বরূপ হইতে জগৎকে যেন বাহির করিয়া, ইহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য সংসাধন করিতে উন্মুখ হয়েন। পরন্তু তদবস্থায়ও তাঁহার দ্বৈতত্ব বুদ্ধি প্রকাশিত হয় নাই, তিনি এক অদ্বৈতরূপেই তদবস্থায়ও বিরাজমান ; কারণ তিনি ভিন্ন সৃষ্টির উপকরণ আর কিছুই নাই, এবং সৃষ্টিও পৃথক্‌রূপে তখন প্রকাশিত হয় নাই। তিনি আপনাকে অনন্তশক্তিশালী অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়াই জানেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন "তদাত্মানমেকমবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" (তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়াই জানিয়াছিলেন (অপর কেহ নাই যিনি তাঁহার শক্তি প্রতিহত করিতে পারেন),

তাহাতেই তিনি বিশ্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন) ইত্যাদি। অতএব যিনি উক্তপ্রকার শক্তিবিশিষ্ট, তিনি উক্ত শক্তিদ্বারাই বুদ্ধিতে কথঞ্চিৎ ধারণযোগ্য হয়েন। সুতরাং এই গুণবিশিষ্ট অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ব্রহ্মকে "বিশেষ" বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; প্রথমোক্ত নির্গুণ স্বরূপাবস্থা কোন বিশেষ শক্তিমত্তা অথবা অপর কোন বিশেষ লিঙ্গ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। অতএব তাহা তাঁহার নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ) অবস্থা; ইহাই ব্রহ্মের "একান্তাদ্বৈতত্ব" বলিয়া পরিচিত। কিন্তু দ্বিতীয়াবস্থায় তিনি সৃষ্ট্যাদি বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট হওয়ায়, তাঁহার তদবস্থাকে "বিশিষ্টাদ্বৈতত্ব" বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মের এই দ্বিরূপতা (নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব) সর্ব্ববিধ শ্রুতিতেই প্রকাশিত আছে। যথা, বৃহদারণ্যক শ্রুতি একদিকে বলিতেছেন:—

"স এষ নেতি নেত্যাত্মা গৃহ্য"

এই ব্রহ্ম "নেতি নেতি" অর্থাৎ গুণাতীত রূপেই (চরাচর বিশ্ব হইতে পৃথক্ এইমাত্র রূপে) পরিজ্ঞাত হয়েন। তিনি জ্ঞাতাজ্ঞাত সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্। কোনপ্রকার প্রত্যক্ষীভূত অথবা অনুমিত ধর্ম্ম দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ করা যায় না। পুনরায় এই বৃহদারণ্যকশ্রুতি বলিতেছেন:—

"এতৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

"চরাচর বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্ম, ইহা নিশ্চিত"

চরাচর বিশ্ব সমস্তকেই যে শ্রুতি ব্রহ্ম বলিলেন, তাহার কারণ এই পাদের প্রারম্ভে উদ্ধৃত ছান্দোগ্যপ্রভৃতি শ্রুতি স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন, "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" (তিনি এইরূপ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন যে, আমি বহু হইব, আমার বহুরূপে সৃষ্টি হউক)। এইরূপে ঈক্ষণ করিয়া "স ইমাল্লোঁকানসৃজত" (তিনি এই সকল লোক সৃষ্ট করিয়াছিলেন)। অতএব এই চরাচর বিশ্ব

অন্য কোন উপাদানে সৃষ্ট হয় নাই; ব্রহ্মই স্বয়ং বহুরূপে প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করিয়া, চরাচর জগদ্রূপে প্রকাশিত হইলেন। ইহাকেই সৃষ্টি বলে। সুতরাং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া যে আরণ্যকশ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যথার্থই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের উপদেশ।

ব্রহ্ম যে বহুরূপে সৃষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়েন বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উক্ত দৃশ্য ও দৃক্‌শক্তির পরিণাম দ্বারা সংঘটিত হয়। দৃশ্যশক্তিরই পরিণাম জড় জগৎ; ইহাতে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অনুপ্রবিষ্ট দৃক্‌শক্তিই জীব; সুতরাং দৃশ্য জগতের সর্ব্বাংশে ঐ জীবশক্তি প্রবিষ্ট হইয়া তাহা নানাবিধ প্রকারে ভোগ করিয়া থাকেন; অতএব জীব ও জগৎ উভয়ই ঈশ্বরাংশ। পরব্রহ্ম ঐশীশক্তিযুক্ত (ঈশ্বর)ও বটেন, আবার তিনি সম্পূর্ণ গুণাতীত, ভেদবর্জ্জিত নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকারও বটেন, এবং জীবও জগৎও তাঁহারই রূপ। ইহাই শ্রুতিসকলের সার।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে উক্তি করিয়াছেন। তাহা একটু বিস্তৃতরূপে এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।

*

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে

পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি।

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা
বজা হ্যেকা ভোক্তৃ ভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥

অস্যার্থঃ—ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ পণ্ডিতগণ আলোচনা করিলেন, জগতের উৎপত্তির প্রতি ব্রহ্মই কি কারণ? আমরা কোথা হইতে জাত হইয়াছি? তাঁহারা ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবগত হইলেন যে, পরমাত্মা পরব্রহ্মের আত্ম-ভূতশক্তিই এই চরাচর বিশ্বের কারণ, এবং সেই শক্তি স্বীয় কার্য্যরূপ জগতের অন্তরালে বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বপ্রাণী যাঁহাতে জীবিত আছে, সকল যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, যিনি সর্ব্বব্যাপী, সেই ব্রহ্মেই জীব (হংস) চক্রসংলগ্ন বস্তুর ন্যায় নিয়ত ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। জীবাত্মা এবং জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরকে পৃথক্ বোধ করাতেই জীব এইরূপ ভ্রাম্যমাণ হয়েন; পরে যখন ঈশ্বরের সহিত একাত্মবোধে উপাসনাপর হয়েন, তখনই জীব জন্মমৃত্যুরহিত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। এই ব্রহ্মই সকল শ্রুতির বক্তব্য বিষয়; ইনি প্রপঞ্চধর্ম্ম-রহিত, সকলের সার তাঁহাতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিনই সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত আছে। পরন্তু ব্রহ্ম এই ত্রিতয়েরই প্রতিষ্ঠাস্থান হইয়াও অক্ষর (অর্থাৎ অবিকারী)। (তন্মধ্যে) ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞধর্ম্মসম্পন্ন, জীব অজ্ঞ; কিন্তু উভয়ই জন্মরহিত ও অনাদি; ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, জীব তদ্রূপ নহে। দৃশ্যাত্মক যে প্রকৃতি তাহাও অজ, অনাদি ব্রহ্মের নিত্যশক্তিস্বরূপে অবস্থিত হইয়া পুরুষের ভোগনিমিত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। পরমাত্মা দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদরহিত—অনন্ত; সমগ্রবিশ্বই তাঁহার রূপ; অতএব তিনি

অকর্ত্তা। ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি—এই ত্রিবিধ রূপই তাঁহার ; ইহা জানিয়া জীব মুক্ত হয়।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে পূর্ব্বোদ্ধৃত "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" ইত্যাদি বাক্যের নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

"দেবস্য দ্যোতনাদিযুক্তস্য মায়িনো মহেশ্বরস্য পরমাত্মন আত্মভূতামস্বতন্ত্রাং ন...পৃথগ্‌ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং কারণমপশ্যন্।...অথবা দেবাত্মশক্তিমিতি দেবশ্চ আত্মা চ শক্তিশ্চ যস্য পরস্য ব্রহ্মণোঽবস্থাভেদাস্তাং প্রকৃতিপুরুষেশ্বরাণাং স্বরূপভূতাং...পরাৎপরতরাং শক্তিং কারণমপশ্যন্নিতি।

অস্যার্থঃ—দেবের-স্বপ্রকাশস্বরূপের, মায়ী মহেশ্বর পরমাত্মার, আত্মভূত অর্থাৎ যাহা পৃথগ্‌ভূত স্বতন্ত্র নহে, তদ্রূপ শক্তিকে জগৎকারণ বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন। অথবা অন্য অর্থ—দেব, আত্মা ও শক্তি যে পরব্রহ্মের অবস্থাভেদ সেই ঈশ্বর, পুরুষ (জীব) ও প্রকৃতিরূপ ব্রহ্মস্বরূপভূতা পরাৎপরা শক্তিকে জগৎকারণ বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন।

সুতরাং এই শ্রুতি ব্যাখ্যাতে স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ হইলেও, গুণসকল তাঁহারই আত্মভূত, পৃথক্ নহে ; সুতরাং তাঁহার গুণসংযুক্ততা আছে, ইহাই শ্রুতির মর্ম্ম। এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত "তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ" এবং সর্ব্বশেষোক্ত "জ্ঞাজ্ঞৌ" ইত্যাদি শ্রুতিতে স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে যে, জীব ও প্রকৃতিরূপ বিশ্ব এবং ঈশ্বর—ব্রহ্মেরই স্বরূপ ; সুতরাং তিনি সগুণও বটেন, এবং নির্গুণ অকর্ত্তা অক্ষররূপেও প্রতিষ্ঠিত আছেন।

পরন্তু ব্রহ্ম একই সঙ্গে নির্ব্বিশেষ ও বিশেষ, নিঃশক্তিক নির্গুণ, অথচ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সগুণ ; একই সঙ্গে অদ্বৈত ও দ্বৈত ; ইহা আপাততঃ বুদ্ধিতে ধারণা করা কঠিন। সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জলদর্শনে এই দ্বিরূপতা এইরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, দৃশ্যরূপা প্রকৃতি ছায়ার ন্যায়

পরব্রহ্মে অবস্থিতি করেন; সুতরাং ব্রহ্মকে গুণবান্ বলিয়া বোধ হয়; বাস্তবিক তিনি গুণাতীত। যেমন শুদ্ধ স্ফটিকের কোন প্রকার বর্ণ নাই, কিন্তু রক্তবর্ণ জবাকুসুমের ছায়া সেই স্ফটিকে পতিত হইলে, ঐ স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়; পরন্তু এইরূপ বোধ হইলেও, প্রকৃতপ্রস্তাবে স্ফটিক স্বচ্ছস্বভাবই থাকে; তদ্রূপ গুণাত্মিকা প্রকৃতি ছায়ার ন্যায় স্বচ্ছ নির্ম্মল (নির্গুণ) ব্রহ্মে পতিত হওয়ায়, তিনি গুণী বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। পুনরপি উক্ত দার্শনিকেরা বলিয়াছেন যে, গুণাত্মিকা প্রকৃতি লৌহসদৃশ, এবং আত্মা অগ্নিসদৃশ। লৌহ যেমন অগ্নিসংযোগে দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও আত্মার নিত্যসান্নিধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া, তদাভাস প্রাপ্ত হয়েন; এবং উত্তপ্ত লৌহের ন্যায় আত্মময় হইয়া জগৎ রচনা করেন। আবার তাঁহারা বলিয়াছেন, প্রকৃতি লৌহবৎ, আত্মা চুম্বকবৎ। চুম্বক-সান্নিধ্যে লৌহ যেমন চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চুম্বক স্বরূপপ্রতিষ্ঠই থাকে, তাহার কিছু ন্যূনাধিক্য ঘটে না; তদ্রূপ গুণাত্মিকা-প্রকৃতি, ব্রহ্মের সহিত নিয়ত সম্বদ্ধ থাকাতে, তদাভাস প্রাপ্ত হইয়া, জগৎসৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করেন; কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা স্বরূপস্থ অবিকৃতই থাকেন। প্রকৃতি যে এই আত্মাভাস প্রাপ্ত হয়েন, তাহাকে সাংখ্যেরা পুরুষ অথবা পুরুষাংশ বলেন। প্রকৃতি এই আভাসযুক্তভাবে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছেন; সুতরাং তিনি উভয়াত্মিকা; এবং বন্ধ ও মোক্ষ যথার্থপক্ষে প্রকৃতিরই,—আত্মার নহে; আত্মা নিত্যই মুক্তস্বভাব। সাংখ্যগণ এইরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মের এই উভয়বিধ ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; জগৎকে তাঁহারা মিথ্যা বলেন না, পরিবর্ত্তনশীলমাত্র বলিয়া থাকেন।

দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের এই দ্বিরূপতা বুঝাইতে হইলে, এইরূপই বলিতে হয়; এবং এই সকল দৃষ্টান্ত যে অতিউত্তম দৃষ্টান্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দৃষ্টান্তদ্বারা বাস্তবিক সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রকাশ করা

অসম্ভব; কারণ আমাদের প্রত্যক্ষীভূত পদার্থদ্বারাই দৃষ্টান্ত সকল সংগঠিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎই গুণাত্মক; ব্রহ্ম গুণসকলের আশ্রয়বস্তু এবং তদতীত; এই আশ্রয়বস্তুর অনুরূপ জগতে কিছুই নাই। গুণমাত্রই আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়। কোন না কোন প্রকার শব্দ, কোন না কোন প্রকার স্পর্শ (কোমলত্ব, কাঠিন্য, মসৃণতা ইত্যাদি), কোন না কোন প্রকার রূপ, কোন না কোন প্রকার স্বাদ (রস), কোন না কোন প্রকার গন্ধ, এই মাত্রই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়; পরন্তু তৎসমস্তই গুণ। সুতরাং প্রত্যক্ষীভূত গুণের দৃষ্টান্তদ্বারা গুণাতীত বস্তুর সম্বন্ধে সম্যক্ বোধ জন্মাইতে পারা যায় না। স্ফটিক ও জবা উভয়ই আকার বিশিষ্ট পাঞ্চভৌতিক পদার্থ এবং অপর নানাপ্রকারে সাদৃশ্যশীল; এইরূপ অগ্নি এবং লৌহ, এবং চুম্বক ও লৌহ পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত, অনেক বিষয়ে সমানধর্ম্মী; সুতরাং পরস্পর পরস্পরের গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু উক্তপ্রকার সাম্যবিরহিত, গুণ ও গুণাতীত ব্রহ্মের সম্বন্ধে এই সকল দৃষ্টান্ত সম্যক্‌রূপে খাটিতে পারে না।

নাস্তিক-মতাবলম্বিগণ শ্রুতিবাক্যসকলের অনাদর করিয়া, একেবারে ব্রহ্মের অস্তিত্বের অস্বীকারদ্বারা এই বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা সাংখ্যদর্শনের উপদেশ সকল আংশিকরূপে অবলম্বন করিয়া এবং তাঁহাদিগের নিজমতের অনুকূলভাবে সাংখ্যদর্শন ব্যাখ্যা করিয়া, দৃশ্যরূপা জড়প্রকৃতিকেই বিশ্বের উৎপত্তির একমাত্র হেতু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শাক্যসিংহের তিরোভাবের পর, যখন কালপ্রভাবে তাঁহার উপদেশসকল দুষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তখন কোন কোন বৌদ্ধপণ্ডিতগণ বিপরীতরূপে ব্যাখ্যাত সাংখ্যদর্শনকে অবলম্বন করিয়া, নাস্তিক মত সকল প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়া, ইঁহাদিগের মতসকল খণ্ডন করিয়াছেন। পরন্তু অপরদিকে তিনিও

জড়বর্গও জীবসমন্বিত এই জগতের অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিয়া, উক্ত বিরোধের সামঞ্জস্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে তর্কজাল বিস্তার করিয়া নাস্তিক বৌদ্ধমত সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বনে তিনি উক্ত বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব উভয়ই একাধারে স্থাপন করা অসম্ভব; অতএব পরিশেষে আচার্য্য শঙ্কর এই মত স্থাপন করিয়াছেন যে, জগৎ ভ্রমাত্মক ও মিথ্যা; ইহার সত্যত্ব কেবল ব্যবহারিকমাত্র ও অজ্ঞানতামূলক। অন্ধকার স্থলে যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, পরন্তু অন্ধকার দূর হইলেই সেই ভ্রান্তি বিনষ্ট হয় এবং সর্প মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ অজ্ঞানতাবশতঃই জগৎ সত্য বলিয়া বোধ জন্মে, জ্ঞানোদয় হইলে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানা যায়। * পরন্তু এই দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে জগৎ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইলেও, তদ্দ্বারা জগতের একদা অলীকত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। অন্ধকারস্থলে রজ্জু দর্শন করিলে, যেরূপ সর্প বলিয়া ভ্রম জন্মে; কিন্তু অন্ধকার দূরীভূত হইলে, দৃষ্টবস্তুকে রজ্জু বলিয়া বোধ হওয়াতে সর্পভ্রম দূর হয়; রজ্জুই সত্য বস্তু, তাহাতে সর্পবুদ্ধি ভ্রমমাত্র জানা যায়; তদ্রূপ এই জগৎ পৃথক্ পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল ও স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ জীবের সাধারণতঃ বোধ হয়; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, সেই ভ্রম দূরীভূত হয়; জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তখন প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্ত রূপকের ইহাই অভিপ্রায়। জগতের

---

* শঙ্কর-শিষ্যগণ ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; তাঁহাদের মতে জগৎ একদা মিথ্যা, শঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরক ভাষ্য এবং বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থসকলেও অনেক স্থানে দেখা যায়, এইরূপ মতই প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক ইহা বাস্তবিক শঙ্করাচার্য্যের মত কিনা, তাহা বিচার করা নিষ্প্রয়োজন; তাঁহার মত বলিয়া যাহা প্রকাশিত আছে, তাহাই তাঁহার মত বলিয়া স্বীকার করিয়া, এই গ্রন্থে তাহা আলোচিত হইবে।

সম্পূর্ণ মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করা উক্ত রূপকের অভিপ্রায় নহে; জগতের ব্রহ্মরূপত্ব উপদেশ করাই উহার তাৎপর্য্য। শাঙ্করিক মতাবলম্বিগণ জগৎকে একদা মিথ্যা মায়ামাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরন্তু এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই মায়া কি? ইহার স্বরূপ কীদৃশ? এই মায়া কাহাতে অবস্থিত? যদি ব্রহ্মহইতে পৃথক্‌রূপে মায়ার অস্তিত্ব থাকে, তবে ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব, যাহা শ্রুতি সর্ব্বত্র স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ হইয়া যায়; কারণ তদতিরিক্ত দ্বিতীয় মায়ানামে বস্তু অদ্বৈতত্বের বাধা জন্মায়। যদি মায়া ব্রহ্মাত্মক হয়, যদি মায়া ব্রহ্মের শক্তিমাত্র হয়, তবে ব্রহ্ম সশক্তিক (সগুণ) হইয়া পড়িলেন; তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন নির্গুণত্ব রহিল না; এবং শঙ্কর স্বামী যে ব্রহ্মকে নিরবচ্ছিন্ন নির্গুণ বলিয়া, তদ্বোধক শ্রুতিসকলের উপর নির্ভর করিয়া, বিচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহার অনবস্থা ঘটিয়া উঠিল। যদি মায়া একদা মিথ্যা বস্তু হয়, তবে যাহা নিজে মিথ্যা, তাহার কোন প্রকার কার্য্য উৎপাদন করা অসম্ভব। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এই মায়ার ব্রহ্মরূপত্ব অথবা ব্রহ্ম হইতে বিভিন্নরূপত্ব, ইহার অস্তিত্ব অথবা নাস্তিত্ব, কিছুই নির্ব্বাচন করা যায় না, ইনি "তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম-নির্ব্বচনীয়া"। (বেদান্ত দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ৫ম সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এইরূপ মীমাংসাতে কিছু বিশেষ দেখা যাইতেছে না। মায়া, সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে,—সুতরাং নিত্যরূপে বর্ত্তমান আছেন, ইহা স্বীকার করা হইল। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন যে, এই মায়াকে ব্রহ্মরূপ বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যায় না, ব্রহ্মহইতে পৃথক্ বলিয়াও বলা যায় না। কিন্তু যে কোন বস্তুই হউক না কেন, হয় তাহা ব্রহ্মহইতে বিভিন্ন হইবে, অথবা ব্রহ্মের সহিত এক হইবে। ব্রহ্মও নয়, ব্রহ্ম-ভিন্নও নয়, বুদ্ধি ইহা কিরূপে ধারণা করিতে পারে? শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মের দ্বিরূপতা, বুদ্ধির অগম্য বলিয়া, শঙ্করাচার্য্য আপত্তি করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট মায়ারও এই অনির্ব্বচনীয়তা তুল্যরূপে বুদ্ধির অগম্য।

সুতরাং শঙ্কর-স্বামীর এই মীমাংসা দ্বারা কোন প্রকারেই বিরোধের নিষ্পত্তি হইল না। পরন্তু দুইরূপে ব্রহ্মের স্থিতি বহু শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। শঙ্কর-স্বামীর এই মত অপরসকল ভাষ্যকারেরও মতবিরুদ্ধ, এবং তাহার পোষক কোন শ্রুতি প্রমাণও নাই। পরন্তু তাঁহার মতানুসরণকারী যে সকল পণ্ডিতগণ "জগৎ মিথ্যা", ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মত অনুসরণ করিতে হইলে, এই একটি বিশেষ দোষ উপস্থিত হয় যে, সংসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই লোপ হইয়া যায়, এবং তদ্বিষয়ের প্রবর্ত্তক যে অসংখ্য শ্রুতি রহিয়াছে, তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, যদি সংসার সমস্তই মিথ্যা হইল, তবে ধর্ম্মই কি, কর্ম্মই কি, উপাসনাই কি, ভক্তিই কি, জ্ঞানই কি, সকলই মিথ্যা। কে কাহার ভজন করিবে, কে কাহার উপাসনা করিবে? কেই বা বদ্ধ, কেই বা মুক্ত হইবে? সকলইত মিথ্যা, একমাত্র সদ্বস্তু পরমাত্মাত সর্ব্বদাই নিত্য নির্গুণ মুক্তস্বভাব! ইহার উত্তরে বলা হয় যে, অজ্ঞান থাকিতে যখন ব্রহ্ম সত্য ও সংসার মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না, তখন এই অজ্ঞান-দূরীকরণের নিমিত্ত সাধন করা প্রয়োজন। কিন্তু এই অজ্ঞান কাহার? "তত্ত্বমসি" শ্রুতিকে শঙ্কর-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাবাক্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জীব ও ব্রহ্ম একই। উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ নাই; জীব পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু ব্রহ্মের ত অজ্ঞানতার সম্ভাবনা নাই; তবে জীবের কি প্রকারে অজ্ঞানতা হইবে? সুতরাং অজ্ঞানতাই যখন অসম্ভব, তখন তাহা দূর করিবার নিমিত্ত আবার সাধন কি হইবে, এবং তাহা "দূরকরা" কথারই বা সার্থকতা কি? শঙ্করাচার্য্যের মতের এই সকল এবং অপরাপর দোষ বিচার করিয়া ভক্তিমার্গাবলম্বী আচার্য্যগণ তাহা গ্রহণ করেন নাই; এবং শাঙ্করভাষ্য প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই, ভারতবর্ষে তাহার প্রতিবাদ হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীরামানুজ স্বামী সর্ব্বপ্রথমে এই প্রতিবাদ-

স্রোতের প্রবর্ত্তক হইয়া বেদান্তদর্শনের "শ্রীভাষ্য"-নামক প্রসিদ্ধ ভাষ্য প্রণয়ন করেন; তিনি অসংখ্য শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ ইত্যাদিহইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, অকাট্য যুক্তিদ্বারা, ব্রহ্মের সগুণতা স্থাপন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত এই স্থানে বিশেষরূপে উল্লিখিত করা হইল না। বস্তুতঃ জগতের ব্যবহারিক সত্যতা শঙ্করমতেও স্বীকৃত; পরন্তু ঐ মতে ইহা ভ্রমদর্শন মাত্র। ভ্রমদর্শন শব্দে অসম্যক্‌দর্শন বুঝিলে তাহাতে কোন বিরোধ নাই। এইরূপ দর্শন যে হয় ইহা স্বীকৃত; পরন্তু ব্রহ্মভিন্ন যখন অস্তিত্বশীল দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তখন এইরূপ দর্শন ব্রহ্মেরই বলিতে হইবে; অতএব এইরূপ দর্শন করিবার যোগ্য শক্তি যে ব্রহ্মে আছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। ইহা স্বীকার করিলেই জীবশক্তি স্বীকার করা হইল; কারণ ব্রহ্ম যে শক্তিদ্বারা অসম্যক্‌দর্শী হয়েন, তাহাকেই জীবশক্তি বলে, এবং ঐ জীবশক্তির দৃশ্যস্থানীয় শক্তিকে জগৎ বলে। জগৎ ও জীব উভয়ই ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ; তদতীত পূর্ণস্বরূপে ব্রহ্ম ঈশ্বর নামে অভিহিত। ইহাই পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতি ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি স্মৃতিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সুতরাং শাঙ্করিক মত সকলজীবের আত্মপ্রতীতি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ হওয়াতে, তাহা এই গ্রন্থে গৃহীত হইল না। একদিকে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিসকল, এবং অপরদিকে তাঁহার নির্গুণত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিসকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ব্রহ্মের দ্বিরূপতাই এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং এই ব্যাখ্যাই ঋষি-সম্প্রদায়ের আচার্য্যানুক্রমে উপদিষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এই ব্যাখ্যাতে দর্শনসকলের অবিরুদ্ধতাও স্থাপিত হয়, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে; এবং এই ব্যাখ্যাই ভগবান্ বেদব্যাস ভগবদ্গীতায় ও মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়-সকলে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও পরে প্রদর্শিত হইবে। পরম প্রজ্ঞা-

সম্পন্ন শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়াই বর্ণনা করিতে হইবে। পরন্তু তিনি যে এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অপরাপর কারণের মধ্যে ইহা একটি প্রধান কারণ যে, তিনি বেদান্তদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের একাদশ সূত্রটির মর্ম্মাবধারণ করিতে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদ্‌ভাষ্যে তিনি স্বয়ংই ব্রহ্মের সগুণতাকেও শ্রুত্যর্থরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যাতে ভ্রমে পতিত হইয়াই তাঁহাকে বেদান্তের পরব্রহ্ম-বিষয়ক মীমাংসাতে ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অতি প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তিরও কখন ভ্রম হইয়া থাকে ; সুতরাং তাঁহারও ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে ; তাঁহার জীবনী পাঠে জানা যায় যে, যে বয়সে তিনি ভাষ্যসকল রচনা করেন, তখন তিনি অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শী হয়েন নাই, তাঁহার অনেকবিধ যোগৈশ্বর্য্য তখনও প্রকাশ পাইয়াছিল সত্য ; কিন্তু তখনও তিনি সম্যক্ তত্ত্বদর্শী হয়েন নাই ; তিনি যোগে এমন উন্নত অবস্থা তখনও লাভ করেন নাই, যদ্দ্বারা ধ্যানমাত্র সকল-বিষয়ের সম্যক্ তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারা যায়। অতএব তাঁহার ভ্রম হইয়াছে বলাতে, আচার্য্য ঋষিগণেরও ভ্রান্তি-সম্ভাবনা অনুমিত হয় না। বেদান্ত দর্শন সমালোচনা কালে ঐ ৩য় অধ্যায়ের সূত্র আচার্য্যোপদেশানুসারে ব্যাখ্যা করা যাইবে।

ব্রহ্মের এই দৃষ্টতঃ বিপরীত-স্বভাবাপন্ন দ্বিরূপতা বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যদিও সম্যক্‌রূপে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা সুকঠিন, তথাপি তাহা কিঞ্চিৎ বোধগম্য করিবার নিমিত্ত শ্রুতির অনুগামী দুই একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে ;—

পূর্ব্বে জ্ঞানযোগ-বর্ণনাকালে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আমার বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ইত্যাদি অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; মনে চিন্তাস্রোত

অবিচ্ছিন্নরূপে একটির পর আর একটি প্রবাহিত হইতেছে; সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, এইরূপ ভোগ সকল নিয়ত অনুক্রামিত হইতেছে। যখন যে অবস্থা, যে চিন্তা, যে ভোগ, আমার উপস্থিত হয়, তাহাই আমার স্বরূপগত বলিয়া তত্তৎকালে আমি বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু এইরূপ হইলেও বিচারদ্বারা দেখা যায় যে, আমি এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে, এইসকল পরিবর্ত্তনের দ্বারা অসংস্পৃষ্টভাবে বর্ত্তমান থাকি। আমার স্বাভাবিক আত্মপ্রতীতিও এইরূপই বটে। অবস্থাসকল অতীত হইয়া গেলে, আমি তৎসম্বন্ধে উদাসীনবৎ বোধ করি। অতএব দেখা যায় যে, উক্ত অবস্থাশীলত্ব ও ঐ অবস্থাশীলত্বহইতে পৃথকৃত্ব, এই দৃষ্টতঃ পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় আমাতে নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি অবস্থাশীল সুখী, দুঃখী—ইত্যাদিও হই, অথচ তাহার অতীতরূপে, তাহার সাক্ষি-স্বরূপে-মাত্রও অবস্থান করি। পরমাত্মা-সম্বন্ধেও এইরূপ। তিনি স্বরূপে নিত্য, গুণাতীত, নির্ব্বিশেষ, অথচ গুণসকলও তাঁহার সহিত নিয়ত সম্বদ্ধ; তিনি গুণী ও নির্গুণী উভয়।

বহির্জগৎ-সম্বন্ধেও এই দ্বিরূপতা-বিষয়ে সকলজীবের আত্ম-প্রতীতি আছে; বাহ্য বস্তুসকল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ গুণবিশিষ্ট; এইসকল গুণই আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। পরন্তু এই গুণ-সকল নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; প্রত্যেক বস্তুর গুণই নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে গুণসকলের ধারক-বস্তু নিয়ত অপরিবর্ত্তিত আছে বলিয়া সকলেরই অলঙ্ঘনীয় ধারণা; যে বস্তু পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এইক্ষণও সেই বস্তুই দেখিতেছি ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা সকল-জীবের আছে। * সুতরাং বাহ্যবস্তুরও দ্বিরূপত্ব আত্মপ্রতীতি-সিদ্ধ।

* বিশেষ বিশেষ দৃক্‌শক্তি এইসকল বিশেষ বিশেষ গুণ সমষ্টির ধারক; এবং এতদুভয় আশ্রয়রূপব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

বহির্জগৎ সম্বন্ধে আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। স্বপ্নকালে আমি নানাপ্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকি, নাপ্রকার স্থান দর্শন করিয়া থাকি, নানাপ্রকার মনুষ্যের সহিত সম্ভাষণ ও ব্যবহার করিয়া থাকি, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু তৎকালে আমি অপরিবর্ত্তনীয়রূপে এই সকল কার্য্যের ও বস্তুর দ্রষ্টাস্বরূপেমাত্র অবস্থিতি করি, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। স্বপ্নকালে দৃষ্ট হস্তী অশ্ব, অট্টালিকা প্রভৃতি বস্তু সুখ, দুঃখাদি ভোগ, গমন অবস্থান প্রভৃতি কার্য্য, সকলই আমার মনঃসম্ভূত। আমি ইহাদিগের দ্রষ্টামাত্র, এবং ইহাদিগহইতে পৃথক্ এবং অপরিবর্ত্তনীয়রূপে অবস্থিত। কিন্তু আমি আবার তৎকালেই এমন শক্তিসম্পন্ন, যদ্দ্বারা আমি এই সকল সৃষ্টি করিতেছি, এবং ইহাদের স্বরূপতাপ্রাপ্ত হইতেছি। ব্রহ্মস্বরূপও ঈদৃশ। তিনি স্বরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ, নির্গুণ; পুনরায় শক্তিযুক্ত হইয়া, তিনি জগদ্রূপ কার্য্য বিস্তার করিতেছেন, এবং তদ্রূপতা প্রাপ্ত হইতেছেন।

আমাদের তর্কবুদ্ধির কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আর একটি কথাও এই স্থানে উল্লিখিত হইতেছে। সকল সাধকসম্প্রদায়ই স্বীকার করেন যে, ব্রহ্ম পূর্ণ; তিনি সর্ব্বপ্রকার অভাবরহিত। বৃহদারণ্যক ও অপরাপর উপনিষদও "পূর্ণমদ" ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখদ্বারা ব্রহ্মের পূর্ণতা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যায় যে, একদিকে গুণাভাব হইলে যেমন ব্রহ্মের পূর্ণতার হানি হয়, অপরদিকে নির্গুণতার অভাব হইলেও তদ্রূপ পূর্ণতার হানি হয়। অতএব তাঁহার পূর্ণতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহার এই উভয়রূপতা শ্রুতি অনুসারে সিদ্ধান্ত করিলে ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়াও বলা যাইতে পারে না।

বাস্তবিক দুইটি বিরুদ্ধধর্ম্ম যে একাধারে থাকিতে পারে না, তাহা সকলেরই স্বভাবসিদ্ধ অনুমান। কিন্তু এই স্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন বস্তুর ধর্ম্মসম্বন্ধেই এই অনুমান স্বভাবসিদ্ধ। পরন্তু ধর্ম্মিবস্তু,

তাহার ধর্ম্ম, এই উভয়ের বিচারে উক্ত বিরুদ্ধতাবিষয়ক অনুমান প্রযোজ্য নহে; "ধর্ম্মিবস্তু" বলিলেই সেই বস্তু ধর্ম্মাতীত বলিয়া জীবের স্বভাবসিদ্ধ অলঙ্ঘনীয় ধারণা হয়; এবং ধর্ম্মসকলও সেই অতীত বস্তুরই ধর্ম্ম বলিয়া তদ্রূপই স্বভাবসিদ্ধ ধারণা হয়; অতএব প্রত্যেক বস্তুই স্বরূপতঃ ধর্ম্মাতীত হইয়াও ধর্ম্মশীল; ইহাতে বিরুদ্ধতা কিছুমাত্র নাই। ব্রহ্মও স্বরূপতঃ গুণাতীত, পরন্তু অনন্ত গুণাশ্রয়; ইহাই শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাতে বিরুদ্ধ অনুমানের আশঙ্কা কিঞ্চিন্মাত্রও নাই।

এই পাদের বর্ণিত দ্বিতীয়াবস্থাপন্ন ঈশ্বররূপী ব্রহ্মকেই "নারায়ণ" এবং কোন কোন স্থানে "বাসুদেব" নামে ঋষিগণ আখ্যাত করিয়াছেন; এবং বিষ্ণু, মহামায়া প্রভৃতি অপরাপর নামদ্বারাও তিনি শ্রুতি এবং ঋষিগণ কর্তৃক অভিহিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইনি সগুণব্রহ্ম। ইনিই সর্ব্বোপরিস্থিত উপাস্য দেবতা; কারণ সগুণরূপেই ব্রহ্ম জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকায়, তিনি উপাসনার বিষয় হইতে পারেন; সাধক ইঁহার উপাসনাদ্বারা যখন নির্ম্মলচিত্ত হয়েন, তখন আপনাহইতেই তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত হয়েন, এবং পরে আশ্রয়ীভূত পরমব্রহ্মে লীন হইয়া, তৎসহ একতা প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

এক্ষণে এই নারায়ণরূপী সগুণ ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টিকার্য্য পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য-সকলের বিচারদ্বারা ক্রমশঃ বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে।

"স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি" এই বলিয়া ঐতরেয় শ্রুতি বলিলেন "স ইমাঁল্লোকানসৃজত" (সেই ব্রহ্ম এই লোকসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন)। পরন্তু সৃষ্টি কিরূপ ক্রমে প্রকাশিত হইল, তৎসম্বন্ধে

সামবেদীয় ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন যে, প্রথমে সৃষ্টিকরা সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ঈশ্বরে প্রাদুর্ভূত হইল। * যথা—

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬ষ্ঠ প্রপাঠক) সেই ব্রহ্ম এইরূপে ঈক্ষণ করিলেন যে (আমি) বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপত্তি প্রাপ্ত হইব।

সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা নারায়ণরূপী ব্রহ্ম পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এই ছান্দোগ্যশ্রুতি সৃষ্টির প্রারম্ভাবস্থা বর্ণন করিতেছেন। ভগবান্ নারায়ণে অব্যক্তরূপে-স্থিত দৃশ্যাত্মক যে শক্ত্যংশের উদ্বোধনের দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য প্রারব্ধ হয়, তাহাকে রজোগুণ বলে। যে দৃশ্যশক্তি নারায়ণে অব্যক্তভাবে ছিল, তাহারই অঙ্গীভূত এই রজোগুণ; তদ্দ্বারা অব্যক্ত দৃশ্যশক্তি কিঞ্চিৎ পরিচালিত হইয়া, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়। এবং দৃক্‌শক্তিও তৎসহগামী হইয়া, এই নিশ্চয়-জ্ঞানাত্মক বুদ্ধিকে লক্ষ্য করে, এবং দৃক্-শক্তি তখন বুদ্ধি-শক্তির সহিত মিলিত হয়। পরন্তু গুণসকল আশ্রয়ব্যতিরেকে অবস্থান করিতে পারে না; অতএব আশ্রয়রূপী ব্রহ্মও তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ তদবস্থায় কাজে কাজেই লুক্কায়িত থাকে। † এই নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিমাত্রকে আশ্রয় করিয়া যে পুরুষ অবস্থিতি করেন, তিনি "ক্ষেত্রজ্ঞ" নামে অভিহিত হয়েন। ইঁহাকে "সূত্রাত্মা" এবং "হিরণ্যগর্ভ"ও বলা যায়; পুরাণে কোন কোন

---

* লোকসকলকে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিলেন এই কথা বলিয়া ঐতরেয় শ্রুতি পরে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম অম্ভঃ (স্বর্গলোক), মরীচি (ভূর্লোক), ইত্যাদি লোকসকল সৃষ্টি করিলেন। ইহার অর্থ শ্রীশঙ্করস্বামী এইরূপ করিয়াছেন যে, প্রথমে সূক্ষ্ম অপর সৃষ্টি-সকল করিয়া, পরে স্থূলরূপে প্রকাশমান স্বর্গলোকাদির সৃষ্টি করিলেন; ইহাই শ্রুতির মর্ম্মার্থ। সুতরাং মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অপরাপর শ্রুতি অবলম্বনে ক্রমশঃ এইস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

† পরেবিবৃত সৃষ্টির প্রত্যেক অবস্থায়ই এইরূপ বুঝিতে হইবে। পরব্রহ্মই বিশ্বের আশ্রয়; তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত গুণাত্মক বিশ্ব অবস্থান করিতে পারে না।

স্থানে ইঁহাকে সঙ্কর্ষণ নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।* আদি পুরুষ নারায়ণে যে তাঁহার বহিরঙ্গরূপা প্রকৃতি আছেন, তিনি অব্যক্তা; কিন্তু এই "ক্ষেত্রজ্ঞ" পুরুষের বহিরঙ্গরূপে উক্ত নির্ম্মলবুদ্ধি অবস্থান করেন, এই বুদ্ধিই তাঁহার প্রকাশিত দেহরূপে বর্ত্তমান হয়; সুতরাং ব্যক্তসৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভই প্রথম পুরুষ বলিয়া গণ্য। এই পুরুষ বুদ্ধিরূপ আবরণযুক্ত হওয়াতে ইনি সম্পূর্ণরূপে জীবের ধ্যানের গম্য। যেমন কোন সাধারণ জীবকে তাহার আকৃতি দ্বারা ধ্যান করা যায়, তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ আকৃতিদ্বারা ইহাঁর ধ্যান করা যায়। কোন পুরুষের আকৃতি ধ্যান করিলেই যেমন তাঁহার ধ্যান করা হয়, সকল মনুষ্যেই ন্যূনাধিকরূপে বর্ত্তমান যে নির্ম্মলবুদ্ধি আছে, তাহার ধ্যান করিলেই ইঁহার ধ্যান হইয়া থাকে। এই ধ্যান মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত। সাত্ত্বিক সুষুপ্তিকালে বস্তুনির্ব্বিশেষে শুদ্ধজ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে; সুষুপ্ত ব্যক্তিকে মৃতব্যক্তি হইতে এই জ্ঞানবত্তা দ্বারাই পৃথক্ করা যায়; কোন বিশেষবস্তু তখন তাঁহার জ্ঞানের বিষয়রূপে বর্ত্তমান থাকে না। এই শুদ্ধ-জ্ঞানাত্মক অবস্থা অতিসূক্ষ্ম, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমাহিত হইয়া চিন্তা করিলে, তাহা বোধগম্য হয়। এইরূপে হিরণ্যগর্ভ ধ্যানগম্য হয়েন। "সৃষ্টি হউক বহু হইব, উৎপত্তি প্রাপ্ত হইব" এতাবন্মাত্রই এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, যাহা হিরণ্যগর্ভের বহিরঙ্গ বলিয়া কথিত হইল। কিন্তু অপর কিছুই তখনও সৃষ্ট হয় নাই; সুতরাং তখন বুদ্ধির বিষয়রূপে অবস্থিত অন্যকিছু নাই। এই অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষকে মহত্তত্ত্ব বলিয়া তত্ত্বদর্শী দার্শনিকগণ আখ্যাত করিয়াছেন; কারণ পরেসৃষ্ট সমস্তজগৎই ইনি বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ। অতএব বুদ্ধি সর্ব্বব্যাপী, তজ্জন্য

---

* কোন কোন স্থানে ইঁহাকে "বাসুদেব" নামেও আখ্যাত করা হইয়াছে; পরন্তু কোন কোন স্থানে নির্গুণ ব্রহ্মকে এবং কোন কোন গ্রন্থে নারায়ণাখ্য পূর্ব্বোক্ত সগুণ ব্রহ্মকেই বাসুদেব নামে বর্ণিত করা হইয়াছে। ইহা কেবল ভাষাভেদ মাত্র, মূলতঃ তাহাতে কোন বিরোধ নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্"।

মহৎ। এই নির্ম্মল জ্ঞানমাত্রকে সত্ত্বগুণ বলা যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত রজোগুণ চলনাত্মক; কিন্তু সত্ত্বগুণ জ্ঞানাত্মক। যেখানেই কোন প্রকার চলনকার্য্য, সেইখানেই রজোগুণের প্রকাশ বুঝিতে হইবে; এবং যেখানে কোন প্রকার জ্ঞানের কার্য্য, সেইখানেই সত্ত্বগুণের প্রকাশ জানিতে হইবে। এই দুই গুণ নিষ্ক্রিয়, অপ্রকাশ-ভাবে পূর্ব্বোল্লিখিত অব্যক্তা প্রকৃতিতে লীন থাকে। তদ্‌ব্যতীত আর একটি গুণ আছে, তাহাকে তমোগুণ বলে; ইহা সত্ত্ব ও রজোগুণের (জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির) অবরোধক। প্রকৃতিতত্ত্বে এই তমোগুণও নিষ্ক্রিয় ভাব প্রাপ্ত হয়; কারণ এই অবস্থায় সত্ত্ব ও রজোগুণের কোন প্রকার স্ফুরণ নাই; সুতরাং এতদুভয়ের অবরোধ জন্মাইয়াই যে শক্তি প্রকাশিত হয়, এতদুভয়ের প্রকাশাভাবে তাহার কোন প্রকার প্রকাশ হইতে পারে না। বস্তুতঃ গুণত্রয়ের নিষ্ক্রিয় সাম্যাবস্থারই নাম প্রকৃতি; "প্রকৃতি" এই গুণত্রয় হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চলনাত্মক রজোগুণের উদ্বোধনের দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য আরব্ধ হয়। এই রজোগুণ দ্বারা অব্যক্তা প্রকৃতি পরিচালিত হইয়া, প্রথমে জ্ঞানাত্মক সত্ত্বগুণ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি)-রূপে প্রকাশিত হয়; তৎসঙ্গে তমোগুণও কিঞ্চিৎপরিমাণে পরিচালিত হইয়া, বুদ্ধিনিষ্ঠ পুরুষকে আশ্রয় করে। রজোগুণ চলনাত্মক; তমোগুণ আবরণাত্মক; ইহা মোহস্বরূপ; আলস্য ও জড়তা উৎপাদন করিয়া ইহা প্রকাশিত হয়। এই আবরণরূপ তমোগুণ কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া, পুরুষকে আশ্রয় করাতে, বুদ্ধিনিষ্ঠ পুরুষের স্বরূপজ্ঞান অবরুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং বুদ্ধিহইতে তিনি পৃথক্, এইমাত্র জ্ঞান, হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রথমপুরুষে বর্ত্তমান থাকে। দৃক্-শক্তির স্বরূপ কি, তাহা বুদ্ধিতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষের জ্ঞাত থাকে না। পূর্ব্ব প্রকরণে ইহা বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মহত্তত্ত্বহইতে যেরূপে অহংতত্ত্ব ও তাহাহইতে একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং এই সকল তত্ত্বের সম্মিলনে যেরূপ নানাবিধ জীব-সমন্বিত বিচিত্র জগৎ রচিত হয়, তাহা পূর্ব্ব প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে। পুনরুক্তি-পরিহারার্থে তাহা আর এস্থলে বিশেষরূপে বিবৃত করা হইল না। সংক্ষেপতঃ এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ" ইত্যাদি (এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, সর্ব্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু ইত্যাদি জাত হইয়াছে)। এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মই যে চরাচর বিশ্বের সর্ব্ববিধ বস্তুর কর্ত্তা, ইহা পৃথক্‌রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। এবং "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (বিচিত্র জগৎ রচনা করিয়া, তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন), "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" (জীবরূপে আপনি সৃষ্ট জগতে প্রবেশ করিয়া) ইত্যাদি বাক্যে ভোক্তা জীবও যে ব্রহ্মেরই অংশ, তাহাও প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। পরন্তু ভোক্তা জীবরূপে যেমন ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, তদ্রূপ জীবসমন্বিত জগতের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বাশ্রয়রূপেও তিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত; শ্রুতি তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামেতাবানস্য মহিমা"। ব্রহ্ম জীব-শক্তিকে এবং জগৎকে সৃষ্টি করিয়া, এইসকলহইতে পৃথক্ হইয়া রহিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি সকলের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকে নিয়মিত করিতেছেন। "যেন জাতানি জীবন্তি" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত তৈত্তিরীয়শ্রুতিও তাহাই উপদেশ করিয়াছেন; সৃষ্টির পর জগৎকে ধারণা করা ও নিয়মিত করাও পরব্রহ্মের ঐশী শক্তির কার্য্য। এই দ্বিরূপত্ব প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই পূর্ব্বপাদে ব্যাখ্যাত শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি বলিয়াছেন;—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
"সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।
"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
"ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য-
"মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥"

এতাবন্মাত্র শ্রুতির আলোচনা করা হইল। এক্ষণে ঋষিগণ স্বয়ং স্মৃতি ও ইতিহাসাদিতে শ্রুতির অনুবাদ করিয়া যেরূপ ব্রহ্ম-স্বরূপ জীবতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(২) স্মৃতি।

(ক) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায় ;
বসিষ্ঠ ও করাল-জনক সংবাদ।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়-সকলে, এবং ভীষ্মপর্ব্বের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-নামক অধ্যায়সকলে মহর্ষি বেদব্যাস অতি বিস্তৃতরূপে, নানাবিধ উপাখ্যান দ্বারা, নানাপ্রকারে, ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা বিশেষরূপে ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়সকল এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অতি সমাহিত-চিত্তে অধ্যয়ন করা বিধেয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধেও এই ব্রহ্মবিদ্যা অতি বিশদরূপে নানা উপাখ্যানদ্বারা বিবৃত হইয়াছে। তাহাও অতি সমাহিতচিত্তে সর্ব্বদা পাঠ করা কর্ত্তব্য। মহাভারত যে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস-কর্ত্তৃক বিরচিত, তৎসম্বন্ধে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি নাই ; সুতরাং

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে-উল্লিখিত কয়েকটি উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে। বসিষ্ঠ ঋষি ও করাল-জনক রাজার মধ্যে যে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হইয়াছিল, তাহা শান্তিপর্ব্বের ৩০২ তম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে উল্লিখিত আছে যে—

শান্তিপর্ব্ব ৩০২ তম অধ্যায়।

"বসিষ্ঠং শ্রেষ্ঠমাসীনমৃষীণাং ভাস্করদ্যুতিম্।
পপ্রচ্ছ জনকো রাজা জ্ঞানং নৈঃশ্রেয়সং পরম্ ॥ ৮ ॥

*　　*　　*　　*　　*

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যস্মান্ন পুনরাবৃত্তিমাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ ॥ ১১ ॥
যচ্চ তৎক্ষরমিত্যুক্তং যত্রেদং ক্ষরতে জগৎ।
যচ্চাক্ষরমিতি প্রোক্তং শিবং ক্ষেম্যমনাময়ম্ ॥ ১২ ॥

বসিষ্ঠ উবাচ।

শ্রূয়তাং পৃথিবীপাল ক্ষরতীদং যথা জগৎ।
যন্ন ক্ষরতি পূর্ব্বেণ যাবৎকালেন বাপ্যথ ॥ ১৩ ॥

ভাস্করতুল্য তেজঃসম্পন্ন, ঋষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বসিষ্ঠ ঋষিকে সমাসীন দেখিয়া, রাজা জনক মোক্ষপ্রতিপাদক জ্ঞান জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮ ॥

হে ভগবন্! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সনাতন ব্রহ্ম আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, যাঁহাকে লাভ করিলে মনীষিগণ পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না।১১॥ "ক্ষর" নামে কীর্ত্তিত জগৎ, এবং এই ক্ষররূপী জগৎ যাহাতে লয়-প্রাপ্ত হয়, আর সংসার-মোচক, আনন্দস্বরূপ, দ্বন্দ্বরহিত, অক্ষর বলিয়া উক্ত যে বস্তু, তাহাও আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ১২ ॥ বসিষ্ঠ বলিলেন, হে পৃথিবীপাল! এই জগৎ যেরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং যাহা পূর্ব্বে কখনও

যুগং দ্বাদশসাহস্রং কল্পং বিদ্ধি চতুর্যুগম্।
দশকল্পশতাবৃত্তমহস্তদ্ ব্রাহ্মমুচ্যতে॥ ১৪॥
রাত্রিশ্চৈতাবতী রাজন্ যস্যান্তে প্রতিবুধ্যতে।
সৃজত্যনন্তকর্ম্মাণং মহান্তং ভূতমগ্রজম্॥ ১৫॥
মূর্ত্তিমন্তমমূর্ত্তাত্মা বিশ্বং শম্ভুঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিরীশানং জ্যোতিরব্যয়ম্॥ ৬॥

* * * * *

হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ।
মহানিতি চ যোগেষু বিরিঞ্চিরিতি চাপ্যজঃ॥ ১৮॥

* * * * *

"এষ বৈ বিক্রিয়াপন্নঃ সৃজত্যাত্মানমাত্মনা।
অহঙ্কারং মহাতেজাঃ প্রজাপতি মহঙ্কৃতম্॥২১॥

বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই, এবং কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৩॥ (দৈব পরিমাণে) দ্বাদশ সহস্র বৎসরে এক যুগ হয়, চারি যুগে এক কল্প হয়, সহস্র কল্পে ব্রহ্মার এক দিবস হয়। হে রাজন্! তাঁহার রাত্রিও এতাবৎকাল বর্ত্তমান থাকে। তৎপরে তিনি পুনরায় প্রবুদ্ধ হয়েন। ১৪॥ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, অব্যয়, জ্যোতিঃস্বরূপ (অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রকাশক) অনন্তকর্ম্মা, মহান্, সমস্ত প্রাণীর অগ্রে জাত, বিশ্বরূপ, মূর্ত্তিমান্, সেই ব্রহ্মাকেও অমূর্ত্তাত্মা স্বপ্রকাশ ভগবান শম্ভু, সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৫। ১৬॥ ইনিই (এই ব্রহ্মাই) শাস্ত্রে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ও বুদ্ধি বলিয়া উক্ত হয়েন, এবং যোগশাস্ত্রে ইঁহাকেই "মহৎ" নামে আখ্যাত করা হইয়াছে; ইনিই বিরিঞ্চি এবং অজ নামেও (শাস্ত্রে) প্রসিদ্ধ হইয়াছেন॥ ১৮॥ ইনিই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া আপনার নিজ অঙ্গহইতে অহঙ্কার ও এই অহ-ঙ্কারাত্মক মহাতেজঃসম্পন্ন প্রজাপতি-নামক পুরুষকে সৃষ্টি করেন। ২১॥

অব্যক্তাদ্ব্যক্তমাপন্নং বিদ্যাসর্গং বদন্তি তম্।
মহান্তং চাপ্যহঙ্কারমবিদ্যাসর্গমেব চ ॥২২॥

*　　*　　*　　*　　*

ভূতসর্গমহঙ্কারাৎ তৃতীয়ং বিদ্ধি পার্থিব।
অহঙ্কারেষু সর্ব্বেষু চতুর্থং বিদ্ধি বৈকৃতম্ ॥২৪॥
বায়ুর্জ্যোতিরথাকাশমাপোহথ পৃথিবী তথা।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ॥ ২৫॥

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণমেব চ পঞ্চমম্।
বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুর্মেঢ্রং তথৈব চ ॥২৭॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সম্ভূতানীহ যুগপন্মনসা সহ পার্থিব ॥ ২৮ ॥
এষা তত্ত্বচতুর্ব্বিংশা সর্ব্বাকৃতিষু বর্ত্ততে।
যাং জ্ঞাত্বা নাভিশোচন্তি ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ২৯ ॥

অব্যক্ত হইতে প্রকাশিত যে মহৎ (বিরিঞ্চি) তাঁহাকে বিদ্যাসৃষ্টি বলে, এবং এই অহঙ্কারকে অবিদ্যাসৃষ্টি বলে। ২২ ॥ হে রাজন্! তৃতীয় সৃষ্টি ভূতগ্রাম এই অহঙ্কারহইতেই হইয়াছে জানিবে, আর অহঙ্কারেরই বিকারদ্বারা • (ইন্দ্রিয়নামক) ৪র্থ সৃষ্টি হইয়াছে। ২৪ ॥ ক্ষিতি অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা; বাক্, পাণি পায়ু, পাদ, উপস্থ; এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় মনের সহিত যুগপৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-সমুদায় আকৃতি-বিশিষ্ট পদার্থে বর্ত্তমান আছে; তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ ইহা জানিয়া শোকবিবর্জ্জিত হয়েন; হে নরশ্রেষ্ঠ রাজন্, এই ত্রিলোক মধ্যে দেবতা, মনুষ্য ও দানব প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রাণীর

এতদ্দেহং সমাখ্যানং ত্রৈলোক্যে সর্ব্বদেহিষু।
বেদিতব্যং নরশ্রেষ্ঠ সদেবনরদানবে ॥ ৩০ ॥

* * *

কৃৎস্নমেতাবতস্তাত ক্ষরতে ব্যক্তসংজ্ঞিতম্।
অহন্যহনি ভূতাত্মা ততঃ ক্ষর ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৫ ॥
এতদক্ষরমিত্যুক্তং ক্ষরতীদং যথা জগৎ।
জগন্মোহাত্মকং প্রাহু রব্যক্তাদ্ব্যক্তসংজ্ঞকম্ ॥ ৩৬ ॥
মহাংশ্চৈবাগ্রজোহনিত্যমেতৎ ক্ষর-নিদর্শনম্।
কথিতং তে মহারাজ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৩৭ ॥
পঞ্চবিংশতিমো বিষ্ণু র্নিস্তত্ত্বস্তত্ত্বসংজ্ঞিতঃ।
তত্ত্বসংশ্রয়ণাদেতত্তত্ত্বমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৩৮ ॥
যন্মর্ত্ত্যমসৃজদ্ব্যক্তং তত্তন্মূর্ত্ত্যধিতিষ্ঠতি।
চতুর্ব্বিংশতিমোহব্যক্তো হ্যমূর্ত্তঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৩৯ ॥

সম্বন্ধে এই চতুর্ব্বিশতিকেই দেহ বলিয়া জানিবে। ২৫, ২৭, ৩০ ॥ হে তাত! প্রকটভাবাপন্ন ভূতাত্মক এই সম্যক্ জগৎ অহরহঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব ইহাকে ক্ষর বলে। ৩৫ ॥ কিন্তু প্রত্যগাত্মা পুরুষ অক্ষর বলিয়া উক্ত হয়েন, ক্ষয় হয় বলিয়া বিশ্বকে জগৎ বলে, অব্যক্ত হইতে ব্যক্তীকৃত এই জগৎকে মোহাত্মক বলা যায়। ৩৬ ॥ সৃষ্টির সর্ব্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত যে মহৎ, তাহাও নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইহাই ক্ষরের নিদর্শন জানিবে। হে মহারাজ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বলিলাম। ৩৭ ॥ পঞ্চবিংশতিতম বিষ্ণু তত্ত্বাতীত হইয়াও তত্ত্বরূপে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েন, তত্ত্বসকলের সহিত সন্নিবিষ্ট হওয়াতে তদ্রূপে তিনিও তত্ত্ব বলিয়া মনীষিগণ-কর্ত্তৃক উক্ত হয়েন। ৩৮ ॥ যে সমস্ত মর্ত্ত্য প্রকাশিত রূপসকল তিনি সৃষ্টি করেন, সেই সেই মূর্ত্তিতেই তিনি অধিষ্ঠিত হয়েন।

স এব হৃদি সর্ব্বাসু মূর্ত্তিষ্বাতিষ্ঠতেঽত্মবান্।
কেবলশ্চেতনো নিত্যঃ সর্ব্বমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্॥ ৪০॥

সর্গপ্রলয়ধর্ম্মিণ্যা স সর্গপ্রলয়াত্মকঃ।
গোচরে বর্ত্ততে নিত্যং নির্গুণং গুণসংজ্ঞিতম্॥ ৪১॥

এবমেষ মহানাত্মা সর্গপ্রলয়কোবিদঃ।
বিকুর্ব্বাণঃ প্রকৃতিমানভিমন্যত্যবুদ্ধিমান্॥ ৪২॥

তমঃ সত্ত্বরজোযুক্তস্তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
লীয়তে প্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধজনসেবনাৎ॥ ৪৩॥

সহবাসবিনাশিত্বান্নান্যোঽহমিতি মন্যতে।
যোঽহং সোঽহমিতি হ্যুক্ত্বা গুণানেবানুবর্ত্ততে॥ ৪৪॥

চতুর্ব্বিংশতিতম প্রকৃতি অব্যক্তরূপা, এবং পঞ্চবিংশ পুরুষও সর্ব্বদাই অমূর্ত্ত। ৩৯॥ সেই পঞ্চবিংশ পুরুষ সর্ব্ববিধ মূর্ত্তির হৃদ্দেশে অবস্থান করেন ; কিন্তু তিনি আত্মবান্, নির্গুণস্বভাব, চৈতন্যস্বরূপ ও নিত্য ; তিনি সর্ব্বমূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়াও অমূর্ত্তিমান্॥ ৪০॥ সৃষ্টি উৎপত্তি এবং লয়-ধর্ম্ম-যুক্ত ; অতএব বিনাশ প্রাপ্ত হয় ; আত্মা নির্গুণ হইলেও সর্ব্বদা সৃষ্টবস্তুর গোচরে বর্ত্তমান থাকেন। ৪১॥ এই প্রকারে মহান্ আত্মা সর্গ ও প্রলয় বোধ করিয়া থাকেন, এবং এই সর্গ সংঘটন করিয়া অবিদ্যাবশতঃ তাহাতে আত্মবুদ্ধি-যুক্ত হয়েন। ৪২॥ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় যে সকল দেহ আছে, তাহার সহিত অবুদ্ধ-জন-সেবন ও অজ্ঞতা-নিবন্ধন একতা প্রাপ্ত হয়েন। ৪৩॥ বিনাশী বস্তুর সহিত সহবাসহেতু তাহাহইতে আত্মাকে পৃথক্ মনে করিতে পারেন না ; আমি অমুক, অমুকজাতীয় বলিয়া গুণসকলকে নিজের বোধ করিয়া তদনুগামী হয়েন। ৪৪॥

তমসা তামসান্ ভাবান্ বিবিধান্ প্রতিপদ্যতে।
রজসা রাজসাংশ্চৈব সাত্ত্বিকান্ সত্ত্বসংশ্রয়াৎ ॥ ৪৫ ॥

* * *

৩০৩ অধ্যায়।

এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধমনুবর্ত্ততে।
দেহাদ্দেহসহস্রাণি তথা সমভিপদ্যতে ॥ ১ ॥

* * *

অভিমন্যত্যসম্বোধাত্তথৈব ত্রিবিধান্ গুণান্।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ধর্ম্মার্থৌ কাম এব চ ॥ ২৭ ॥

* * *

৩০৫ অধ্যায়।

জনক উবাচ।

অক্ষরক্ষরয়োরেষ দ্বয়োঃ সম্বন্ধ ইষ্যতে।
স্ত্রীপুংসোর্ব্বাপি ভগবন্ সম্বন্ধস্তদ্বদুচ্যতে ॥ ১ ॥

* * *

তমোগুণাক্রান্ত হইয়া ক্রোধাদি বিবিধ তামসভাব প্রাপ্ত হয়েন, রজোগুণাক্রান্ত হইয়া নানাবিধ রাজসিক কার্য্য করিয়া থাকেন, এবং সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন হইয়া সাত্ত্বিক কার্য্য করিয়া থাকেন। ৪৫ ॥

৩০৩ অধ্যায়—এইরূপে পুরুষ অজ্ঞানান্ধ হইয়া, অবুদ্ধ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করেন ও এক দেহ হইতে অন্য দেহ এইরূপে সহস্র দেহ প্রাপ্ত হয়েন। ১॥

সেই পুরুষ এইরূপে অজ্ঞতা-নিবন্ধন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ তাঁহাতে আছে বলিয়া অভিমান করেন ॥ ২৭ ॥

৩০৫ অধ্যায়—রাজা জনক বলিলেন,—হে ভগবন্! স্ত্রী এবং পুরুষ যেমন পরস্পরের সহিত মিলন সম্বন্ধ ইচ্ছা করে, ক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি ও পুরুষ) ইহারা উভয়ে তদ্রূপ পরস্পরের সহিত মিলন সম্বন্ধ ইচ্ছা করেন। ১ ॥

অন্যোন্যগুণসংরোধাদন্যোন্যগুণ-সংশ্রয়াৎ।
এবমেবাভিসম্বন্ধৌ নিত্যং প্রকৃতিপুরুষৌ ॥ ৮ ॥
পশ্যামি ভগবংস্তস্মান্মোক্ষধর্মো ন বিদ্যতে ॥ ৯ ॥

* * *

বসিষ্ঠ উবাচ।

* * *

দ্রব্যাদ্দ্রব্যস্য নির্বৃত্তিরিন্দ্রিয়াদিন্দ্রিয়ং তথা।
দেহাদ্দেহমবাপ্নোতি বীজাদ্বীজং তথৈব চ ॥ ২১ ॥
নিরিন্দ্রিয়স্যাবীজস্য নির্দ্রব্যস্যাপদেহিনঃ।
কথং গুণা ভবিষ্যন্তি নির্গুণত্বান্মহাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
গুণা গুণেষু জায়ন্তে তত্রৈব নিবিশন্তি চ।
এবং গুণাঃ প্রকৃতিতো জায়ন্তে নিবিশন্তি চ ॥ ২৩ ॥

* * *

পরস্পরের গুণের দ্বারা রুদ্ধ হওয়াতে, পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত থাকাতে, (অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির জাড্য রোধ করিয়া, তাহাতে স্বীয় আনন্দময়তা অর্পণ এবং প্রকৃতি পুরুষের আনন্দময়তা রোধ করিয়া তাহাতে স্বীয় জাড্য অর্পণ করাতে) প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্যই যুক্ত আছেন ; অতএব হে ভগবন্ ! আমি মোক্ষের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। ৮। ৯ ॥

বসিষ্ঠ বলিলেন,—দ্রব্যহইতেই দ্রব্য, ইন্দ্রিয়হইতেই ইন্দ্রিয়, দেহহইতেই দেহ এবং বীজহইতেই বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দেহী পুরুষ, ইন্দ্রিয়, বীজ অথবা দ্রব্য নহেন ; তিনি নির্গুণ হওয়ায়, সেই মহাত্মা পুরুষহইতে কিরূপে গুণসকল জাত হইবে ? গুণসকল গুণেতেই উৎপত্তিপ্রাপ্ত এবং তাহাতেই প্রলীন হয় ; এইরূপে গুণসকল প্রকৃতিহইতেই জাত হয় এবং তাহাতেই প্রলীন হইয়া থাকে। ২১। ২২। ২৩ ॥

পুমাংশ্চৈবাপুমাংশ্চৈব ত্রৈলিঙ্গ্যং প্রাকৃতং স্মৃতম্।
ন বা পুমান্ পুমাংশ্চৈব স লিঙ্গীত্যভিধীয়তে॥ ২৫॥

* * *

পঞ্চবিংশতিমস্তাত লিঙ্গেষু নিয়তাত্মকঃ॥ ২৭॥
অনাদিনিধনোঽনন্তঃ সর্ব্বদর্শী নিরাময়ঃ।
কেবলং ত্বভিমানিত্বাদ্ গুণেষু গুণ উচ্যতে॥ ২৮॥
গুণা গুণবতঃ সন্তি, নির্গুণস্য কুতো গুণাঃ।
তস্মাদেবং বিজানন্তি যে জনা গুণ-দর্শিনঃ॥ ২৯॥
যদা ত্বেষ গুণানেতান্ প্রাকৃতানভিমন্যতে।
তদা স গুণহান্যৈতৎ পরমেবানুপশ্যতি॥ ৩০॥

* * *

পুরুষ নামধারী জীব এবং দৃশ্যবর্গ (অপুমান্) এবং উভয়ের সংযোগ-সম্বন্ধ নিমিত্ত ভোগ, এই তিনই প্রকৃতির অঙ্গীভূত বলিয়া উক্ত হয়। দেহী আত্মা, দেহরূপ পুরীতে অবস্থান করেন বলিয়া, পুরুষ নামে উক্ত হয়েন; সত্য কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি দেহাতীত। ২৫॥

এইরূপ বিচারদ্বারা অলিঙ্গ-আত্মার উপলব্ধি হয়; সুতরাং পঞ্চবিংশতি-তম পুরুষ লিঙ্গ (দেহ)-যুক্ত। ২৭॥ অথচ তিনি অনাদি-নিধন (নিত্য) অনন্ত, সর্ব্বদর্শী, নিরাময়, নির্গুণ, কেবলং অভিমানদ্বারাই গুণের সহিত যুক্ত থাকায়, গুণ বলিয়াই উক্ত হন। ২৮॥ গুণবান্ হইতেই গুণসকল আবির্ভূত হয়, নির্গুণহইতে গুণের কিরূপে সৃষ্টি হইবে? গুণবেত্তা পুরুষগণ এইরূপই জানিয়া থাকেন। ২৯॥ যখন এই জীব গুণসকলকে প্রকৃতিরই অঙ্গ বলিয়া জানেন (আপনাকে গুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন) তখনই তাঁহার গুণহানিত্ব ঘটে এবং তিনি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৩০॥

অপ্রবুদ্ধমথাব্যক্তমগুণং প্রাহুরীশ্বরম্।
নির্গুণং চেশ্বরং নিত্যমধিষ্ঠাতারমেব চ ॥ ৩২ ॥
প্রকৃতেশ্চ গুণানাঞ্চ পঞ্চবিংশতিকং বুধাঃ।
সাংখ্যযোগে চ কুশলা বুধ্যন্তে পরমৈষিণঃ ॥ ৩৩ ॥

* * *

পরস্পরেণৈতদুক্তং ক্ষরাক্ষর-নিদর্শনম্।
একত্বমক্ষরং প্রাহু র্নানাত্বং ক্ষরমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥
পঞ্চবিংশতি-নিষ্ঠোঽয়ং যদা সম্যক্ প্রবর্ত্ততে।
একত্বং দর্শনং চাস্য নানাত্বং চাপ্যদর্শনম্ ॥ ৩৭ ॥
তত্ত্ব-নিস্তত্ত্বয়োরেতৎ পৃথগেব নিদর্শনম্।
পঞ্চবিংশতিসর্গং তু তত্ত্বমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৩৮ ॥
নিস্তত্ত্বং পঞ্চবিংশস্য পরমাহুর্নিদর্শনম্।
সর্গস্য বর্গমাচারং তত্ত্বং তত্ত্বাৎ সনাতনম্ ॥ ৩৯ ॥

* * *

সেই পরমাত্মাই ঈশ্বর নামে আখ্যাত, অথচ তিনি জ্ঞানের অগম্য, তাঁহাকে কোন লিঙ্গদ্বারা জানা যায় না; তিনি নির্গুণ অথচ সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বর এবং সমস্ত জগতের অধিষ্ঠাতা সর্ব্বান্তর্য্যামী। ৩২ ॥ সাংখ্য-যোগমার্গাবলম্বী মনীষিগণ এইরূপে প্রকৃতি ও গুণের মধ্যে পঞ্চ-বিংশতিতম পুরুষকেই ধ্যানদ্বারা জ্ঞাত হয়েন। ৩৩ ॥

এইরূপ পরস্পরের দ্বারা ক্ষর ও অক্ষরের প্রভেদ নির্দ্দেশ করা যায়; একত্বই অক্ষর এবং নানাত্বই ক্ষর বলিয়া উক্ত হয়। ৩৬। এই জীব যখন পঞ্চবিংশতি-নিষ্ঠ হয়েন, তখনই তাঁহার অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হয়, এবং স্বরূপদর্শনের অভাব হইলেই তাঁহার নানাত্ব ঘটিয়া থাকে। ৩৭ ॥ তত্ত্ব ও নিস্তত্ত্বের এই লক্ষণ, পঞ্চবিংশতি সর্গকেই মনীষিগণ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। ৩৮ ॥ পরমাত্মাই পঞ্চবিংশতিতম পুরুষের নিস্তত্ত্বাবস্থা;

৩০৬ অধ্যায়।

বসিষ্ঠ উবাচ।

যোগদর্শনমেতাবদুক্তং তে তত্ত্বতো ময়া।
সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি-পরিসংখ্যানদর্শনম্ ॥ ২৬ ॥
অব্যক্তমাহুঃ প্রকৃতিং পরাং প্রকৃতিবাদিনঃ।
তস্মান্মহৎ সমুৎপন্নং দ্বিতীয়ং রাজসত্তম ॥ ২৭ ॥
অহঙ্কারস্তু মহতস্তৃতীয়মিতি নঃ শ্রুতম্।
পঞ্চভূতান্যহঙ্কারাদাহুঃ সাংখ্যাত্মদর্শিনঃ ॥ ২৮ ॥
এতাঃ প্রকৃতয়শ্চাষ্টৌ বিকারাশ্চাপি ষোড়শ।
পঞ্চ চৈব বিশেষা বৈ তথা পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ২৯ ॥
এতাবদেব তত্ত্বানাং সাংখ্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
সাংখ্যে বিধিবিধানজ্ঞা নিত্যং সাংখ্যপথে রতাঃ ॥ ৩০ ॥

সেই সনাতন পরমাত্মাই পঞ্চবিংশতি সৃষ্টিবর্গের পরম গন্তব্য (আশ্রয়), তিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেরও পরমতত্ত্ব। ৩৯।

সম্যক্ তত্ত্বের সহিত যোগদর্শন আমি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে উত্তরোত্তরক্রমে উপদিষ্ট যে সাংখ্যজ্ঞান, তাহা সম্যক্ উক্ত হইতেছে। ২৬ ॥ প্রকৃতিবাদিগণ পরা-প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন; হে রাজশ্রেষ্ঠ, এই প্রকৃতি হইতে মহৎ নামক দ্বিতীয় সৃষ্টি উৎপন্ন হয়। ২৭ ॥ তৃতীয় অহঙ্কার নামক তত্ত্ব মহৎ হইতে সৃষ্ট হয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। সাংখ্যজ্ঞানী পুরুষসকল বলিয়াছেন যে, এই অহঙ্কারহইতে পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট হইয়াছে। ২৮ ॥ এই আটটি তত্ত্বকে অষ্টবিধ প্রকৃতি বলা যায়; তদ্ভিন্ন আর ষোলটি বিকার আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি মহাভূতকে পঞ্চ "বিশেষ" বলে এবং (একাদশ) ইন্দ্রিয়ও "বিশেষ" বলিয়া উক্ত হয়। ২৯ ॥ সাংখ্য শাস্ত্রের বিধি-বিধানজ্ঞ, নিত্যসাংখ্য-পথে রত

যস্মাদ্‌যদভিজায়েত তৎ তত্রৈব প্রলীয়তে।
লীয়ন্তে প্রতিলোমানি সৃজ্যন্তে চান্তরাত্মনা॥ ৩১

অনুলোমেন জায়ন্তে লীয়ন্তে প্রতিলোমতঃ।
গুণা গুণেষু সততং সাগরস্যোর্ম্ময়ো যথা॥ ৩২॥

সর্গপ্রলয় এতাবান্ প্রকৃতের্নৃপসত্তম।
একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ যদাসৃজৎ॥ ৩৩॥

এবমেব চ রাজেন্দ্র বিজ্ঞেয়ং জ্ঞান-কোবিদৈঃ।
অধিষ্ঠাতারমব্যক্তমস্যাপ্যেতন্নিদর্শনম্॥ ৩৪॥

একত্বঞ্চ বহুত্বঞ্চ প্রকৃতেরর্থতত্ত্ববান্।
একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ প্রবর্ত্তনাৎ॥ ৩৫॥

বহুধাত্মা প্রকুর্ব্বীত প্রকৃতিং প্রসবাত্মিকাম্।
তচ্চ ক্ষেত্রং মহানাত্মা পঞ্চবিংশোঽধিতিষ্ঠতি॥ ৩৬॥

মনীষিগণ এইমাত্রই তত্ত্বের সংখ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ৩০॥ যাহাহইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাতে তাহার লয়। অন্তরাত্মা সংযোগেই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। ৩১॥ অনুলোমক্রমে সৃষ্টি হয়, প্রতিলোমক্রমে প্রলয় হয়; সাগরস্থিত ঊর্ম্মিমালার ন্যায়, গুণাত্মক জগৎ গুণেই অবস্থিত হয়। ৩২॥ হে রাজশ্রেষ্ঠ, সর্গ ও প্রলয় এইরূপ জানিবে। প্রলয়ে ইঁহার (পুরুষের) একত্ব এবং সৃষ্টিতে ইঁহার বহুত্ব হয়। ৩৩॥ হে রাজেন্দ্র, এই জীবরূপী পুরুষের অধিষ্ঠাতা অব্যক্ত আত্মাকেও এই নিদর্শন দ্বারা জ্ঞানী পুরুষগণ অবগত হইয়া থাকেন। ৩৪॥ প্রকৃতির অবয়ব-জ্ঞান-দ্বারাই পুরুষের একত্ব ও বহুত্ব ঘটে; প্রলয়ে একত্ব ও সৃষ্টিতে বহুত্ব। ৩৫॥ হে রাজেন্দ্র, পুরুষ প্রকৃতিকে বহুধা বিভাগ করিয়া থাকেন; তৎ-

অধিষ্ঠাতেতি রাজেন্দ্র প্রোচ্যতে যতিসত্তমৈঃ।
অধিষ্ঠানাদধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম্॥ ৩৭॥
ক্ষেত্রং জানাতি চাব্যক্তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চোচ্যতে।
অব্যক্তিকে প্রবিশতে পুরুষশ্চেতি কথ্যতে॥ ৩৮॥
অন্যদেব চ ক্ষেত্রং স্যাদন্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
ক্ষেত্রমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞাতারং পঞ্চবিংশকম্॥ ৩৯॥
অন্যদেব চ জ্ঞানং স্যাদন্যজ্জ্ঞেয়ং তদুচ্যতে।
জ্ঞানমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ॥ ৪০॥
অব্যক্তং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তথা সত্ত্বং তথেশ্বরঃ।
অনীশ্বরমতত্ত্বঞ্চ তত্ত্বং তৎ পঞ্চবিংশকম্॥ ৪১॥

* * * * *

সমস্তকেই ক্ষেত্র বলে, তৎক্ষেত্রে আত্মা পঞ্চবিংশ পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত হয়েন। ৩৬॥ হে রাজেন্দ্র, যতিগণ আত্মাকে অধিষ্ঠাতা বলেন; ক্ষেত্রকে অধিকার করিয়া অবস্থান করেন, এই নিমিত্ত ইঁহার অধিষ্ঠাতা নাম হয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৩৭॥ ব্যক্তাব্যক্ত ক্ষেত্রকে জানেন, এই অর্থে, ইঁহার ক্ষেত্রজ্ঞ নাম হয়, এবং প্রকৃতিতে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন, এই নিমিত্ত ইঁহাকে পুরুষও বলা যায়। ৩৮॥ অতএব ক্ষেত্র অন্য, ও ক্ষেত্রজ্ঞ অন্য (অর্থাৎ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ পৃথক্), প্রকৃতিই ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হয়েন এবং তজ্জ্ঞাতা পুরুষই পঞ্চবিংশ। ৩৯॥ এইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয় পৃথক্‌রূপে উক্ত হয়; অব্যক্তা প্রকৃতিই জ্ঞান, পঞ্চবিংশ পুরুষই জ্ঞেয়। ৪০॥ অব্যক্তকে ক্ষেত্র, সত্ত্ব (বুদ্ধি) এবং ঈশ্বর বলা যায়; এবং পঞ্চবিংশতিতম পুরুষকে অনীশ্বর, অতত্ত্ব ও তত্ত্ব এই উভয়রূপেই আখ্যাত করা যায়। ৪১॥

৩০৭ অধ্যায়।

বসিষ্ঠ উবাচ।

সাংখ্যদর্শনমেতাবদুক্তং তে নৃপসত্তম।
বিদ্যাবিদ্যে ত্বিদানীং মে ত্বং নিবোধানুপূর্ব্বশঃ ॥১॥
অবিদ্যামাহুরব্যক্তং স্বর্গপ্রলয়ধর্ম্মি বৈ।
সর্গপ্রলয়-নির্ম্মুক্তাং বিদ্যাং বৈ পঞ্চবিংশকঃ॥ ২ ॥
পরস্পরস্য বিদ্যাং বৈ ত্বং নিবোধানুপূর্ব্বশঃ।
যথোক্তমৃষিভিস্তাত সাংখ্যস্যাভিনিদর্শনম্ ॥ ৩ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সর্ব্বেষাং বিদ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয়ং স্মৃতম্।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং চ তথা বিশেষা ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৪ ॥
বিশেষাণাং মনস্তেষাং বিদ্যামাহুর্ম্মনীষিণঃ।
মনসঃ পঞ্চভূতানি বিদ্যা ইত্যভিচক্ষতে ॥ ৫ ॥
অহঙ্কারস্তু ভূতানাং পঞ্চানাং নাত্র সংশয়ঃ।
অহঙ্কারস্য চ তথা বুদ্ধির্বিদ্যা নরেশ্বর ॥ ৬ ॥

হে রাজশ্রেষ্ঠ, এই পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শন তোমাকে বলা হইল। এক্ষণে বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ আনুপূর্ব্বিক তোমাকে বলিব। ১ ॥ সর্গ-প্রলয়-ধর্ম্মযুক্ত অব্যক্তকে অবিদ্যা বলে, এবং সর্গ-প্রলয়-ধর্ম্মবিমুক্ত পঞ্চবিংশতিতম পুরুষই তৎসম্বন্ধে বিদ্যা। ২ ॥ হে তাত! সাংখ্যজ্ঞানাবলম্বিগণ অপরাপর তত্ত্বসকলের পরস্পরের বিদ্যা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩ ॥ কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের বিদ্যা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া উক্ত হয়; জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের বিদ্যা "বিশেষ"সকল। ৪ ॥ বিশেষ-সকলের বিদ্যা মন, মনের বিদ্যা পঞ্চ মহাভূত। ৫ ॥ পঞ্চ মহাভূতের বিদ্যা অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিদ্যা বুদ্ধি। ৬ ॥

বিদ্যা প্রকৃতিরব্যক্তং তত্ত্বানাং পরমেশ্বরী।
বিদ্যা জ্ঞেয়া নরশ্রেষ্ঠ বিধিশ্চ পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥
অব্যক্তস্য পরং প্রাহুর্বিদ্যাং বৈ পঞ্চবিংশকম্।
সর্ব্বস্য সর্ব্বমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ং জ্ঞানস্য পার্থিব ॥ ৮ ॥
জ্ঞানমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ।
তথৈব জ্ঞানমব্যক্তং বিজ্ঞাতা পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৯ ॥
বিদ্যা বিদ্যার্থতত্ত্বেন ময়োক্তা তে বিশেষতঃ।
অক্ষরঞ্চ ক্ষরঞ্চৈব যদুক্তং তন্নিবোধ মে ॥ ১০ ॥
উভাবেবাক্ষরাবুক্তাবুভাবেতাবনক্ষরৌ।
কারণং তু প্রবক্ষ্যামি যথা তথ্যং তু জ্ঞানতঃ ॥ ১১ ॥
অনাদিনিধনাবেতাবুভাবেবেশ্বরৌ মতৌ।
তত্ত্বসংজ্ঞাবুভাবেতৌ প্রোচ্যতে জ্ঞানচিন্তকৈঃ ॥ ১২ ॥
সর্গপ্রলয়ধর্ম্মত্বাদব্যক্তং প্রাহুরক্ষরম্।
তদেতদ্ গুণসর্গায় বিকুর্ব্বাণং পুনঃপুনঃ ॥ ১৩ ॥

সমস্ত তত্ত্বসকলেরই বিদ্যা পরমেশ্বরী প্রকৃতি; হে নরশ্রেষ্ঠ, ইনি পরমা-বিদ্যা বলিয়া উক্ত হয়েন। ৭ ॥ কিন্তু পঞ্চবিংশক পুরুষ এই অব্যক্তেরও বিদ্যা; হে রাজন্, অব্যক্তই সকল জ্ঞানের জ্ঞেয়। ৮ ॥ আবার এই অব্যক্তই জ্ঞান, পঞ্চবিংশক পুরুষ জ্ঞেয়; এই জ্ঞানরূপ অব্যক্তের বিজ্ঞাতা আবার পঞ্চবিংশক পুরুষ। ৯ ॥ বিদ্যা ও বিদ্যার্থ আমি বিশেষরূপে তত্ত্বের সহিত তোমাকে বলিলাম; এক্ষণে ক্ষর ও অক্ষর বলিয়া যাহা উক্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর। ১০ ॥ এই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই ক্ষর ও অক্ষর এই উভয়রূপে ব্যাখ্যাত করা যায়, ইহার কারণ যথাযথরূপে বলিতেছি।১১॥ এই উভয়ই অনাদিনিধন (উৎপত্তিক্ষয়রহিত) অতএব ঈশ্বর; জ্ঞানিগণ উভয়কেই তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১২ ॥ সৃষ্ট বস্তুসকল প্রলয়ধর্ম্মযুক্ত, এই নিমিত্ত

গুণানাং মহদাদীনামুৎপত্তিশ্চ পরস্পরম্।
অধিষ্ঠানাৎ ক্ষেত্রমাহুরেতত্তৎ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ১৪ ॥
যদা তু গুণজালং তদব্যক্তাত্মনি সঙ্ক্ষিপেৎ।
তদা সহগুণৈস্তৈস্তু পঞ্চবিংশো বিধীয়তে ॥ ১৫ ॥
গুণা গুণেষু লীয়ন্তে তদৈকা প্রকৃতির্ভবেৎ।
ক্ষেত্রজ্ঞোঽপি যদা তাত তৎক্ষেত্রে সম্প্রলীয়তে ॥ ১৬ ॥
তদা ক্ষরত্বং প্রকৃতির্গচ্ছতে গুণসংশ্রিতা।
নির্গুণত্বং চ বৈদেহ গুণেষ্বপ্রতিবর্ত্তনাৎ ॥ ১৭।
এবমেব চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রজ্ঞানপরিক্ষয়ে।
প্রকৃত্যা নির্গুণস্ত্বেষ ইত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ১৮ ॥

অব্যক্তকে অক্ষর বলা যায়; অব্যক্ত হইতেই পুনঃ পুনঃ এই গুণসৃষ্টি হইতেছে। ১৩। মহদাদি গুণসকলের উৎপত্তি পরপর ইহা হইতেই হয়; পুরুষ ইহাতে সর্ব্বদাই অধিষ্ঠিত আছেন, এই নিমিত্তই ইহাকে ক্ষেত্র বলে। এইরূপে প্রকৃতিও অক্ষররূপে কীর্ত্তিত হয়। এক্ষণে পুরুষের অক্ষরত্ব নির্দ্দেশিত হইতেছে; এই যে পঞ্চবিংশক পুরুষ ইনি বাস্তবিক "তৎ" অর্থাৎ পরমাত্মাস্বরূপ। ১৪ ॥ যখন তিনি সেই অব্যক্ত পরমাত্মরূপতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গুণজাল দূরে নিক্ষেপ করেন, তখনই তিনি "তৎ" পদবাচ্য হয়েন; কিন্তু গুণের সহিত যখন যুক্ত থাকেন, তখন পঞ্চবিংশক বলিয়া আখ্যাত হয়েন।১৫॥ হে তাত! যখন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষও ক্ষেত্রে লয় প্রাপ্ত হন (যখন জীবাত্মা প্রকৃতি তত্ত্বে লীন হয়েন) তখন প্রকাশিত গুণসমুদয়ও গুণাত্মিকা প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং একা প্রকৃতিই অবশিষ্ট থাকেন। ১৬ ॥ পুরুষ যখন পরমাত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গুণে প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, তখনই তাঁহার নির্গুণত্ব হয়, তখন গুণাত্মক প্রকৃতিও ক্ষর-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ১৭ ॥ এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে, এই পুরুষ নিজের প্রকৃত নির্গুণ-

ক্ষরো ভবত্যেষ যদা তদা গুণবতীমথ।
প্রকৃতিং ত্বভিজানাতি নির্গুণত্বং তথাত্মনঃ॥ ১৯॥

* * * * *

৩০৮ অধ্যায়।

বসিষ্ঠ উবাচ।

অথ বুদ্ধমথাবুদ্ধমিমং গুণবিধিং শৃণু।
আত্মানং বহুধা কৃত্বা তান্যেব প্রবিচক্ষতে॥ ১॥
এতদেবং বিকুর্ব্বাণো বুধ্যমানো ন বুধ্যতে।
গুণান্ ধারয়তে হ্যেষ সৃজত্যাক্ষিপতে তদা॥ ২॥
অজস্রং ত্বিহ ক্রীড়ার্থং বিকরোতি জনাধিপ।
অব্যক্তবোধনাচ্চৈব বুধ্যমানং বদন্ত্যপি॥ ৩॥

স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন, ইহা শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছে। ১৮॥ যখন প্রকৃতি সংযুক্ত হয়েন, তখনই তিনি ক্ষর, তখন গুণাত্মিকা প্রকৃতি স্বরূপলাভ করিয়া প্রকৃতিকেই জ্ঞানগম্য করেন, আবার যখন পরমাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠ হয়েন, তখনই তিনি নির্গুণ অক্ষর বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। ১৯॥

বসিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্! অনন্তর বুদ্ধ পরমাত্মা ও গুণসকলের বিধিকর্ত্তা (নিয়ামক) এবং অবুদ্ধ জীবের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। আত্মাকে ইনি বহুধা বিভক্ত করিয়া তৎসকল সম্যক্ দর্শন করেন। ১॥ এইরূপ করিয়া তিনি তাহার বোদ্ধা হয়েন; সুতরাং তাঁহার স্বরূপবোধ লুপ্ত হয়; গুণসকলকে তখন তিনি স্বীয়রূপে ধারণ করেন এবং তাহার সৃষ্টি ও বিনাশসাধন করেন। ২॥ হে রাজন্, এইরূপ ক্রীড়াচ্ছলে তিনি অজস্র বিকার প্রাপ্ত হন; প্রকৃতির গুণসকল এইরূপে জ্ঞাত হয়েন বলিয়া তাঁহাকে তদ্বোদ্ধা (ক্ষেত্রজ্ঞ) বলা যায়। ৩॥

ন ত্বেব বুধ্যতে ব্যক্তং সগুণং তাত নির্গুণম্।
কদাচিত্ত্বেব খল্বেতদাহুরপ্রতিবুদ্ধকম্॥ ৪॥
বুধ্যতে যদিবাব্যক্তমেতদ্বৈ পঞ্চবিংশকম্।
বুধ্যমানো ভবত্যেব সঙ্গাত্মক ইতি শ্রুতিঃ॥
অনেনাপ্রতিবুদ্ধেতি বদন্ত্যব্যক্তমচ্যুতম্॥ ৫॥
অব্যক্তবোধনাচ্চাপি বুধ্যমানং বদন্ত্যত।
পঞ্চবিংশং মহাত্মানং ন চাসাবপি বুধ্যতে॥ ৬॥
ষড়্‌বিংশং বিমলং বুদ্ধমপ্রমেয়ং সনাতনম্।
সততং পঞ্চবিংশং চ চতুর্ব্বিংশং চ বুধ্যতে॥ ৭॥
দৃশ্যাদৃশ্যে হ্যনুগতং স্বভাবেন মহাদ্যুতে।
অব্যক্তমত্র তদ্ব্রহ্ম বুধ্যতে তাত কেবলম্॥ ৮॥
কেবলং পঞ্চবিংশঞ্চ চতুর্ব্বিংশং ন পশ্যতি।
বুধ্যমানো যদাত্মানমন্যোঽহমিতি মন্যতে॥ ৯॥

সগুণ ব্যক্তা প্রকৃতি নিগুণকে কখনও জানিতে পারেন না; অতএব তাঁহাকে অপ্রতিবুদ্ধ বলা যায়। ৪॥ পঞ্চবিংশপুরুষ প্রকৃতির অবয়বের বোদ্ধা হয়েন বলিয়া, তৎসঙ্গবশতঃ প্রকৃতিও সেই বোধশক্তি প্রাপ্ত হয়েন; ইহাই শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিমিত্তই অব্যক্ত এবং অচ্যুত হইলেও প্রকৃতিস্থ পঞ্চবিংশ জীবকে অপ্রতিবুদ্ধ বলা হয়। ৫॥ কিন্তু প্রাকৃতিক গুণসকলকে বোধ করাতেই আবার পঞ্চবিংশ পুরুষ বোদ্ধা বলিয়াও গণ্য হয়েন; পরন্তু তদবস্থায় তাঁহার স্বরূপবোধ থাকে না। ৬॥ কিন্তু ষড়্‌বিংশ আত্মা সর্ব্বদাই বিমল, বুদ্ধ, অপ্রমেয়, এবং সনাতন; তিনি সতত চতুর্ব্বিংশ ও পঞ্চবিংশ উভয়কে দর্শন করেন। ৭॥ হে মহাদ্যুতে! এই ব্যক্তাব্যক্ত জগতে ষড়্‌বিংশ আত্মা স্বভাবতঃই অনুগত হয়েন; এই অব্যক্ত, কেবল, (নির্গুণ, একরূপ) বস্তুই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ৮॥ পঞ্চবিংশক পুরুষ যখন সেই গুণাতীত (কেবল) পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হয়েন, এবং চতুর্বিংশ গুণবর্গকে দর্শন না করেন, তখন তিনিও সেই কেবল বস্তু

তদা প্রকৃতিমানেষ ভবত্যব্যক্তলোচনঃ।
বুধ্যতে চ পরাং বুদ্ধিং বিমলামমলাং যদা ॥ ১০
ষড়্‌বিংশো রাজশার্দ্দূল তথা বুদ্ধত্বমাব্রজেৎ।
ততস্ত্যজতি সোঽব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্ম্মি বৈ ॥ ১১ ॥
নির্গুণঃ প্রকৃতিং বেদ গুণযুক্তামচেতনাম্।
ততঃ কেবলধর্ম্মাসৌ ভবত্যব্যক্তদর্শনাৎ ॥ ১২ ॥
কেবলেন সমাগম্য বিমুক্তোঽত্মানমাপ্নুয়াৎ।
এতত্তু তত্ত্বমিত্যাহুর্নিস্তত্ত্বমজরামরম্ ॥ ১৩ ॥

* * * * *

ব্রহ্মই হয়েন; আপনাকে প্রকৃতিহইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন। ৯॥ যখন তিনি পরমাত্মা সম্বন্ধীয় নির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করেন, তখন এই প্রকৃতিস্থ পুরুষের নির্ব্বিকার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। ১০॥ হে রাজ-শার্দ্দূল! তখন সেই ষড়্‌বিংশ পরমাত্মা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়েন, এবং সেই মর্ত্ত্য মানবও তখন অব্যক্তা প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। ১১॥ গুণযুক্তা অচেতন প্রকৃতিকে নির্গুণ পুরুষ (প্রথম) দর্শন করেন; পরে পুনরায় (আপন) অব্যক্ত আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়া, কেবলত্ব (নির্গুণত্ব) প্রাপ্ত হয়েন। ১২॥ নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই, তিনি বিমুক্ত এবং স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়েন। এই পুরুষই (প্রকৃতি সংযোগে) পঞ্চবিংশ-সংখ্যক তত্ত্ব এবং নির্গুণ ব্রহ্মদর্শনে জরামরণশূন্য নিত্য নিস্তত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ১৩॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, যাজ্ঞবল্ক্য-জনক-সংবাদ।

এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্য-জনক-সংবাদ যাহা বৃহদারণ্যকোপনিষদে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, তাহা নানা অধ্যায়ে শান্তিপর্ব্বের ৩১০তম অধ্যায়হইতে বেদব্যাস বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

৩১৮ অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

অব্যক্তস্থং পরং যত্তৎ পৃষ্টস্তেঽহং নরাধিপ।
পরং গুহ্যমিমং প্রশ্নং শৃণুষ্বাবহিতো নৃপ ॥ ১ ॥

* * *

অব্যক্তং প্রকৃতিং প্রাহুঃ পুরুষেতি চ নির্গুণম্।
তথৈব মিত্রং পুরুষং বরুণং প্রকৃতিং তথা ॥ ৩৯ ॥
জ্ঞানং তু প্রকৃতিং প্রাহুর্জ্ঞেয়ং নিষ্কলমেব চ।
অজ্ঞশ্চ জ্ঞশ্চ পুরুষস্তস্মান্নিষ্কল উচ্যতে ॥ ৪০ ॥
কস্তপা অতপাঃ প্রোক্তঃ কোঽসৌ পুরুষ উচ্যতে।
তপাস্ত প্রকৃতিং প্রাহুরতপা নিষ্কলঃ স্মৃতঃ ॥ ৪১ ॥
তথৈবাবেদ্যমব্যক্তং বেদ্যঃ পুরুষ উচ্যতে।
চলাচলমিতি প্রোক্তং ত্বয়া তদপি মে শৃণু ॥ ৪২ ॥

৩১৮ অধ্যায়—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে নরাধিপ ! অব্যক্তস্থ পুরুষ এবং আত্মার বিষয় তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এই প্রশ্ন অতি গুহ্য-বিষয়ক, অতএব, হে নৃপ ! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।১॥ * * * অব্যক্তকে (স্ত্রীরূপা) প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এবং নির্গুণ আত্মাই প্রকৃতিস্থ হইয়া পুরুষ নামে উক্ত হয়েন, এইরূপ পুরুষ মিত্র নামে উক্ত হয়েন, এবং প্রকৃতি বরুণ নামে উক্ত হইয়াছেন। ৩৯ ॥ প্রকৃতিকে জ্ঞান নামে এবং আত্মাকে নিষ্কল (কলাশূন্য) পূর্ণ, নামেও উক্ত করা হয়, পুরুষ অজ্ঞ এবং জ্ঞ এই উভয়রূপী হওয়াতেই তিনি পূর্ণ। ৪০ ॥ তপা কাহাকে বলে, অতপা কাহাকে বলে, এবং এই জীবের স্বরূপ কি, তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে। প্রকৃতিকেই তপা বলে এবং নিষ্কল ব্রহ্মই অতপা। ৪১ ॥ এইরূপে

চলাং তু প্রকৃতিং প্রাহুঃ কারণং ক্ষয়সর্গয়োঃ।
আক্ষেপঃ সর্গয়োঃ কর্ত্তা নিশ্চলঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৩ ॥
অথৈব বেদ্যমব্যক্তমবেদ্যঃ পুরুষস্তথা।
অজ্ঞাবুভৌ ধ্রুবৌ চৈব অক্ষয়ৌ চাপ্যুভাবপি ॥ ৪৪ ॥
অজৌ নিত্যাবুভৌ প্রাহু রধ্যাত্মগতিনিশ্চয়াৎ ॥ ৪৫ ॥
অক্ষয়ত্বাৎ প্রজননে অজমত্রাহুরব্যয়ম্।
অক্ষয়ং পুরুষং প্রাহুঃ ক্ষয়ো হ্যস্য ন বিদ্যতে ॥ ৪৬ ॥
গুণক্ষয়ত্বাৎ প্রকৃতিঃ কর্ত্তৃত্বাদক্ষয়ং বুধাঃ।
এষা তেহন্বীক্ষিকী বিদ্যা চতুর্থী সাম্পরায়িকী ॥ ৪৭ ॥

* * * *

অব্যক্তা প্রকৃতিকেই অবেদ্য বলে, এবং পুরুষকেই বেদ্য বলে; আর তুমি যে "চল" ও "অচল" কি, জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪২ ॥ সর্গ ও ক্ষয়ের কারণভূতা প্রকৃতিকেই চলা বলা যায়, আর প্রলয় ও সৃষ্টির কর্ত্তা যে পুরুষ, তিনিই নিশ্চল বলিয়া উক্ত হয়েন। ৪৩ ॥

এইরূপে আবার (সৃষ্ট জগতে) প্রকৃতিই বেদ্য বলিয়া উক্ত হয়েন, এবং আত্মার অদৃশ্যত্ব-নিবন্ধন তিনি অবেদ্য বলিয়া উক্ত হয়েন; আবার পরমাত্মা (সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি-বিরহিত হওয়ায় জ্ঞান-বৃত্তিও তাহাতে নাই সুতরাং তিনি) ও অজ্ঞ, প্রকৃতও অজ্ঞ। পুনশ্চ উভয়ই ধ্রুব, উভয়ই অবিনাশী, অজ ও নিত্য; ইহা অধ্যাত্মজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। ৪৪। ৪৫ ॥ জায়মান সৃষ্ট বস্তুতে তাঁহার অক্ষয়ত্বহেতু তাঁহাকে অজ বলা যায়, পুরুষের ক্ষয় হয় না, তিনি অক্ষয়। ৪৬ ॥ গুণসৃষ্টি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, প্রকৃতি স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সৃষ্টি কার্য্য করিয়া থাকেন, (সুতরাং সৃষ্টির বিনাশে তাঁহার বিনাশ হয় না), অতএব জ্ঞানিগণ তাঁহাকে অক্ষয় বলিয়া থাকেন। ইহাকেই অন্বীক্ষিকী চতুর্থস্থানীয়া সাম্পরায়িকী নাম্নী ব্রহ্মবিদ্যা বলে। ৪৭ ॥

দ্রষ্টব্যৌ নিত্যমেবৈতৌ তৎপরেণান্তরাত্মনা।
যথাস্য জন্মনিধনে ন ভবেতাং পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৩ ॥
অজস্রং জন্মনিধনং চিন্তয়িত্বা ত্রয়ীমিমাম্।
পরিত্যজ্য ক্ষয়মিহ অক্ষয়ং ধর্ম্মমাস্থিতঃ ॥ ৫৪ ॥
যদাঽপশ্যতেঽত্যন্তমহন্যহনি কাশ্যপ।
তদা স কেবলীভূতঃ ষড়্বিংশমনুপশ্যতি ॥ ৫৫ ॥
অন্যশ্চ শাশ্বতোঽব্যক্ত-স্তথাঽন্যঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তস্য দ্বাবনুপশ্যেতাং তমেকমিতি সাধবঃ ॥ ৫৬ ॥
তে নৈতন্নাভিনন্দন্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতম্।
জন্মমৃত্যুভয়োদ্‌যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ পরমৈষিণঃ ॥ ৫৭ ॥

* * *

বেদ্য পুরুষ ও অবেদ্য প্রকৃতি এই উভয়কে "তৎ"-পদার্থ-ব্রহ্মের সহিত একাত্মরূপে যিনি নিত্য সমাহিত চিত্তে দর্শন করেন, তিনি জন্মমৃত্যু পাশ হইতে বিমুক্ত হয়েন। ৫৩ ॥ এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম চিন্তা করিয়া ক্ষয়াত্মক অজস্র জন্মমৃত্যু-পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ৫৪ ॥ হে কাশ্যপ! যখন সাধক পুরুষ প্রতিনিয়ত সম্যক্‌রূপে এই ধ্যানে স্থিত হয়েন, তখন তিনি কেবলীভূত হইয়া ষড়্বিংশ পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন। ৫৫ ॥ শাশ্বত অব্যক্ত (প্রকৃতি) এবং পঞ্চবিংশক পুরুষ, ইঁহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন; ইঁহাদিগের উভয়ের দ্রষ্টা এক পরমাত্মা; ইহা সাধু-সকল জ্ঞাত আছেন। ৫৬ ॥ জন্মমৃত্যু-ভয়ে উদ্বেগবিশিষ্ট সাংখ্য ও যোগ-মার্গাবলম্বী ব্রহ্মপরায়ণ মনুষ্যগণ যে পঞ্চবিংশক জীব ও অচ্যুত ব্রহ্মের একত্ব অভিনন্দন করেন না, এমন নহে। ৫৭ ॥

অবুধ্যমানাং প্রকৃতিং বুধ্যতে পঞ্চবিংশকঃ।
ন তু বুধ্যতি গন্ধর্ব্ব প্রকৃতিঃ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ৭০ ॥
অনেন প্রতিবোধেন প্রধানং প্রবদন্তি তৎ।
সাংখ্যযোগাশ্চ তত্ত্বজ্ঞা যথাশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ৭১ ॥
পশ্যংস্তথৈব চাপশ্যন্ পশ্যত্যন্যঃ সদানঘ।
ষড়্‌বিংশং পঞ্চবিংশঞ্চ চতুর্ব্বিংশঞ্চ পশ্যতি ॥ ৭২ ॥
ন তু পশ্যতি পশ্যংস্ত যশ্চৈনমনুপশ্যতি।
পঞ্চবিংশোঽভিমন্যেত নান্যোঽস্তি পরতো মম ॥ ৭৩ ॥
ন চতুর্ব্বিংশকো গ্রাহ্যো মনুজৈর্জ্ঞানদর্শিভিঃ।
মৎস্যশ্চোদকমন্বেতি প্রবর্ত্তেত প্রবর্ত্তনাৎ ॥ ৭৪ ॥

হে গন্ধর্ব্ব! পঞ্চবিংশক পুরুষ জড়রূপা প্রকৃতিকে দর্শন করেন; কিন্তু প্রকৃতি পঞ্চবিংশক পুরুষকে দর্শন করেন না। ৭০॥ সাংখ্য ও যোগমার্গাবলম্বী তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ শ্রুতিপ্রমাণ অনুসারে বলেন যে, প্রকৃতি পুরুষযুক্ত হইয়া বোধন সমর্থ হয়েন, এই নিমিত্ত তিনি প্রধান নামে আখ্যাত। ৭১॥ হে অনঘ! দ্রষ্টাপুরুষ ও অচেতন প্রকৃতি সদাই অন্য পুরুষের দৃষ্টির বিষয়রূপে অবস্থিত; সেই পুরুষই ষড়্‌বিংশাখ্য; যিনি পঞ্চবিংশক পুরুষ এবং চতুর্ব্বিংশ-পর্ব্ব-সমন্বিত প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া থাকেন। ৭২॥ কিন্তু যে পরমপুরুষ এই উভয়কে দর্শন করেন, তিনি বাস্তবিক দর্শন করিয়াও অদ্রষ্টাবৎই থাকেন। পঞ্চবিংশ পুরুষ তাঁহাকে লাভ করিলেই তৎস্বরূপ হয়েন; আর তাঁহাহইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই বলিয়া মনে করেন। ৭৩॥ জ্ঞানদর্শী মনুষ্যগণ গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করেন না; মৎস্য যেরূপ জলকে অনুসরণ করিয়া থাকে—তৎপ্রতি প্রবৃত্তিহেতু তাহাতেই বাস করিয়া থাকে, তাহাতে স্থিত হইলেই মৎস্য স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া বিচরণ করে, তদ্রূপ পঞ্চবিংশ পুরুষও, গুণসকলে আসক্তি-নিবন্ধন,

তথৈব বুধ্যতে মৎস্যস্তথৈষোঽপ্যনুবুধ্যতে।
সস্নেহাৎ সহবাসাচ্চ সাভিমানাচ্চ নিত্যশঃ॥ ৭৫ ॥
স নিমজ্জতি কালস্য যদৈকত্বং ন বুধ্যতে।
উন্মজ্জতি হি কালস্য সমত্বেনাভিসংবৃতঃ॥ ৭৬ ॥
যদা তু মন্যতেঽন্যোঽহমন্য এষ ইতি দ্বিজঃ।
তদা স কেবলীভূতঃ ষড়্বিংশমনুপশ্যতি॥ ৭৭ ॥
অন্যশ্চ রাজন্যবরস্তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তৎস্থানাচ্চানুপশ্যন্তি এক এবেতি সাধবঃ॥ ৭৮ ॥
তেনৈতন্নাভিনন্দন্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতম্।
জন্মমৃত্যুভয়াদ্ভীতা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ কাশ্যপ॥

তাহাদের সহিত সহবাস-নিবন্ধন, এবং তৎপ্রতি আত্মবুদ্ধি-নিবন্ধন, নিত্য তৎসঙ্গেই সংজ্ঞালাভ করেন। ৭৪। ৭৫॥ যতক্ষণ তিনি ব্রহ্মের সহিত একত্ব বোধ করিতে না পারেন, ততক্ষণই তিনি কালবশ হইয়া গুণরূপ জলে মৎস্যের ন্যায় নিমগ্ন হইয়া থাকিতে ভালবাসেন ও থাকেন; আবার কালক্রমে যখন তিনি পরমাত্মার সহিত আপনাকে অভিন্ন জানিয়া তাঁহাকেই সম্যক্‌রূপে বরণ করেন, তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করেন, তখনই তিনি অগাধ গুণরূপ জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হয়েন। ৭৬॥

যখন ব্রাহ্মণ গুণবর্গকে এবং আপনাকে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করেন, তখন তিনি কেবলীভূত হয়েন এবং ষড়্বিংশ পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করেন। ৭৭॥ হে রাজন্যশ্রেষ্ঠ! পরমাত্মা অন্য, এবং পঞ্চবিংশক পুরুষ অন্য; কিন্তু পঞ্চবিংশক পুরুষের পরমাত্মাতেই অবস্থিতি; অতএব সাধুগণ এই পঞ্চবিংশক জীবকে পরমাত্মার সহিত এক বলিয়াই দর্শন করেন।৭৮। অতএব হে কাশ্যপ! যোগ ও সাংখ্যমার্গাবলম্বিগণ জন্মমৃত্যু পরিহার করিবার নিমিত্ত পঞ্চবিংশক জীবকেই অবিনাশী বলিয়া অভিমত করেন

ষড়্‌বিংশমনুপশ্যন্তঃ শুচয়স্তৎপরায়ণাঃ ॥ ৭৯ ॥
যদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি।
তদা স সর্ব্ববিদ্ বিদ্বান্ ন পুনর্জন্ম বিন্দতি ॥ ৮০ ॥

না; তাঁহারা শুচি হইয়া, ষড়্‌বিংশ পরমাত্ম-পরায়ণ হইয়া, তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। ৭৯ ॥ যখন এই পঞ্চবিংশক পুরুষ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হইয়া, ষড়্‌বিংশ পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও পূর্ণ-মনোরথ হয়েন এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ৮০ ॥

(গ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভারতবর্ষীয় সর্ব্ববিধ সাধক-সম্প্রদায়ের পরমাদরণীয় গ্রন্থ, ইহার প্রামাণিকতা সর্ব্ববাদিসম্মত। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই গীতার বক্তা। ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগতত্ত্ব ইহাতে যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ ১৫শ অধ্যায়।

অন্বয়ার্থঃ—ক্ষরস্বভাব এবং অক্ষরস্বভাব দুই প্রকার পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সমুদয় ভূতগণ ক্ষরস্বভাব, এবং কূটস্থ পুরুষ (জীব) অক্ষর স্বভাব বলিয়া উক্ত হয়েন। উত্তম পুরুষ, এই দুই হইতেই ভিন্ন ইনি পরমাত্মা নামে কথিত হয়েন। ইনিই ঈশ্বর, ইনি সদা নির্ব্বিকার, এবং ইনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা ভরণ করিতেছেন।

এই কূটস্থ পুরুষও (জীব) উত্তম পুরুষেরই অংশ বিশেষ ঃ—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ-ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥ (১৫শ অধ্যায়)

অন্বয়ার্থঃ—আমারই অংশ, যাহা অনাদি কাল হইতে জীবরূপে স্থিত, এবং জীবলোকে জীব বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা প্রকৃতিতে অবস্থিত (অর্থাৎ সুষুপ্তি প্রলয়াদিকালে অব্যক্তাবস্থাপ্রাপ্ত) মনঃ ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে উপভোগার্থ আকর্ষণ করে।

এই জীবাংশই জগতে প্রকাশপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু উত্তম-পুরুষ, যিনি ঈশ্বর, তিনি জগতে অপ্রকাশ থাকেন—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥ (১৫শ অধ্যায়)

অন্বয়ার্থঃ—তাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র অথবা অগ্নি (যাঁহারা জগতের অপর সকলবস্তুর প্রকাশক, তাঁহারা) প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, আর সংসারে আবর্ত্তন ঘটে না, তাহাই আমার পরমস্বরূপ।

সংসারের অপর সকল বস্তু ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায়; অতএব জগৎকে জ্ঞাত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু পরব্রহ্ম এই সকল করণ দ্বারা জ্ঞাত হয়েন না। কেবল গুরুর উপদেশ-অনুসারে কঠিন সাধন-দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়; এবং তিনি কাহার জ্ঞাত হইলে, আর জ্ঞাতব্যবিষয় কিছু থাকে না; অতএব তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়বস্তু বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয়েন। তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন——

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥

(১৩শ অধ্যায়)

অন্বয়ার্থ :—যাহা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি ; ইহা জানিলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে। (সেই জ্ঞেয় বস্তু) নিত্য, তাঁহার আদি নাই, তিনিই পরব্রহ্ম। তিনি জাগতিক কোন বস্তুর ন্যায় সত্তাবিশিষ্ট নহেন, অথচ তাঁহাকে অসৎও বলা যায় না। তিনি সকল দিকে হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বদিকে চক্ষুঃ মস্তক মুখ ও শ্রবণ-বিশিষ্ট, (অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্), সর্ব্বলোক ও সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গুণরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়েন (অথবা সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক) অথচ তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। তিনি কিছুতে সঙ্গযুক্ত নহেন (সকলপ্রকার গুণের অতীত), অথচ গুণসকলকে আশ্রিতরূপে ধারণ করিতেছেন ; তিনি নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা। তিনি জীবগণের বাহিরে ও অন্তরে আছেন ; স্থাবর ও জঙ্গম সকলই তিনি ; এবঞ্চ তিনি অতিসূক্ষ্ম ; অতএব বুদ্ধিগম্য নহেন ; তিনি দূরস্থিত অথচ সন্নিহিত। তিনি জীবগণের মধ্যে অবিভক্ত (একরূপে অবস্থিত), অথচ তিনি বিভক্তের ন্যায় স্থিত। তিনিই ভূতগণের পালনকর্ত্তা, সংহারকর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি সূর্য্যাদি প্রকাশকদিগেরও প্রকাশক ; তিনি তমোরূপা প্রকৃতির অতীত ; তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য, এবং সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত।

এইস্থলে বেদব্যাস ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব (সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব) স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিলেন।

ক্ষরস্বভাব পুরুষ বলিয়া যাঁহাকে পূর্ব্বে উক্তি করা হইয়াছে, তাঁহার নাম প্রকৃতি, এবং কূটস্থ অক্ষর-পুরুষ বলিয়া যিনি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই সচরাচর পুরুষ নামে আখ্যাত করা যায়। এই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি ; তাঁহাদের উভয়ের মিলন দ্বারা এই কার্য্যকারণাত্মক বিশ্ব রচিত হইয়াছে। উত্তম পুরুষই পরমাত্মা বলিয়া আখ্যাত ; প্রকৃতিকে ক্ষেত্র বলে এবং পুরুষকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে।

শ্রীভগবান্ এতদ্বিষয়ে বলিতেছেন—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯ ॥
কার্য্যকারণ-কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২০ ॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২১
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২২

* * * * *

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৬
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭ (১৩শ অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার, এবং সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিসকল প্রকৃতিহইতে জাত

জানিবে। কার্য্য কারণ ও কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হয়েন, আর সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্ব বিষয়ে পুরুষই হেতু বলিয়া উক্ত হয়েন। পুরুষ প্রকৃতিগত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসকল ভোগ করেন। এই গুণসকলের সংসর্গই তাঁহার উত্তম ও অধম প্রভৃতি যোনিসকলে পুনঃ পুনঃ জন্মের কারণ। কিন্তু উত্তম পুরুষ দেহস্থিত হইয়াও কেবল সাক্ষিমাত্র, অনুগ্রাহক, নিয়ন্তা, প্রতিপালক, ভোগদাতা, ও সর্ব্বশক্তিমান্; সেই উত্তম পুরুষই পরমাত্মা নামে কথিত হয়েন। * * * হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যে কোন স্থাবর বা জঙ্গম জীব উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগহইতে হয় জানিবে। কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বজীবে সমভাবে অবস্থিত, এবং সকলের বিনাশেও পরমাত্মা নিত্য অবিনাশী ও অপরিবর্ত্তনীয়রূপে অবস্থান করেন; এইরূপ যিনি তাঁহাকে জানেন, তিনিই সম্যক্ জ্ঞাতা।

এই প্রকৃতি, যাঁহাকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে, তিনি নানারূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া, অবস্থিত আছেন। তৎসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫

* * * * *

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার মুদাহৃতম্॥ ৬ (১৩ অধ্যায়)

অন্যার্থঃ—পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম), অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত (প্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয় * ১) পঞ্চ তন্মাত্র, এই

* ইন্দ্রিয়কে দশ সংখ্যক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, মনঃ-নামক ইন্দ্রিয়কে পৃথক রূপে উল্লেখ করা হয় নাই; কারণ মনঃ সাধারণতঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়াই প্রকাশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই স্থানে মনের পৃথক্‌রূপে উল্লেখ

সকল রূপেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রকার বিকার সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করা হয়। *

এইস্থলে যে 'অব্যক্ত' উক্ত হইয়াছে, ইহাকেই প্রকৃতি বলে। এই অব্যক্তই বিকারপ্রাপ্ত হওয়াতে, তদ্বিকারস্বরূপে বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) প্রভৃতি ক্ষিতি পর্য্যন্ত সমুদয় সৃষ্টি একবার প্রকাশিত হয়, পুনরায় লয় প্রাপ্ত হয়, এবং পুনরায় প্রকাশিত হয়; এইরূপে সৃষ্টি ও লয়-কার্য্য পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মশীল জগতের কারণরূপা এই অব্যক্তা প্রকৃতিরও আশ্রয়রূপে পরমব্যক্ত সনাতন ব্রহ্ম নিত্য অবিচলিতরূপে অবস্থিত আছেন। তৎসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭ ॥
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮ ॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯ ॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০ ॥

না হইলেও অন্যত্র উল্লেখ হইয়াছে; তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। মনের সহিত প্রকৃতি চতুর্ব্বিংশতিরূপা। ইহাই সাংখ্যমত। সুতরাং এই মতের সহিত বেদব্যাসের কোন বিরোধ নাই।

* ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ক্ষেত্রের সহিত মিলিত হওয়াতে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, শরীরে জীবাভিমান ও ধৈর্য্য উৎপন্ন হয়; তাহাও প্রকৃতির অঙ্গ বলিয়া বিশেষরূপে এই ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল পৃথক্ তত্ত্ব নহে। ক্ষেত্রযুক্ত পুরুষের অবিদ্যা জনিত ভোগরূপ ফল উৎপন্ন হয়; তাহাও শ্রীভগবান্ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ইহা সাংখ্য ও যোগসূত্রের ব্যাখ্যানে বিশেষরূপে কথিত হইবে।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ২২॥ (৮ম অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—সহস্রযুগপর্য্যন্ত কাল ব্রহ্মার একদিন, এবং সহস্রযুগপর্য্যন্ত কাল তাঁহার রাত্রি, যে সকল ব্যক্তি ইহা অবগত আছেন, তাঁহারা প্রকৃত অহোরাত্র-বেত্তা। ব্রহ্মার দিবসাগমে এই (কারণরূপ) অব্যক্ত হইতে সমুদয় ব্যক্ত (চরাচর প্রাণী) প্রাদুর্ভূত হয়, এবং তাঁহার রাত্রির উপক্রমে সেই অব্যক্ত-সংজ্ঞক প্রকৃতিতেই সমুদয় প্রলীন হয়। হে পার্থ, এই ব্যক্ত চরাচর ভূতসকল বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, রাত্রি-সমাগমে প্রলীন হয়. এবং পুনরায় দিবসাগমে অবশ হইয়া (নিজের ইচ্ছা ব্যতিরেকে অবশভাবে পুনরায়) প্রাদুর্ভূত হয়। কিন্তু সেই চরাচরের কারণভূত অব্যক্তহইতেও শ্রেষ্ঠ (তাঁহারও আশ্রয়রূপে স্থিত) সনাতন আর একটি অব্যক্ত ভাব আছে. যাহা সমুদয় বিশ্ব বিনষ্ট হইলেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। তিনি অব্যক্ত, অক্ষর (নিত্য একরূপে বিরাজমান), তাঁহাকেই পরমা গতি বলে (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর এবং সমগ্রবিশ্বের শেষ আশ্রয় তিনি)। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে কাহাকেও পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হয় না। ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ ধাম, (যাহাতে আমি স্বরূপে অবস্থান করি)। হে পার্থ, যাঁহাতে সমস্ত জীবগণ প্রতিষ্ঠিত আছে, যিনি সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন,—একান্ত ভক্তিদ্বারাই সেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ক্ষর ও অক্ষররূপে যে পুরুষদ্বয়, পুরুষোত্তমের অঙ্গভূত বলিয়া প্রথমে উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই পুনরায় ভগবান্ স্বীয় অঙ্গীভূতা প্রকৃতি নামে বর্ণনা করিয়াছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭॥ (৭ম অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, আমার এই অষ্টবিধা প্রকৃতি।* হে মহাবাহো, এই অষ্টবিধ প্রকৃতি কিন্তু অপরা (অশ্রেষ্ঠা) বলিয়া উক্ত হয়েন; ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টা জীবরূপা আমার আর একটি প্রকৃতি আছে, তাহা তুমি অবগত হও। এই শেষোক্ত প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই দ্বিবিধ প্রকৃতি-যোগেই সমস্ত ভূতগ্রাম প্রকাশিত হইয়াছে, জানিও। আমি এই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও লয়-স্থান। হে ধনঞ্জয়, আমাহইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, সূত্রে মণিগণের ন্যায়, আমাতে এই সমস্তজগৎ গ্রথিত আছে।

কিন্তু এই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াও, যে ভগবান্ উত্তম পুরুষ তাঁহার আশ্রয়রূপে তৎসমস্তের অতীতভাবে, স্বরূপতঃ বর্ত্তমান আছেন, তাহা নিম্নলিখিতরূপে শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন—

---

* এই স্থলে দশ ইন্দ্রিয়কে মনোনামক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ভুক্ত করা হইয়াছে; যেমন পূর্ব্বে দশেন্দ্রিয়ের মধ্যে মনকে ভুক্ত করা হইয়াছে, এইস্থলে তদ্রূপ দশ ইন্দ্রিয়কে মনো নামক ইন্দ্রিয়ে ভুক্ত করাতে, তাহা পৃথকরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। অব্যক্তা প্রকৃতি অপ্রকাশধর্ম্মা; অতএব তাঁহাকে পৃথকরূপে বর্ণনা করা হয় নাই এবং শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চকে, পঞ্চ মহাভূতের মধ্য ভুক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং পৃথকরূপে ইহাদিগেরও বর্ণনা করা হয় নাই।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥১৪॥ (৭ম অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব সৃষ্ট আছে, তৎসমস্তই আমাহইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও; তৎসমস্ত আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমাতেই বর্ত্তমান আছে; কিন্তু আমি স্বরূপতঃ তৎসমস্তহইতে অতীতরূপে বর্ত্তমান আছি। এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবদ্বারা এই সমুদয় জগৎ মোহিত আছে; সুতরাং ইহাদিগের অতীত আমার যে নিত্য স্বরূপ, তাহা জানিতে পারে না। আমার এই গুণময়ী মায়া অতিশয় শক্তিশালিনী, ইহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য; যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়েন, কেবল তাঁহারাই আমার এই মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন।

ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতা, যন্নিবন্ধন গুণসকলের নিত্য দ্রষ্টা হইয়াও তিনি তাহাতে আবদ্ধ হয়েন না, তাহা এই অধ্যায়ের ৩য় প্রকরণের শেষভাগে বিবৃত হইয়াছে। ইহাই শ্রীভগবান্ স্পষ্টরূপে গীতায়ও বলিয়াছেন:—

"বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬॥ (৭ম অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই সম্যক্‌রূপে অবগত আছি; কিন্তু আমাকে কেহ অবগত নহে।

শ্রীমন্নরদেব অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসানুসারে ১০ম অধ্যায়ে স্বীয় দিব্যবিভূতিসকল বর্ণনা করিয়া, উপসংহারে শ্রীভগবান্ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই অবশেষে এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া গীতার বিচার উপসংহার করা যাইতেছে।

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

৪২ সংখ্যক শ্লোক ১০ম অধ্যায়।

অস্যার্থঃ—অথবা হে অর্জ্জুন! বহু বিস্তৃতরূপে আমার বিভূতিসকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জানিবার তোমার প্রয়োজন কি? এই জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই অনন্তরূপ বিশ্ব আমি একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি। এই সমগ্রবিশ্ব আমার একাংশ মাত্র।

(ঘ) শান্তিপর্ব্ব—ব্রহ্মরুদ্র-সংবাদ।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বোক্ত বসিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক সংবাদ এবং ভীষ্মপর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ যাহা শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা নামে আখ্যাত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দৃক্-দৃশ্যাত্মক পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব-সমন্বিত এই জগৎ পরব্রহ্মের অঙ্গীভূত ও তাঁহাহইতে অভিন্ন, ইহা তাঁহার পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত সগুণাবস্থা; তদতীত ও এতৎ-সমস্তের আশ্রয়রূপে তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ অবস্থায় বর্ত্তমান আছেন। সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়রূপে তাঁহার পূর্ণতা।

শ্রীভগবান্ বেদব্যাস স্বশিষ্য জনমেজয়ের মুখে শান্তিপর্ব্বের শেষভাগে ৩৫০ ও ৩৫১ অধ্যায়ে, নির্ম্মল ভক্তি ও জ্ঞানযোগসহ, নির্গুণ ও সগুণভেদে পরব্রহ্মতত্ত্ব, ব্রহ্ম-রুদ্র-সংবাদ বর্ণনা দ্বারা, অতি বিশদরূপে পুনরায় প্রকাশিত করিয়াছেন; তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

৩৫০ম অধ্যায়

জনমেজয় উবাচ—

বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্নুতাহো এক এব তু।
কোহ্যত্র পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ কা বা যোনিরিহোচ্যতে ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ—জনমেজয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পুরুষ অনেক অথবা একই,

অগ্রতশ্চাভবৎ প্রীতো ববন্দে চাপি পাদয়োঃ।
তং পাদয়োর্নিপতিতং দৃষ্ট্বা সব্যেন পাণিনা ॥ ১৩ ॥
উত্থাপয়ামাস তদা প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ।
উবাচ চৈনং ভগবাংশ্চিরস্যাগতমাত্মজম্ ॥ ১৪ ॥

পিতামহ উবাচ—

স্বাগতং তে মহাবাহো দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মেঽন্তিকম্।
কচ্চিত্তে কুশলং পুত্র স্বাধ্যায়তপসোঃ সদা ॥ ১৫ ॥
নিত্যমুগ্রতপাস্ত্বং হি ততঃ পৃচ্ছামি তে পুনঃ ॥ ১৬ ॥

রুদ্র উবাচ—

ত্বৎপ্রসাদেন ভগবন্ স্বাধ্যায়তপসোর্মম।
কুশলং চাব্যয়ং চৈব সর্ব্বস্য জগতস্তথ ॥ ১৭ ॥
চিরদৃষ্টো হি ভগবান্ বৈরাজসদনে ময়া।
ততোঽহং পর্ব্বতং প্রাপ্তস্ত্বিমং ত্বৎপাদসেবিতম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ—এবং প্রীতমনে চতুরানন ব্রহ্মার অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় বন্দনা করিলেন। তাঁহাকে চরণোপরি পতিত দেখিয়া একাকী অবস্থিত প্রজাপতি বামহস্তদ্বারা তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন, এবং বহুদিনের পর আগত পুত্রকে ভগবান্ বলিলেন। ১৩।১৪ ॥ সর্ব্বলোক পিতামহ বলিলেন, হে মহাবাহো! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? ভাগ্যক্রমে আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম, তোমার বেদাধ্যয়ন ও তপস্যার সতত কুশল ত? ১৫॥ তুমি নিয়ত উগ্র তপস্যা করিয়া থাক, এই নিমিত্ত তোমাকে এই বিষয় বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১৬॥ রুদ্র বলিলেন, হে ভগবন্! অপনার প্রসাদে আমার স্বাধ্যায় ও তপস্যা এবং সমস্ত জগতের মঙ্গল। ১৭॥ ভগবন্! বহুদিন হইল বৈরাজভবনে আপনাকে দর্শন করিয়াছিলাম, তাহার পর এই আপনার পাদসেবিত পর্ব্বতে আসিয়া

কৌতূহলং চাপি হি মে একান্তগমনেন তে।
নৈতৎ কারণমল্পং হি ভবিষ্যতি পিতামহ॥ ১৯॥
কিন্নু তৎ সদনং শ্রেষ্ঠং ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জ্জিতম্।
সুরাসুরৈরধ্যুষিত মৃষিভিশ্চামিতপ্রভৈঃ॥ ২০॥
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ সততং সন্নিষেবিতম্।
উৎসৃজ্যেমং গিরিবরমেকাকী প্রাপ্তবানসি॥ ২১॥

ব্রহ্মোবাচ—

বৈজয়ন্তো গিরিবরঃ সততং সেব্যতে ময়া।
অত্রৈকাগ্রেণ মনসা পুরুষশ্চিন্ত্যতে বিরাট্॥ ২২॥

রুদ্র উবাচ—

বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মংস্ত্বয়া সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।
সৃজ্যন্তে চাপরে ব্রহ্মন্ সচৈকঃ পুরুষো বিরাট্॥ ২৩॥
কোহসৌ চিন্ত্যতে ব্রহ্মংস্ত্বয়ৈকঃ পুরুষোত্তমঃ।
এতন্মে সংশয়ং ব্রূহি মহৎ কৌতূহলং হি মে॥ ২৪॥

আপনাকে পুনরায় দর্শন করিলাম। ১৮॥ পরন্তু আপনার এই একান্ত নির্জ্জন প্রদেশে আগমনের কারণ অবগত হইতে আমার কুতূহল জন্মিয়াছে, হে লোকপিতামহ! সেই কারণ অবশ্য কোন সামান্য কারণ হইবে না, বলিয়া বোধ হইতেছে। ১৯॥ আপনার সেই শ্রেষ্ঠ ক্ষুৎপিপাসা-বিবর্জ্জিত, সুরাসুর, ঋষি গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ-নিষেবিত বৈরাজভবন পরিত্যাগ করিয়া, আপনি একাকী কি নিমিত্ত এই গিরিবরে আগমন করিয়াছেন? ।২০।২১॥ ব্রহ্মা বলিলেন, আমি এই বৈজয়ন্ত গিরিবরে নিত্যই আগমন করিয়া থাকি, এই স্থানে একান্তচিত্তে বিরাট্পুরুষকে চিন্তা করি। ২২॥ রুদ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি স্বয়ম্ভু, বহু পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং অপর আরও সৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু যে এক বিরাট্

ব্রহ্মোবাচ—

বহবঃ পুরুষাঃ পুত্র ত্বয়া যে সমুদাহৃতাঃ।
এবমেতদতিক্রান্তং দ্রষ্টব্যং নৈবমিত্যপি ॥ ২৫ ॥
আধারন্তু প্রবক্ষ্যামি একস্য পুরুষস্য তে।
বহূনাং পুরুষাণাং স যথৈকা যোনিরুচ্যতে ॥ ২৬ ॥
তথা তং পুরুষং বিশ্বং পরমং সুমহত্তমম্।
নির্গুণং নির্গুণী ভূত্বা প্রবিশন্তি সনাতনম্ ॥ ২৭ ॥

৩৫১ তম অধ্যায়।

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু পুত্র যথা হ্যেষ পুরুষঃ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ।
অক্ষয়শ্চাপ্রমেয়শ্চ সর্ব্বগশ্চ নিরুচ্যতে ॥ ১ ॥

পুরুষকে আপনিও চিন্তা করিতেছেন, সেই পুরুষোত্তম কে? এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা জানিতে আমার অত্যন্ত কুতূহল জন্মিয়াছে। ২৩। ২৪ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন, হে পুত্র তুমি যে অনেক পুরুষের কথা কহিলে, তৎসকলকে অতিক্রম করিয়া, এক পুরুষ আছেন, তিনি কাহারও দৃষ্ট হয়েন না। ২৫ ॥ তোমার কথিত বহু পুরুষের উৎপত্তি স্থান যেমন এক পুরুষ, আমার চিন্তিতপুরুষ সেই এক পুরুষেরও উৎপত্তি স্থান। ২৬ ॥ যেমন বহু পুরুষ এক পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ আমার কথিত পুরুষও বিশ্বরূপ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং মহৎ হইতেও মহৎ হয়েন; সেই সনাতন পুরুষ গুণাতীত; অপর সকল পুরুষ নির্গুণত্ব লাভ করিয়া তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

৩৫১ অধ্যায়।—ব্রহ্মা বলিলেন, হে! পুত্রক সেই শাশ্বত (অত্যন্তশূন্য, নিত্য), অব্যয় (অপরিণামী), অক্ষয়, অপ্রমেয় (বাক্য মনের অগোচর),

ন স শক্যস্ত্বয়া দ্রষ্টুং ময়ান্যৈর্ব্বাপি সত্তম।
সগুণৈর্নির্গুণৈর্ব্বিশ্বো জ্ঞানদৃশ্যো হ্যসৌ স্মৃতঃ॥ ২॥
অশরীরঃ শরীরেষু সর্ব্বেষু নিবসত্যসৌ।
বসন্নপি শরীরেষু ন স লিপ্যতি কর্ম্মভিঃ॥ ৩॥
মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষীভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ॥ ৪॥
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ক্ষেত্রেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্॥ ৫॥
ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভম্।
তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে॥ ৬॥
নাগতির্ন গতিস্তস্য জ্ঞেয়া ভূতেষু কেনচিৎ।
সাংখ্যেন বিধিনা চৈব যোগেন চ যথাক্রমম্॥ ৭॥

সর্ব্বগ পুরুষ যদ্রূপ, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। ১। হে সত্তম! তুমি, আমি অথবা পণ্ডিত কিংবা মূর্খ, অপর কোন পুরুষ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বিশ্বরূপ, কেবল নির্ম্মল-জ্ঞান-গম্য বলিয়া তিনি বর্ণিত হয়েন। ২॥ তিনি অশরীরী হইয়াও সর্ব্ববিধ শরীরে অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু শরীরে অবস্থান করিলেও শারীরিক কোন কার্য্যে লিপ্ত হয়েন না। ৩॥ তিনি আমার অন্তরাত্মা, তোমার অন্তরাত্মা, এবং দেহী অপর সকলেরই অন্তরাত্মা; তিনি সকলের সাক্ষী, সকলকেই দর্শন করেন, কিন্তু কেহ কখনও তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ৪॥ তিনি বিশ্বমূর্দ্ধা, বিশ্বভুজ, বিশ্বপাদ, বিশ্বাক্ষি এবং বিশ্বনাসিক; তিনি এক হইয়াও স্বেচ্ছাক্রমে বহুক্ষেত্রে যথাসুখে বিচরণ করেন।৫॥ তিনি শরীররূপক্ষেত্র, ও শুভাশুভ বীজ সকলে যুক্ত হইয়া, তৎসমস্ত অবগত হয়েন; অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ নামে উক্ত হয়েন।৬॥ সাংখ্য অথবা যোগবিধি দ্বারা ভূতগ্রামে তাঁহার এই

চিন্তয়ামি গতিং চাস্য ন গতিং বেদ্মি চোত্তরাম্।
যথাজ্ঞানং তু বক্ষ্যামি পুরুষং তু সনাতনম্॥ ৮॥
তস্যৈকত্বং মহত্ত্বং চ স চৈকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মহাপুরুষশব্দং স বিভর্ত্ত্যেকঃ সনাতনঃ॥ ৯॥
একো হুতাশো বহুধা সমিধ্যতে একঃ সূর্য্যস্তপসো যোনিরেকা।
একো বায়ুর্ব্বহুধা বাতি লোকে মহোদধিশ্চাম্ভসাং যোনিরেকঃ।
পুরুষশ্চৈকো নির্গুণো বিশ্বরূপস্তং নির্গুণং পুরুষং চাবিশন্তি॥ ১০॥
হিত্বা গুণময়ং সর্ব্বং কর্ম্ম হিত্বা শুভাশুভম্।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা এবং ভবতি নির্গুণঃ॥ ১১॥

গতি ও অগতির বিষয় কেহ জানিতে পারে না। ৭॥ ইঁহার গতির বিষয়ই আমি চিন্তা করি; কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠা গতির বিষয় আমিও সম্যক্ জানিতে পারি নাই। যাহা হউক সেই সনাতন পুরুষকে আমি যতদূর জানিয়াছি, তাহা বলিতেছি। ৮॥ সেই পুরুষ এক (অদ্বৈত) ও মহৎ, শ্রুতি স্বয়ং তাঁহাকে অদ্বৈত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তিনিই মহাপুরুষ-শব্দবাচ্য, তিনি সনাতন, এবং তিনি এক হইয়াও বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন। ৯॥ যেমন এক অগ্নি বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন, সূর্য্য এক হইয়াও বহুধা দৃষ্ট হয়েন, তাপ সকলের যোনি নানারূপ দৃষ্ট হইলেও, বাস্তবিক তৎসমস্তই এক, একই বায়ু বহুরূপে প্রবাহিত হয়, এবং সমুদ্রই সমুদয় জলের একমাত্র উৎপত্তি স্থান; তদ্রূপ পুরুষও এক ও নির্গুণ, অথচ চরাচর বিশ্বরূপ; অন্তিমে সেই নির্গুণ পুরুষেই সকল প্রবিষ্ট হয়।১০॥ গুণময় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, শুভাশুভ কর্ম্মসমুদয় পরিহার করিয়া, সত্য ও মিথ্যা পরিক্ষেপানন্তর (অর্থাৎ জগতে সকলই ব্রহ্মময়, এইরূপ ধারণা করিয়া), জীব নির্গুণতা লাভ করে॥১১॥

অচিন্ত্যং চাপি তং জ্ঞাত্বা ভাবসূক্ষ্মং চতুষ্টয়ম্।
বিচরেদ্‌যোঽসমুন্নদ্ধঃ স গচ্ছেৎ পুরুষং শুভম্॥ ১২॥
এবং হি পরমাত্মানং কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ।
একাত্মানং তথাত্মানমপরে জ্ঞানচিন্তকাঃ॥ ১৩॥
তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যং নির্গুণঃ স্মৃতঃ।
স হি নারায়ণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বাত্মা পুরুষো হি সঃ॥১৪॥
ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।
কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে॥১৫॥
স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে চ সঃ।
এবং বহুবিধঃ প্রোক্তঃ পুরুষস্তে যথাক্রমম্॥১৬॥

যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলাস্পদ পুরুষ সেই অচিন্ত্য পুরুষকে এবং তাঁহার চতুর্ব্বিধ (বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, তুরীয়) ভাবকে অবগত হইয়া অবস্থিতি করেন, তিনি সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন।১২।। কোন কোন পণ্ডিত (যাঁহারা ভক্তিমার্গাবলম্বী তাঁহারা) এইরূপ সাধন অর্থাৎ বিশ্বপ্রভৃতি চতুর্ব্বিধরূপে এবং তদতীতরূপে (অর্থাৎ সগুণ এবং নির্গুণ উভয়রূপে ব্রহ্মের ধ্যানসম্পন্ন হইয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন; অপর জ্ঞানযোগিগণ স্বীয় জীবাত্মাই ব্রহ্ম এই অভেদ-ধ্যান দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। ১৩॥ তন্মধ্যে পরমাত্মা নিয়তই নির্গুণ; তাঁহাকেই সর্ব্বাত্মা-পুরুষ ও নারায়ণ বলিয়া জানিবে।১৪।। জল যেমন পদ্মপত্রের সহিত মিলিত হয় না, তদ্রূপ তিনি কর্ম্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না; কিন্তু যিনি জীবরূপী, তিনি কর্ম্মে যুক্ত হন; সুতরাং তাঁহার মোক্ষ এবং বন্ধ ঘটিয়া থাকে।১৫।। এই শেষোক্ত রূপেই তিনি সপ্তদশ রাশির (অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ, যাহা একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কারাত্মক, তাহার) সহিত যুক্ত হন। পুরুষ যেরূপে বহুবিধ হন, তদ্বিষয় যথাক্রমে

যত্তৎ কৃৎস্নং লোকতন্ত্রস্য ধাম বেদ্যং পরং বোধনীয়ঃ স বোদ্ধা।
মন্তা মন্তব্যং প্রাশিতা প্রাশনীয়ং ঘ্রাতা ঘ্রেয়ং স্পর্শিতা স্পর্শনীয়ম্ ।১৭॥
দ্রষ্টা দ্রষ্টব্যং শ্রাবিতা শ্রাবণীয়ং জ্ঞাতা জ্ঞেয়ং সগুণং নির্গুণঞ্চ।
যদ্বৈ প্রোক্তং তাত সম্যক্ প্রধানং নিত্যং চৈতচ্ছাশ্বতং চাব্যয়ঞ্চ ॥১৮॥
যদ্বৈ সূতে ধাতুরাদ্যং বিধানং তদ্বৈ বিপ্রাঃ প্রবদন্তেঽনিরুদ্ধম্।
যদ্বৈ লোকে বৈদিকং কর্ম্ম সাধু আশীর্যুক্তং তদ্ধি তস্যৈব ভাব্যম্ ॥১৯॥
দেবাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ সাধুশান্তাস্তং প্রাগংশে যজ্ঞভাগং ভজন্তে।
অহং ব্রহ্মা আদ্য ঈশঃ প্রজানাং তস্মাজ্জাতস্ত্বঞ্চ মত্তঃ প্রসূতঃ ॥২০॥
মত্তো জগজ্জঙ্গমং স্থাবরং চ সর্ব্বে বেদাঃ সরহস্যা হি পুত্র ॥২১॥

তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।১৬॥ যিনি সমগ্র লোকতন্ত্রের আশ্রয়স্বরূপ, তিনিই পরম বেদ্য, তিনিই বোধনীয়, আবার তিনিই বোদ্ধা ; তিনিই মন্তা, আবার তিনিই মন্তব্য ; তিনিই ভোক্তা, আবার তিনিই ভোগ্য ; তিনিই ঘ্রাতা,আবার তিনিই ঘ্রেয় ; তিনিই স্পর্শকর্ত্তা, আবার তিনিই স্পর্শনীয়।১৭॥ তিনি দ্রষ্টা, আবার তিনিই দ্রষ্টব্য ; তিনিই শ্রবণকর্ত্তা, আবার তিনিই শ্রাবণীয়। তিনি জ্ঞাতা আবার তিনিই জ্ঞেয় ; তিনি সগুণ আবার তিনিই নির্গুণ ; যিনি প্রধান নামে উক্ত হইয়াছেন ও নিত্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি এই শাশ্বত অব্যয় পরমাত্মা হইতে অভিন্ন।১৮॥ যিনি জগৎস্রষ্টা ধাতার আদ্যবিধান হিরণ্যগর্ভ, তিনি এবং অনিরুদ্ধ (বিশ্বমূর্ত্তি) অভিন্ন বলিয়া বিপ্রগণ কীর্ত্তন করেন ; লোকমধ্যে যে সকল মঙ্গলযুক্ত, সাধু, ও বৈদিক, কর্ম্মসকল আচরিত হয়, তাহা তাঁহারই বলিয়া চিন্তা করিবে।১৯॥ সমস্ত দেবগণ, মুনিগণ, সাধুগণ, শান্তগণ, তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞভাগ দিয়া ভজনা করেন, সর্ব্ব প্রজার ঈশ্বর ও আদি আমিও তাহা হইতে জাত হইয়াছি, তুমি রুদ্র আমা হইতে জাত হইয়াছ।২০॥ হে পুত্র! আমা হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ এবং সরহস্য বেদ সকল সৃষ্ট হইয়াছে। ২১॥

চতুর্ব্বিভক্তঃ পুরুষঃ স ক্রীড়তি যথেচ্ছতি।
এবং স ভগবান্ স্বেন জ্ঞানেন প্রতিবোধিতঃ ॥২২॥
এতত্তে কথিতং পুত্র যথাবদনুপৃচ্ছতঃ।
সাংখ্যজ্ঞানে তথা যোগে যথাবদনুবর্ণিতম্ ॥২৩॥

সেই পরম পুরুষ এইরূপ চতুর্দ্ধা * বিভক্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ক্রীড়া করেন। এইরূপ সেই ভগবান্‌কে স্বীয় বলিয়া জ্ঞান করিলে, তিনি প্রতিবোধিত হয়েন।২২॥ হে পুত্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা সাংখ্যজ্ঞান এবং ভক্তিশাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথাযথরূপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।২৩॥

উপসংহার।

এইরূপে ব্রহ্মের নির্গুণতা ও সগুণতা শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রে, কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্ম নির্গুণরূপে পূর্ণাদ্বৈত, চরাচর সমস্ত বিশ্ব তৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত; গুণ অথবা জীব বলিয়া, পৃথক্‌রূপে-প্রকাশমান কোনবস্তুর স্ফুরণ তদবস্থায় নাই, সকলই ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্গত; দৃক্ অথবা দৃশ্যরূপে কোন শক্তির বিকাশ তদবস্থায় নাই; কারণ সমস্ত জগৎকে আত্মস্বরূপে ভুক্ত করিয়া, এক ব্রহ্মই বর্ত্তমান আছেন; কেবা দ্রষ্টা হইবে, কেইবা দৃষ্ট হইবে? পরন্তু এইরূপ হইয়াও ব্রহ্ম পুনরায় আপনাকে অনন্তরূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দর্শন করেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্ব-

---

* বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় (অনুরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব)

শক্তিমত্তা (সগুণাবস্থা) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এই সগুণাবস্থার প্রথম স্তরে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত উন্মুখতাযুক্ত দৃক্-শক্তি প্রকাশিত আছে। এই দৃক্-শক্তি পুরুষ নামে আখ্যাত হয়েন। তাঁহাতে যে অনন্তরূপী হইবার নিমিত্ত উন্মুখতা বর্ত্তমান থাকে, ইহাই প্রকাশিত জগতের বীজ, এবং ইহাকেই প্রকৃতি বলে। যখন এই প্রকৃতিকে (উন্মুখতাকে) প্রধান কল্পনা করিয়া, দৃক্-শক্তিকে তৎসহিত সমন্বিতভাবে-মাত্র দেখা যায়, তখন এই প্রকৃতির নাম "প্রধান" হয়, আর যখন দৃক্-শক্তিকে প্রধানরূপে কল্পনা করিয়া, এই উন্মুখতাকে তাঁহার অঙ্গীভূতরূপে-মাত্র অন্বিত বলিয়া দেখা যায়, তখন তাঁহাকে পুরুষ বলা যায়। এই পুরুষই "সগুণ ব্রহ্ম" ও "তুরীয় ব্রহ্ম" আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। যে অবস্থায় তাঁহার এই উন্মুখতা নাই, সেই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে কেবল "নির্গুণ ব্রহ্ম", "নিত্য-মুক্ত" ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

এই প্রকৃতিযুক্ত পুরুষহইতে গুণাত্মক জগৎ প্রকাশিত হয়; সুতরাং এই জগতের প্রত্যেক অংশেই সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিভাবে দৃক্-শক্তি (পুরুষ) প্রবিষ্ট আছেন। প্রত্যেক অংশে ব্যষ্টিভাবে পুরুষ অনুপ্রবিষ্ট আছেন, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। সর্ব্ববিধ জীব-জন্তুর দেহে দৃক্-শক্তির অনুপ্রবেশ থাকাতে, আমরা প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ জীব বলিয়া দেখিতেছি। কিন্তু সমষ্টিভাবেও যে জগতে জীব-শক্তি অনুপ্রবিষ্ট আছে, তাহা তদ্রূপ সহজে বোধগম্য হয় না। অতএব পুনরুক্তি হইলেও, পূর্ব্বপাদোক্ত একটি দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা পুনরায় স্পষ্টীকৃত হইতেছে—আমি একটি দেহধারী জীব, আমার দেহের সর্ব্বাংশব্যাপিয়া, তাহার বোদ্ধা-স্বরূপে, এবং তাহার সহিত অভিন্নজ্ঞানে, আমি অবস্থান করিতেছি। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব-

সমষ্টির একত্রীভূত দেহদ্বারা আমার এই দেহ সংগঠিত হইয়াছে; প্রত্যেক শুক্রবিন্দু, প্রত্যেক রক্তবিন্দু, প্রত্যেক মাংসকণিকা, অস্থিকণিকা এবং মজ্জাকণিকা অসংখ্য জীবদেহরূপে বর্ত্তমান আছে; ইহা পূর্ব্ব-বর্ত্তী পাদে বর্ণিত হইয়াছে। বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই সকল জীব আমার চেতনাদ্বারা চেতনাপ্রাপ্ত, আমার জীবনের দ্বারা জীবিত, এবং আমার মৃত্যুতে ইহাদের সকলেরই মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। সমষ্টিগতদেহে সমষ্টিভাবে যেমন জীবচৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাহা যেমন একজন আমি-স্বরূপ পুরুষ; আবার এই দেহের প্রত্যেক অংশেও পৃথক্ পৃথক্ রূপে এই জীবচৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট, তন্নিমিত্ত প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশও এক একটি পৃথক্ জীব। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে পুনরায় তদপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর অসংখ্য জীব বর্ত্তমান আছে; অনুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে তাহা আমরা এক্ষণে কতকপরিমাণে পরিজ্ঞাত হইতে পারি। এইরূপ নানাবিধ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি-সমন্বিত পৃথিবীমণ্ডল একটি বৃহৎ জীব। আমার দেহের শোণিত-স্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবসকলের পক্ষে, তাহাদের বিচরণস্থান-আমার দেহই পৃথিবীস্বরূপ জড়বস্তু; এইরূপ পৃথিবীর সহিত তুলনায় আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের ভূপৃষ্ঠই বিচরণ-স্থান; অতএব পৃথিবীকে আমরা জড় বলিয়াই বোধ করি। কিন্তু ইহাতেও দৃক্‌শক্তি নিবিষ্ট থাকাতে, ইহাও একটি বৃহৎ জীব; এইরূপ পৃথিবী আবার গ্রহাদি-সমন্বিত সূর্য্য-মণ্ডলের এক ক্ষুদ্রাংশরূপে অবস্থিত। সমগ্র জ্যোতির্ম্মণ্ডল-সমন্বিত সূর্য্য-মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষকে সাধারণতঃ আমরা বিরাট্ পুরুষ নামে আখ্যাত করিয়া থাকি। এইরূপে এই বিরাটও আবার ধ্রুবসমন্বিত শিশুমার-নামক বৃহৎবিরাটের অংশ। এইরূপ বিচার দ্বারা সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাব বোধগম্য হয়। এক এক স্তরে অবস্থিত ব্যষ্টি-জীবের তুলনায় তৎসমষ্টি-

গতজীব ঈশ্বর বলিয়া পরিকল্পিত হয়েন। উত্তরোত্তর সমস্ত স্তরেই এইরূপ বিচারদ্বারা সাধারণ দৃষ্টিতে জীবও ঈশ্বর নাম হইয়া থাকে।

এইরূপে সগুণ ব্রহ্ম এক হইলেও, গুণসকলের বিভিন্নরূপে-সমষ্টিগত প্রত্যেক অংশে দৃক্-শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে ঈশ্বর ও জীব-ভেদে, জীব অনন্ত। পর ব্রহ্মের সহিত একত্বজ্ঞান হইলেই, জীবের মুক্তি সংসাধিত হয়। পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া জীবের যে জ্ঞান, তাহা অপূর্ণ-জ্ঞান, সুতরাং তাহাকে ভ্রম বলা যায়। অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হইলে, এই ভ্রমজ্ঞানের অবসান হয়; গুণাত্মক সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন হয়। ইহাই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যধৃত অন্ধকারস্থলে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির দৃষ্টান্তের প্রকৃত সার। অন্ধকার স্থলে রজ্জু দেখিয়া সর্প বলিয়া ভ্রম জন্মে; কিন্তু আলোকদ্বারা দৃষ্টবস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হইলে, সর্পভ্রম বিদূরিত হয়, এবং তাহার রজ্জুরূপতার বোধ জন্মে। তদ্রূপ অপূর্ণজ্ঞানান্ধকারে বস্তুসকল পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্বশালী বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানরূপ আলোক প্রকাশিত হইলে, তৎসমস্ত স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়াই—তাঁহা হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশালী নহে বলিয়াই,—প্রতীতি জন্মে। অন্ধকারে দৃষ্টবস্তু একদা মিথ্যা নহে, তাহা সর্প বলিয়া যে বোধ, ইহাই ভ্রম; আলোকদ্বারা তাহার রজ্জুরূপত্ব জ্ঞাত হইলে সেই ভ্রম দূরীভূত হয়। তদ্রূপ দৃষ্টজগৎ মিথ্যা নহে, ব্রহ্মহইতে স্বরূপতঃ পৃথক্‌অস্তিত্বশালী বলিয়া যে ইহার বোধ, তাহাই ভ্রমাত্মক; অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হইলে, সেই অপূর্ণজ্ঞান দূর হইয়া যায়; দৃষ্টজগতের ব্রহ্মস্বরূপত্ব পরিজ্ঞাত হয়। এইরূপে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তও সার্থক হয়। শ্রীভগবান্ কপিলদেবও সাংখ্যসূত্রে এই দৃষ্টান্তদ্বারাই মুক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মায়ার ব্রহ্মরূপত্ব, অথবা ব্রহ্মহইতে ভিন্নরূপত্ব, বুদ্ধিদ্বারা নির্ব্বচনীয় নহে বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার এই মত এবং ব্রহ্মের দ্বিরূপতা, যাহা

এইস্থলে প্রমাণীকৃত হইল, তন্মধ্যে প্রভেদ যে অতি সূক্ষ্ম ও অকিঞ্চিৎকর, ইহা ইতিপূর্ব্বে বিচার করা হইয়াছে; সুতরাং ইহা উপেক্ষা করিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। লৌকিক ব্যবহারে জীবের বহুত্ব এবং সৃষ্টির যথার্থতাবোধ শঙ্করস্বামীও স্বীকার করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মে অভেদ-ভাবনারূপ যে জ্ঞানযোগ, তাহাই তাঁহার শারীরক ভাষ্যোল্লিখিত উপদেশের প্রকৃত বিষয়। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া, আপনাকে তাহাহইতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মস্বরূপে ভাবনা, আর জগৎ মিথ্যা নহে, গুণাত্মকমাত্র, পুরুষ তাহাহইতে ভিন্ন, বিচার দ্বারা এইরূপ স্থির করিয়া, আপনাকে গুণাতীত বিভু আত্মা-স্বরূপ বলিয়া ভাবনা, এই উভয়ের মধ্যে কার্য্যতঃ কোন প্রভেদ নাই। উভয় প্রণালীতেই দ্রষ্টা জীবাংশকে গুণাতীত পরমপুরুষ অথবা পরমাত্মা বলিয়া অভিন্নরূপে ভাবনাই উপদেশের প্রকৃত সার। সাংখ্যযোগকেই জ্ঞান-যোগ বলা যায়, ইহা পরবর্ত্তী পাদে বিবৃত হইবে; সুতরাং শঙ্করস্বামীর প্রকৃত প্রস্তাবে সাংখ্যমার্গাবলম্বী বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত। মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত বেদান্তসূত্র প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তিমার্গাবলম্বী যোগিগণের অভীষ্টদায়ক, তাহা পরে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে। কিন্তু জ্ঞান-মার্গ ও ভক্তি-মার্গ উভয়ই মোক্ষপ্রদ; সুতরাং শেষফলে ইহাদের কোন তারতম্য নাই। কেবল সাধন-অবস্থায় প্রণালীর তারতম্য আছে। এই নিমিত্ত শ্রীভগবান্ গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"সাংখ্য-যোগৌ * পৃথগ্-বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়ো-র্বিন্দতে ফলম্" ॥ ৪ ॥

---

* এইস্থলে যোগ শব্দে ভক্তিযোগান্তর্গত ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণরূপ নির্ম্মল কর্ম্মযোগ বুঝিতে হইবে। "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ইত্যাদিরূপ ভক্তিযোগ ঐ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকোক্ত যোগের ব্যাখ্যা স্থলে বিবৃত হইয়াছে।

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার প্রমাণ-নামক চতুর্থপাদ সমাপ্ত।

ইতি বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যা-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ওঁ তৎসৎ

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ হরিঃ।

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ।

দর্শনাধিকার নির্ণয়।

শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত ব্রহ্মবিদ্যা সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইল। দর্শনশাস্ত্রে প্রমাণবিচারদ্বারা এই ব্রহ্মবিদ্যাই উপদিষ্ট হইয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শিষ্যদিগের অধিকার ও জিজ্ঞাসার ভেদানুসারে আচার্য্য ঋষিগণ তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশের বিভিন্নতা করিয়াছেন। অল্পবয়স্ক বালকগণ উপনীত হইয়া বিদ্যালাভের নিমিত্ত আচার্য্যসমীপে বাস করিতে আরম্ভ করিলে, প্রথমতঃ আচার্য্যগণ তাঁহাদিগকে বেদ পাঠ ও গান করিতে অভ্যাস করাইতেন; বেদ অধীত হইলে, তাহার অর্থ উপদেশ করিতেন; এবং যাহাতে তাঁহারা বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি বৈধক্রিয়া সম্পাদন করিতে উত্তমরূপে দক্ষতালাভ করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত অবশেষে বিদ্যার্থিগণকে পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শনোক্ত বিচারপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইত। পরন্তু ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি চিরকালের নিমিত্ত নিষ্ঠা উৎপাদন করা বেদের চরম অভিপ্রায় নহে; মনুষ্যকে মুমুক্ষু করাই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব আচার্য্য-ঋষিগণ বিদ্যার্থিগণকে মুমুক্ষু করিবার নিমিত্ত, বেদপাঠশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাঁহাদিগের অন্তরে জীবতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব বিষয়ে চিন্তার উদয় হয়, তদ্বিষয়েও, অধিকার অনুসারে, উপদেশ প্রদান করিতে ত্রুটি করিতেন না।

প্রবর্ত্তাবস্থাপন্ন বুদ্ধিমান্ বালকদিগের পক্ষে বৈশেষিকদর্শনই প্রথম অধ্যয়নোপযোগী। যাহাতে বালকদিগের মনে জাগতিক জ্ঞাতব্য বিষয়-সকলের ধারণা উপজাত হয়, তদ্রূপে তাহা অতি সরলভাবে বৈশেষিক দর্শনে উপদিষ্ট হইয়াছে। জগতের পদার্থসকল অসংখ্য ; ইহাদিগকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, সামান্য, বিশেষ, ও সমবেত-রূপে ইহাদের সম্বন্ধে এই দর্শনে উপদেশ করা হইয়াছে। অনন্ত জগতের অনন্ত পদার্থকে এইরূপে একত্র ধারণা করিতে শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধি প্রশস্ত হয়। বুদ্ধি প্রশস্ত হইলে, ক্রমশঃ এই সকল পদার্থের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত উৎসাহ জন্মে।

অতঃপর বুদ্ধির ধারণাশক্তি কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলে, তর্কবিদ্যা সম্যক্ অবগত হইবার নিমিত্ত মহর্ষি গৌতমপ্রণীত ন্যায়দর্শন পঠিতব্য। ইহা দ্বারা বুদ্ধি এইরূপ পরিমার্জ্জিত হয় যে, অতিসূক্ষ্ম বিষয়ও ধারণা করিবার জন্য তখন সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। প্রমাণের স্বরূপ এবং তাহার নানা প্রকার প্রভেদ উপদেশ করাই গৌতমসূত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরন্তু যাহাতে কুতর্ক-দ্বারা বুদ্ধি ভ্রষ্ট না হয়, তন্নিমিত্ত মহর্ষি গোতম কুতর্কেরও সর্ব্ববিধ স্বরূপ উপদেশ করিয়া, তাহা পরিহারের প্রণালীসকলও ন্যায়দর্শনে বিশেষরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অধিকন্তু বেদের প্রামাণিকতা স্থাপন ও মুক্তির উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিয়া, পরম কারুণিক মহর্ষি, যাহাতে শিষ্যের মতি অকল্যাণকর নাস্তিকতার দিকে ধাবিত না হয় এবং মোক্ষলাভের নিমিত্ত বৈরাগ্যযুক্ত হয়, তদ্বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে বিস্মৃত হন নাই। বর্ত্তমান-কালে গৌতমসূত্রের অধ্যয়ন অনেকস্থলেই প্রচলিত নাই। প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত বৈশেষিকদর্শনে যে দ্রব্য গুণ প্রভৃতি ষট্ পদার্থের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদবলম্বনে গৌতমসূত্রোক্ত প্রমাণবিষয়ক উপদেশের সাহায্যে বঙ্গদেশে পরমাণু-কারণত্বস্থাপক "নবন্যায়" প্রবর্ত্তিত

হইয়াছে। ইহাই বৈশেষিক জগৎকারণবাদ বলিয়া এক্ষণে পরিচিত। এক্ষণে বঙ্গদেশে এই নব্যন্যায়েরই আলোচনা অধিক প্রচলিত। প্রাচীনকাল হইতেই এক শ্রেণীর পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাই বেদান্তদর্শনে ও সাংখ্যদর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ঋষিদিগের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ থাকা প্রমাণিত হয় না।

অতঃপর বিচারপ্রণালী উত্তমরূপে অবগত হইলে, পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন পঠনীয়। এই দর্শন পাঠ করিলে বেদোক্ত সম্যক্ কর্ম্মকাণ্ডে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা জন্মে। প্রাচীনকালে এই মীমাংসাদর্শনপাঠান্তেই অধিকাংশ বিদ্যার্থী, গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া, পাণিগ্রহণপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতেন।

বৈশেষিকদর্শন ও ন্যায়দর্শনের উপদেশেব সহিত পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের কোন কোন উপদেশের বিভিন্নতা আছে, সন্দেহ নাই; যেমন "শব্দকে" বৈশেষিকদর্শনে অনিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; পরন্তু পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনে ইহাকে নিত্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যে প্রকৃতপক্ষে কোন মতবিরোধ নাই, তাহা উক্ত দর্শনসকল ব্যাখ্যাকালে প্রমাণিত করা হইবে। এক্ষণে এইমাত্র স্মরণ রাখা উচিত যে, বিদ্যার্থী বালকের বুদ্ধিবৃত্তির মার্জ্জনাসহকারে তাহার অধিকারের পরিবর্ত্তন অবশ্য-ম্ভাবী। বালকদিগকে দিবারাত্র-প্রভৃতি ব্যাপার বুঝাইতে, সূর্য্যাদি গগনস্থ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থসকল পৃথিবীকে অহরহঃ প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া প্রথমে উপদেশ করা হয়; পরন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইলে, সেই উপদেশ ভ্রান্ত এবং পৃথিবীই সূর্য্যকে অহরহঃ পরিক্রমণ করিতেছেন বলিয়া শিক্ষা দিতে হয়। ইহাতে উপদেষ্টৃগণের মধ্যে মতবিরোধ কল্পনা করা যেমন অসঙ্গত, দার্শনিকদিগের মধ্যে মতবিরোধ কল্পনাও তদ্রূপ অসঙ্গত। এই সকল দর্শন সবিস্তার পৃথক্‌রূপে পরে

ব্যাখ্যা করা হইবে; সুতরাং এই স্থলে তদ্বিষয়ের আর বিশেষ সমালোচনা করা হইল না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মীমাংসাদর্শনপাঠান্তে অধিকাংশ বিদ্যার্থিগণ গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিতেন। পরন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের তদপেক্ষা উচ্চ উপদেশ লাভের নিমিত্তও অধিকার জন্মিত; ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন এবং বেদ ও পূর্ব্বোক্ত দর্শনাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নদ্বারা, কাহার কাহার বুদ্ধি এইরূপ মার্জ্জিত হইত যে, কেহবা সংসারের প্রতি অতিশয় বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সাংখ্যদর্শন অধ্যয়নে ও সাংখ্যজ্ঞান সাধনে অধিকার লাভ করিতেন; কেহবা বেদান্তদর্শন অধ্যয়নে ও বেদান্তোপদিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যালাভে অধিকারী হইয়া, তাহাই সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এই উভয় শ্রেণীর বিদ্যার্থীই মুমুক্ষু বলিয়া গণ্য। ইহাদের মানসিক প্রকৃতি অনুসারে ব্রহ্মবাদী আচার্য্যগণ ইঁহাদিগকে সাংখ্যজ্ঞান অথবা বেদান্তজ্ঞান উপদেশ করিতেন। এই দুই দর্শনের উপদেশপ্রণালী অতিশয় বিভিন্ন প্রকারের, অতএব দার্শনিক বিরোধ বলিতে, সচরাচর বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের বিরোধই, বোধগম্য হয়। অতএব এই দুই দর্শনের অধিকারভেদ ও উপদেশপ্রণালী এই পাদের অবশিষ্টাংশে বিশেষরূপে বিবৃত হইতেছে।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে অধিকারবিচারে, যে সকল পুরুষকে মুমুক্ষু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহারাই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রকৃত অধিকারী। ইঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, জ্ঞানমার্গী ও ভক্তিমার্গী। জ্ঞানমার্গীদিগের জ্ঞানযোগে অধিকার, ভক্তিমার্গীদিগের ভক্তি-যোগে অধিকার। যাঁহারা সংসারকে দুঃখাত্মক দেখিয়া তৎপ্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা ব্যতিরেকে-বুদ্ধিবিশিষ্ট, অতি সূক্ষ্মদর্শী, এবং আত্মানাত্ম-বিচারক্ষম, তাঁহাদিগেরই জ্ঞানযোগে অধিকার। যাঁহাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম অথচ সমন্বয়ী; সুতরাং যাঁহারা পার্থক্যের মধ্যে একত্ব

দর্শন করিতেই স্বভাবতঃ উন্মুখ, এবং যাঁহারা ভগবদ্-গুণগ্রাম শ্রবণে তৎপ্রতি অনুরাগবিশিষ্ট, তাঁহারাই ভক্তিযোগের অধিকারী। সাংখ্য-দর্শনে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানযোগাধিকারী শিষ্যের অধিকার। ভগবান্ কপিলদেব মহর্ষি আসুরিকে প্রথম এই সাংখ্যজ্ঞান উপদেশ করেন; মহর্ষি আসুরি স্বশিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্যকে, তাহা উপদেশ করেন। শিষ্য-পরম্পরাক্রমে কপিলোপদিষ্ট সাংখ্যসূত্রসকল পরিবর্দ্ধিত হইয়া, তাহা সাংখ্যপ্রবচনসূত্র নামে আখ্যাত হয়। পরে ঈশ্বরকৃষ্ণ এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, সাংখ্যপ্রবচন সূত্রের আখ্যায়িকা ও পরবাদবিচারাংশ-ব্যতীত, অবশিষ্ট মূল সূত্রসকল কারিকাকারে সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিয়া, সাংখ্যকারিকা নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তদবধি সাংখ্যকারিকাই অধিকপরিমাণে প্রচলিত হইয়া মূল সূত্র বিরল হইয়া পড়ে। অনিরুদ্ধভট্ট আধুনিক কালে ঐ সূত্রসকল স্বরচিত টীকাসহকারে প্রথম প্রকাশ করেন। পরে পণ্ডিতবর বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত ভাষ্যে তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পণ্ডিতসমাজে প্রকাশিত করেন। তদ্ব্যতীত তত্ত্বসমাস-নামে অতি সংক্ষিপ্ত দ্বাবিংশতিসূত্রে সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাও সাংখ্যমার্গের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রের প্রথম ছয়টি সূত্রে শ্রীভগবান্ কপিলদেব প্রথমতঃ তৎপ্রদত্ত উপদেশের বিষয় ও অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন; নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

১। অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।

এইস্থলে অথ শব্দ অধিকারার্থক। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-রূপ মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। ইহাই এই সাংখ্যপ্রবচন নামক গ্রন্থের বিষয়।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াসকলদ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং তদ্দ্বারা পরমপুরুষার্থ মোক্ষও সাধিত হয় না। তাহা এক্ষণে সাধিত হইতেছে:—

২। ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তি-দর্শনাৎ।

দৃষ্ট (বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞাত) উপায় সকল দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না ; কারণ ঐ সকল উপায়দ্বারা (উপস্থিত) দুঃখনিবৃত্তি হইলেও ঐরূপ দুঃখের পুনরাবৃত্তি হইতে দেখা যায়।

৩। প্রাত্যহিক-ক্ষুৎ প্রতিকারবৎ তৎপ্রতিকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বম্।

এই সকল দৃষ্ট বেদবিহিত উপায়ের দ্বারা দুঃখপ্রতিকারের চেষ্টা হইতেও পুরুষার্থ সাধিত হয় সত্য ; কিন্তু তাহা প্রত্যহ ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা হইতে সমুৎপন্ন পুরুষার্থের ন্যায় (ক্ষণস্থায়ী)।

কিন্তু পক্ষান্তরে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, বৈদিক কর্ম্মের ফল প্রাত্যহিক ক্ষুধানিবৃত্তির সহিত সমান হইতে পারে না ; কারণ বৈদিক যাগযজ্ঞাদি-কার্য্যদ্বারা স্বর্গাদি-ফলেরও সিদ্ধি উক্ত আছে। সুতরাং প্রাত্যহিক ক্ষুৎপ্রতিকার-চেষ্টার সহিত বেদোক্ত কর্ম্মের কথনও তুলনা হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন ঃ—

৪। সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপ্যত্যন্তাসম্ভবাৎ হেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ।

(বৈদিক কর্ম্মের ফল এইরূপই সত্য ; পরন্তু তদ্দ্বারা, সকল প্রকার দুঃখের নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই ; এবং (ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তিদ্বারা) তাহার সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই (কারণ সেইসকল লোকহইতেও পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনরাবৃত্তি শাস্ত্রে উক্ত আছে, এবং সংসারে পুনরাবৃত্তি হইলেই পুনরায় দুঃখ উপস্থিত হয় ; সুতরাং ঐ সকল লোকপ্রাপ্তি-হেতু দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, এইরূপ প্রমাণ হয় না)। অতএব প্রমাণজ্ঞ ব্যক্তিসকল লৌকিক ও বৈদিককর্ম্মসকলকে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির হেতু বলিয়া স্বীকার করেন না, (এবং তাহা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন)। বিশেষতঃ—

৫। উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ।

(যে শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ করিয়াছেন সেই) শ্রুতিতেই মুক্তির সর্ব্বোৎকর্ষ (অর্থাৎ বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত সর্ব্বপ্রকার ফলহইতে মুক্তির উৎকর্ষ) প্রতিপাদিত আছে; সুতরাং (এই সকল কর্ম্মফল হইতে) মুক্তির উৎকর্ষ হেতু (তাহার উপায় অবশ্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য)।

৬। অবিশেষশ্চোভয়োঃ।

অতএব দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি-বিষয়ে বৈদিক কর্ম্ম এবং প্রাত্যহিক ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা প্রভৃতি লৌকিক ব্যবহার এই উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই।

ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য এই ছয়টি সূত্র একত্র করিয়া ইহাদের মর্ম্মার্থ স্বপ্রণীত সাংখ্যকারিকার প্রথম কারিকায় নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থাচেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ॥ ১॥

ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাত দ্বারা সকল জীবই জর্জ্জরিত; অতএব তাহার নিবৃত্তির উপায় বিষয়ে জিজ্ঞাসা। পরন্তু (বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদি ও ঔষধাদি) উপায় সকল অবধারিত ও পরিজ্ঞাত থাকায় (পুনরায় দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়) জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন ; এই আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ এই সকল দৃষ্ট উপায়দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না।

এই সকল সূত্রার্থ আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, গ্রন্থারম্ভে ভগবান্ কপিলদেব বলিলেন দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় তিনি এই গ্রন্থে প্রকাশ করিবেন ; আর ইহাও বলিলেন যে, যেসকল কর্ম্ম বেদের কর্ম্মকাণ্ডে অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না। এই সকল উক্তিদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, তিনি যে শিষ্যকে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি সংসারকে দুঃখময় জানিয়া এবং বৈদিক কর্ম্মসকলের দুঃখ-নিবারণ-বিষয়ে

উপযোগিতার বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির সমীচীন উপায় কি, তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভ করিবার জন্য ভগবান্ কপিলদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এই শিষ্যই মহর্ষি আসুরি। অতএব যিনি সেই মহর্ষি আসুরির ন্যায় বিরক্ত সন্ন্যাসী, তিনি সাংখ্যবিদ্যালাভের যথার্থ অধিকারী।

শ্রীমদ্ভাগবত-সংহিতার একাদশ স্কন্ধে বিংশতিতম অধ্যায়ে, শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন ঃ—

"নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু"।

যাঁহারা সংসারের প্রতি অতিশয় বিরাগযুক্ত, সুতরাং তৎপ্রাপক কর্ম্মেও আসক্তিশূন্য, তাঁহাদিগেরই জ্ঞানযোগে অধিকার।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ঃ—

"জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং"—সাংখ্যদিগের জ্ঞান যোগে অধিকার।

সুতরাং জ্ঞানমার্গাবলম্বীদিগেরই সাংখ্যবিদ্যায় অধিকার। এই জ্ঞানযোগের স্বরূপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে উদ্ধৃত শান্তিপর্ব্বের ৩৫১ অধ্যায়ে ব্রহ্মরুদ্রসংবাদে, এইরূপে উক্ত হইয়াছে যথা—

এবং হি পরমাত্মানং কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ।
একাত্মানং তথাত্মানমপরে জ্ঞানচিন্তকাঃ॥ ১৩॥ (৩৫১ অধ্যায়)

এক শ্রেণীর (ভক্তিমার্গাবলম্বী) পণ্ডিতগণ এইরূপ সাধন-পরায়ণ হইয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। অপরজ্ঞানচিন্তক যোগিগণ (সাংখ্যমার্গাবলম্বিগণ) আপনাকে নিরন্তর পরব্রহ্ম রূপে চিন্তা করিয়া, অথবা কেবল নির্ম্মল আত্মস্বরূপকে ধ্যান করিয়া, তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন। এই সাংখ্যজ্ঞান পূর্ব্বপাদে উদ্ধৃত বসিষ্ঠ-করাল-জনক-সংবাদ এবং যাজ্ঞবল্ক্য-জনক সংবাদে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিরুক্তি পরিহারার্থ এস্থলে তাহা পুনরায় উক্ত হইল না। পরন্তু এই জ্ঞানযোগের সার এই যে, সাধক আপনাকে অবিনাশী, নিত্য, মুক্ত, গুণাতীত, আত্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা

করিবেন। দৃশ্য জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্, তিনি দ্রষ্টা, সাক্ষিমাত্র; তিনি যে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করেন, ইহা তাঁহার ভ্রম; তিনি তৎসমস্তের অতীত, নির্গুণ। এইরূপে একদিকে দেহাদি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত বৈরাগ্য, এবং অপরদিকে নিয়ত দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মস্বরূপ-চিন্তনের অভ্যাসদ্বারা, তিনি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন; সুতরাং দেহাদি-সংযোগ নিবন্ধন যে ক্লেশ, তাহাহইতে সর্ব্বতোভাবে বিমুক্তিলাভ করেন। কিন্তু দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ ভ্রম জীবের স্বভাবতঃ আছে; এই ভ্রম দূর করিবার নিমিত্ত স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দৃশ্যজগৎ যাদৃশ, তাহা বিচার করা প্রয়োজন। এই বিচারদ্বারা দৃশ্যবর্গের স্থূল, সূক্ষ্ম নানাবিধ অবস্থা অবগত হইলে, তাহাহইতে সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে বিভিন্ন করিতে পারা যায়; কারণ দৃশ্যবর্গের স্বরূপ না জানিলে, ইহার কোন সূক্ষ্ম অবয়বে আত্মবুদ্ধি নিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে; সুতরাং সাধক তাহাতেই আবদ্ধ হইতে পারেন। অতএব দৃশ্য বর্গের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অবস্থাসকল পরিজ্ঞাত হইয়া, সাধক ব্যক্তি আপনাকে তৎসমস্ত হইতে স্বতন্ত্ররূপে—তৎসমস্তের দ্রষ্টামাত্ররূপে—চিন্তা করিবেন। এই নিমিত্ত সাংখ্যশাস্ত্রে দৃশ্যবর্গের স্বরূপ তন্ন তন্নরূপে বিচারদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং জীবকে স্বরূপতঃ তৎসমস্ত হইতে ভিন্ন ও মুক্তস্বভাব বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। সাংখ্যমার্গীয় জ্ঞানযোগ উপদেশ করিতে গিয়া, সাংখ্যদর্শনকার দৃশ্যজগতের চতুর্ব্বিংশতি বর্গ থাকা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পুরুষকে তাহাহইতে পৃথক্ বলিয়া উপদেশ করিতে গিয়া, বলিয়াছেন—

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্॥ প্রথম অধ্যায় ১৩৯ সূত্র।

পুরুষ (আত্মা) শরীরাদি প্রকৃতিবর্গ হইতে ব্যতিরিক্ত (পৃথক্)।

যে মুক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলিয়া গ্রন্থারম্ভে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কিরূপে লাভ করা যায়, তাহা উপদেশ করিতে গিয়া, সাংখ্যকার বলিয়াছেন—

জ্ঞানান্মুক্তিঃ।

বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ (তৃতীয় অধ্যায় ২৩ ও ২৪ সূত্র)

প্রকৃতিবর্গ হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থিত স্বীয় স্বরূপের জ্ঞান হইতেই পুরুষের মুক্তি হয়; এবং তদ্বিপর্য্যয় হইতে অর্থাৎ দেহাদি প্রকৃতিবর্গের সহিত একাত্মতা বোধ হইতেই পুরুষের বন্ধ কল্পিত হয়।

কিরূপে এই বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে সাংখ্যকার বলিতেছেন—

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ (তৃতীয় অধ্যায় ৭৫ সূত্র)।

পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ত্ব চিন্তা এবং আমি দেহ নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি ইত্যাদি ক্রমে প্রকৃতিবর্গের সহিত সঙ্গত্যাগ-রূপ ধ্যান হইতে বিবেক-জ্ঞান সিদ্ধ হয়।

অতএব বিষয়বৈরাগ্য ও আত্মতত্ত্ববিবেকই জ্ঞানযোগ, এবং ইহাই সাংখ্যদর্শনে নানাপ্রকার বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মহামুনি বেদব্যাসও এইরূপেই জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা—

কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামের প্রারম্ভে শ্রীমন্নরদেব অর্জ্জুনের অতিশয় বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায়, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে প্রথমে এই সাংখ্যযোগই উপদেশ করিয়াছিলেন। আত্মানাত্মবিবেক, যাহা সাংখ্যযোগের সার, তাহাই অর্জ্জুনের অন্তরে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন;—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যং শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫॥

* * * *

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে * * * ॥৩৯॥

২য় অধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

এই উপদেশের সার এই যে, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন! জীব দেহাদি হইতে পৃথক্; জন্ম ও মরণধর্ম্ম দেহাদিরই বর্ত্তমান আছে; জীবের স্বরূপে এইসকল ধর্ম্ম নাই; অজ্ঞানহেতুই জীব আপনাকে এইসকল ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বোধ করেন। হে পার্থ! তুমি, ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতি সকলেই স্বরূপতঃ নিত্য ও অবিনাশী; সুতরাং তোমাদের বিনাশের সম্ভাবনা নাই। দেহাদিত বিনশ্বর বস্তুই, ইহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং তাহা বিনাশ করিতে তুমি কেন ক্ষুব্ধ হইতেছ? ইহাদের বিনাশে জীবের বিনাশ হয় না। * * * সাংখ্যজ্ঞানবিচার দ্বারা তোমাকে এই উপদেশ দেওয়া হইল।"

সাংখ্যশাস্ত্রে দৃশ্যবর্গের সর্ব্ববিধ স্বরূপ এবং তাহাহইতে পৃথক্ করিয়া

আত্মাকে দর্শনকরা-রূপ জ্ঞানযোগমাত্রই বর্ণিত হইয়াছে। দৃশ্যমান জগৎ হইতে আপনাকে অতীত ও বিভিন্নরূপে দর্শন করাই যখন সাংখ্যযোগের সার; তখন একদিকে গুণাত্মক দৃশ্যবর্গের সহিত ভেদবুদ্ধি-সাধন ও অপরদিকে আপনাকে নিত্যমুক্তস্বভাব আত্মস্বরূপ চিন্তাই এই জ্ঞানযোগের প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাপক। প্রত্যেক পুরুষই বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত বৈরাগ্যযুক্ত হইলে, এই আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন। অতএব পুরুষবহুত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকার্য্য। বদ্ধজীব বাস্তবিকই বহু, এবং মুক্ত পুরুষও বহু, এবং ঈশ্বরও নিত্যমুক্ত এবং সর্ব্বজ্ঞ-স্বভাব দ্বারা সকলহইতে দৃষ্টতঃ পৃথক্, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে বিশেষরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। এই দৃষ্টতঃ পুরুষবহুত্বই ভগবান্ কপিলদেব স্বপ্রণীত সাংখ্যসূত্রে পুরুষবহুত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু জীবসকলকে প্রকৃতিতে পতিত পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র বলিয়া বর্ণনা করিতেও তিনি ক্রটি করেন নাই। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ও মহর্ষি কপিলোক্ত বহুপুরুষত্ব-বিষয়ক উপদেশের এই তাৎপর্য্য থাকা পূর্ব্বপাদে উদ্ধৃত শান্তিপর্ব্বের ৩৫০ ও ৩৫১ অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই জ্ঞান-সাধন-দ্বারা সাংখ্যযোগী আপনাকে দৃশ্য প্রকৃতিবর্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ বলিয়া অবগত হইতে পারিলে, সর্ব্বাশ্রয়রূপী ব্রহ্ম তাঁহার নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হয়েন, এবং তিনি মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। তখন জগত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সমস্তই তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়; সুতরাং জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে না।

ভক্তিমার্গাবলম্বী সাধকদিগের সাধন-প্রণালী ইহাহইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহাদের বুদ্ধি স্বভাবতঃ অন্বয়ী; জাগতিক বিভিন্নতার মধ্যে তাঁহারা একত্বদর্শন করিতে সমর্থ। আমি কে, জগৎ কি, আমার সহিত জগতের সম্বন্ধ কি, কোথা হইতে এই চরাচর জগৎ আসিল, কাহাতে জগৎ

প্রতিষ্ঠিত, কাহাতেই বা লয় প্রাপ্ত হয়, এই বিচার তাঁহাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়; সাংসারিক সুখ এবং দুঃখ এই উভয়ের প্রতি তাঁহারা বিদ্বেষবুদ্ধি-বিরহিত। সাংসারিক দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, জ্ঞান-যোগিগণ যেমন তাহাহইতে উদ্ধারের চিন্তা করেন, ইঁহারা তদ্রূপ করেন না। সাংসারিক সুখ দুঃখ যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহাই তাঁহারা অক্ষুব্ধ-চিত্তে গ্রহণ করেন, ইহা তাঁহাদিগের বিশেষ চিন্তার বিষয় নহে। বহুবিধ জীব-সমন্বিত, বহুবিধ ভোগরঞ্জিত, এই চরাচর জগৎ কোথা হইতে আসিল, কিরূপে অবস্থিত আছে, এবং ইহার চরম গতিই বা কি, এবং ইহার সহিত তাঁহারা কিরূপে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইলেন, ইহাই তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসা। এই বিপুল ধারণাশক্তিযুক্ত মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শ্রুতিসকলের সম্যক্ মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত করিয়া, শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র-নামক বেদান্ত দর্শন উপদেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বপাদে উদ্ধৃত শান্তিপর্ব্বের ৩৫০ ও ৩৫১ অধ্যায়ে ইহা স্পষ্টরূপে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়-দ্বয়োক্ত ব্রহ্ম-রুদ্র-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে যে, দৃশ্যমান জগতে যে বহুবিধ পুরুষ বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্ত একই পুরুষের বিভূতি ও অংশমাত্র, একই পুরুষ হইতে সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে, সেই পুরুষ নির্গুণ হইয়াও সগুণ; তিনি বিশ্বমূর্দ্ধা, বিশ্বভুজ, বিশ্বপাদ, বিশ্বাক্ষি, এবং বিশ্বনাসিক; তিনি এক হইয়াও স্বেচ্ছাক্রমে বহু ক্ষেত্রে যথাসুখে বিচরণ করেন, তিনি ক্ষেত্র, শরীর ও শুভাশুভ বীজসকলে সংযুক্ত হইয়া, তৎসমস্ত অবগত হয়েন। একত্ব ও মহত্ত্বযুক্ত সেই পুরুষ একই বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন; তিনিই মহাপুরুষ-শব্দবাচ্য; তিনি সনাতন, এবং তিনিই বিশ্বকে ধারণ করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্য পুরুষ, এবং বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, ও তুরীয়রূপ তাঁহার জগদাত্মক ও জগতের মূলীভূত ভাবকে অবগত হইয়া, যে সাধক প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করেন, তিনি সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন।

ভক্তিমার্গাবলম্বী বিচক্ষণ মনুষ্যগণ এই অদ্বৈতব্রহ্মকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন ; সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ, যন্নিমিত্ত জ্ঞানযোগিগণ সাংখ্যমার্গ অবলম্বন করেন, তাহা ভক্তিযোগিগণের আপনাহইতে সংসাধিত হয়। এই ভক্তগণই সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী। তাঁহারা নানাবিধ জীবসমন্বিত জগৎকে ব্রহ্মহইতে অভিন্ন জানিয়া, কাহাকেও দ্বেষ করেন না, কাহাকেও হিংসা করেন না, কাহারও প্রতি অত্যন্ত আসক্তও হয়েন না, এবং সংসারের প্রতি অত্যন্ত বিরক্তও হয়েন না ; ইঁহারা সুহৃদ্, মিত্র, শত্রু, উদাসীন মধ্যস্থ ও দ্বেষ্য, এবং সাধু, পাপী, বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, কুকুর, সকলের প্রতিই সমবুদ্ধিযুক্ত ; কারণ তাঁহাদিগের বিচারে সকলই ব্রহ্মস্বরূপ। এইরূপ সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত ভক্ত স্বতঃই ঘৃণা, লজ্জা, ভয় কাম, ক্রোধ প্রভৃতি হইতে বিবর্জ্জিত হয়েন। কাহার প্রতি ঘৃণা করিবেন ? যাহাকে ঘৃণা করিবেন তিনিই যে ব্রহ্ম ; কাহাকে দেখিয়া লজ্জা করিবেন ? যাহাকে দেখিয়া লজ্জা করিবেন তিনিই যে ব্রহ্ম, সকলই জানেন, তাঁহা হইতে কি কেহ কিছু লুক্কায়িত করিতে পারে ? এই যে, রূপযৌবনসম্পন্না রমণী, ইনি যে ব্রহ্মেরই বিভূতি, কিরূপে আর তাঁহার প্রতি তিনি কামভাবাপন্ন হইতে পারেন ? এই যে ভীষণ সর্প, ইনিও যে ব্রহ্মেরই বিভূতি, এই ব্রহ্ম যদি কোন্ দেহকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কে সেই দেহ রক্ষা করিবে ? বিনাশকার্য্যেও তিনি জগতের মঙ্গলই বিধান করেন ; সুতরাং ভয়ের সার্থকতা কি ? যিনি আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত, তিনিও যে ব্রহ্ম ; সুতরাং কাহার প্রতি ক্রোধ করিব ? এইরূপে অদ্বৈতব্রহ্মের চিন্তনদ্বারা ভক্ত আপনাহইতে কামক্রোধাদি-বিবর্জ্জিত হয়েন, এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্ব্বাবস্থায়ই পরম শান্তি-সাগরে ভাসিতে থাকেন। তিনি সর্ব্বজীবে

দয়াবান্, সর্ব্বজীবের আশ্বাসদাতা, সর্ব্বজীবে প্রেমপূর্ণ; কামক্রোধাদি জয় করিবার জন্য তাঁহার পৃথক্ সাধন অবলম্বন করিতে হয় না। এক অদ্বৈতব্রহ্মের ভজনে, তাঁহার সমস্ত আভ্যন্তরিক রিপুর দমন হইয়া যায়। শম,দম, তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি জ্ঞানমার্গের সাধন তাঁহার আপনাহইতে সাধিত হয়। তিনি এইরূপ শান্ত-অবস্থা লাভ করিতে থাকিলে সুর, অসুর, যক্ষ, রক্ষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলই তাঁহার প্রতি ক্রমশঃ সদয় ও প্রেম-ভাবাপন্ন হয়; তিনি সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া নমস্কার করেন ও প্রীতি করেন। সুতরাং কেহই তাঁহার প্রতি বৈরাচরণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন না। এইরূপে ভক্ত প্রশান্তচিত্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলে, জগদাধার ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার অন্তরে এক প্রগাঢ় তৃষ্ণার আবির্ভাব হয়। ইহারই নাম পরাভক্তি, অথবা প্রেম। এই প্রেম সমগ্র গুণময় বিশ্বকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না; সুতরাং তাহা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাশ্রয়রূপী ব্রহ্মের দর্শন-লালসায়, তৎপ্রতি মহাবেগ-সহকারে ধাবিত হয়; তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ অচিরেই তাঁহার নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশিত করেন। "নুণের পুতুল" সমুদ্র লাভ করিয়া যেমন তৎস্বরূপ হইয়া যায়, প্রেমিক ভক্তও তদ্রূপ প্রিয়তম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া যান। অতিযত্নে ও কষ্টে জ্ঞানযোগিগণ যে সমাধি যোগ * ও আত্মানাত্ম-বিবেক অবলম্বন করিয়া, সিদ্ধমনোরথ হয়েন, ঐকান্তিক ভক্তগণের তাহা অনায়াসে স্বতঃই উদয় হয়। যোগসূত্রের সমাধিপাদে ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" (আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতি, "প্রণিধানাৎ" ভক্তিবিশেষাৎ ইতি ভাষ্যকারঃ)। এই নিমিত্তই শ্রীভগবান্ ভগবদ্গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে বলিয়াছেন ঃ—

* শম, দমাদি এবং সমাধিযোগ পরে পাতঞ্জলদর্শন ব্যাখ্যানে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে।

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥" *

জ্ঞানযোগে বিঘ্নও অনেক. কারণ দেবাসুর, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য প্রভৃতি সকলকেই অনাত্ম ও পৃথক্ বুদ্ধিতে দর্শন করা হেতু, তাঁহারা জ্ঞানযোগীর তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে—

"ব্রহ্ম তং পরাদাদ্, যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ; ক্ষত্রং তং পরাদাদ্. যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ; লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ; দেবাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ; ভূতানি তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ; সর্ব্বং তং পরাদাদ্, যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদেদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা ॥"

অস্যার্থঃ—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মাহইতে পৃথক্ বলিয়া জানে, ব্রাহ্মণজাতি তাঁহাকে পরাস্ত করেন। এইরূপ যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মাহইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ক্ষত্রিয়জাতি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে আত্মাহইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, দেবতাগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভূতসকলকে আত্মাহইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ভূতগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া থাকে। অধিক কি, যিনি সকলকেই আত্মাহইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, সকলেই তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া থাকে। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই ভূরাদি লোকসকল, এই দেবতাসকল, এই ভূতসকল, এক কথায়, উক্ত ও অনুক্ত সমস্তই আত্মময়। (আত্মা-ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। এই জগৎ

---

* এই স্থলে কর্ম্মযোগ শব্দে নিষ্কাম ভক্তিযোগ বুঝিতে হইবে; তাহা ঐ অধ্যায়ের ১০ম ১১শ ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, এবং জ্ঞানযোগিগণ সর্ব্ববিধ বৈধকর্ম্মকে প্রকৃতির অঙ্গীভূত বলিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জ্ঞানাশ্রয় করেন, এই নিমিত্ত জ্ঞানযোগকেই সংন্যাস শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে।

আত্মাহইতে সমুদ্ভূত; আত্মাতে অবস্থিত এবং অন্তে আত্মাতেই বিলীন হইয়া থাকে। জগৎ আত্মারই শক্তি বা বিভূতি)।

যাহা হউক যেটিই কঠিন বা যেটিই সহজ হউক, যাঁহার প্রকৃতি যেরূপ তাঁহার পক্ষে যেটি অনুকূল সেইটিই শ্রেষ্ঠ। এবং উভয়মার্গেরই যখন শেষ ফল এক, তখন জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, অথবা ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ, ইহার বিচার সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক বিবাদমাত্র। ভক্তিমার্গের অধিকারীর পক্ষে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান-মার্গের অধিকারীর পক্ষে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। অধিকারের ব্যতিক্রম করিয়া সাধন অবলম্বন করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না।

স্বভাবতঃ যাঁহারা দেহাদি পদার্থকে এবং সাধারণতঃ জগৎকে দুঃখাত্মক বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত আত্মানাত্ম-বিচাররূপ জ্ঞানযোগই সবিশেষ উপযোগী। জগৎকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ভাবনা করিবার বিষয় সর্ব্বজ্ঞ গুরু তাঁহাদিগকে কখনই উপদেশ করেন না; কারণ এইরূপ ভাবনা তাঁহাদের স্বভাবতঃ প্রকৃতির প্রতিকূল হওয়ায়, তাঁহাদের পক্ষে তাহা তদ্রূপ আদরণীয় হয় না। জগৎ আত্মা হইতে পৃথক্ এবং আত্মা ব্রহ্মরূপী, এইরূপ ধ্যান (যাহাকে জ্ঞানযোগ বলে, তাহাই) উক্তপ্রকৃতিযুক্ত সাধকের আদরণীয় হয়; এবং এই প্রকার সাধন দ্বারাও যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন শিষ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী গুরু স্বয়ং তদপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব অবগত হইলেও, শিষ্যকে তাহার প্রকৃতির উপযোগী উক্ত প্রকার জ্ঞানযোগই উপদেশ করিয়া থাকেন এবং তাহাই করা সঙ্গত। সাংখ্যদর্শনেও এবম্প্রকার শিষ্যকে মহর্ষিকপিল উক্ত-প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। আর স্বভাবতঃ যাঁহাদের প্রকৃতি প্রেমিক, সংসারের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি-শূন্য এবং সাংসারিক সুখদুঃখের প্রতি যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উদাসীন, এবং যাঁহাদিগের বুদ্ধি স্বভাবতঃ অন্বয়ী, তাঁহারা ভক্তিযোগের অধিকারী। তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ গুরু সম্যক্ ব্রহ্মতত্ত্বই উপদেশ করিয়া

থাকেন। জগৎ যে ব্রহ্মময়, এবং জীবও যে ব্রহ্মহইতে অভিন্ন, এই উভয়-বিধ উপদেশই ধারণা করিতে ইঁহারা সমর্থ। বেদান্তদর্শনে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব বেদান্তদর্শন ভক্তি-মার্গের সাধকের পক্ষে আদরণীয়; এবং তাঁহাদেরই নিমিত্ত ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে মহর্ষি বেদব্যাস বৃহদারণ্যক শ্রুতির পূর্ব্বোদ্ধৃত "সর্ব্বং বেদেদং ব্রহ্ম" এই অদ্বৈত মীমাংসাই বিশেষরূপে শ্রুতিবিচার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বরূপী, অথচ অরূপী সর্ব্বাতীত, এবংবিধ ব্রহ্মই যে বেদান্তদর্শনের বক্তব্য বিষয়, তাহা বেদব্যাস গ্রন্থারম্ভেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র—

১। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"।

বেদসকল অধ্যয়নানন্তর তদুক্ত মন্ত্র, দেবতা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সকল অবগত হইলে, এবং বিচার দ্বারা তৎসমস্তের তত্ত্বসকল পরিজ্ঞাত হইলে, শ্রুত্যুক্ত সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ফলদাতা, সর্ব্ব যজ্ঞাধিষ্ঠাতা, সর্ব্বদেবের নিয়ন্তা, যে পরব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়; অতএব জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি, তিনি কীদৃশ, এবং কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই অনুগত শিষ্য আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাহাতে আচার্য্য প্রথমেই উত্তর করিলেন :—

২। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"

নানাবিধ প্রাণিসমন্বিত চরাচর এই জগৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, যাহাতে পুনরায় লয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম। (অর্থাৎ জগতের অন্য উপাদান নাই, ব্রহ্মই ইহার একমাত্র উপাদান এবং তিনিই ইহার একমাত্র নিমিত্ত কারণও বটেন; অথচ ব্রহ্ম ইহাহইতে অতীতও আছেন; কারণ তিনি ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন ও ধারণ করিতেছেন, এবং অন্তে ইহাকে লয়ও করেন)।

সুতরাং সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা যে এই গ্রন্থের বিষয়, তাহা গ্রন্থের প্রারম্ভেই মহর্ষি বেদব্যাস স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনাতে ভক্তগণেরই অধিকার; জ্ঞানযোগিগণের কেবল আত্মানাত্ম-বিচারেই অধিকার; ব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট কেবল নির্গুণ অকর্ত্তা-রূপে উপদিষ্ট হয়েন, তিনি জগৎকর্ত্তারূপে জ্ঞানমার্গীর নিকট জ্ঞাতব্য নহেন। জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করা তাঁহাদের সাধনের বিষয় নহে; সুতরাং এই ব্রহ্মসূত্র ভক্তিমার্গাবলম্বি-পুরুষেরই আশ্রয়ণীয় গ্রন্থ। বেদান্তদর্শনের উপদিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা যে কেবল জ্ঞানমার্গীর আত্মানাত্মবিবেক নহে, তাহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বাত্রিংশৎ সূত্রে এবং অপরাপর স্থলে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। উক্ত দ্বাত্রিংশৎ সূত্রে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব উক্ত হইয়াছে; এই সূত্রে যে "উপাসনা-ত্রৈবিধ্যাৎ" পদ আছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, "ত্রিবিধমিহ ব্রহ্মণঃ উপাসনং বিবক্ষিতং—প্রাণধর্ম্মেণ প্রজ্ঞাধর্ম্মেণ স্বধর্ম্মেণ চ।.. অন্যত্রাপি উপাধিধর্ম্মেণ ব্রহ্মণঃ উপাসনমাশ্রিতম্" ইত্যাদি। জীবধর্ম্ম, প্রাণাদি উপাধি ধর্ম্ম এবং উভয়াতীত স্বীয় (স্বরূপ) ধর্ম্মের চিন্তন, এই ত্রিবিধরূপে ব্রহ্মোপাসনা এই স্থলে উক্ত হইয়াছে; অন্যত্রও এইরূপ।" অতএব জীব, জড়জগৎ, ও উভয়াতীতরূপে ব্রহ্মচিন্তন, যাহা ভক্তিযোগ বলিয়া আখ্যাত, তাহা বেদান্তদর্শনের উপদেশের বিষয় হওয়ায়, বেদান্তদর্শন জ্ঞানমার্গীর উপযোগী নহে। বেদান্তদর্শনের উপদেশের বিষয় পূর্ণব্রহ্ম হওয়াতে, পুরুষের একত্ব এবং বহুত্ব উভয়ই ইহাতে উক্ত হইয়াছে এবং সাংখ্যোক্ত বহুপুরুষ এক পুরুষেরই অঙ্গীভূত বলিয়া এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বস্তুতঃ যে এই উভয় দর্শনের উপদেশের মধ্যে বিরোধ নাই, এবং কেবল শিষ্যের অধিকার

ও জিজ্ঞাসার প্রভেদে যে উভয় দর্শনের উপদেশের প্রভেদ হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মরুদ্র-সংবাদে, শান্তিপর্ব্বে, শ্রীভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ংই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহা এই উভয় দর্শনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাও সমালোচনা দ্বারা, পরে পৃথক্‌রূপে প্রদর্শিত হইবে। পাতঞ্জলদর্শন সাংখ্যদর্শনেরই অনুগামী, এবং ইহা সাংখ্যপরিশিষ্ট নামেই আখ্যাত। পরন্তু এই দর্শনখানি এত উপাদেয় যে, স্বয়ং বেদব্যাস ইহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অতএব ভাষ্যের সহিত সম্পূর্ণ পাতঞ্জলদর্শনও পৃথক্‌রূপে বিবৃত হইবে। পরন্তু দার্শনিক বিচারপ্রণালী কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারের। অতএব "দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা" এই পৃথক্ নাম দিয়া তিন খণ্ডে ষড়্দর্শনের ব্যাখ্যা করা হইবে। প্রথম খণ্ডে বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব্বমীমাংসা সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, সাংখ্যকারিকা, তত্ত্বসমাস ও দ্বিতীয় খণ্ডে পাতঞ্জলদর্শন, এবং তৃতীয় খণ্ডে দুই ভাগে ভাষ্য সহিত বেদান্তদর্শন সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হইবে। কিন্তু উক্ত তিন খণ্ডই এই মূল গ্রন্থের অঙ্গীভূত ও সহচর। এই মূলগ্রন্থ পাঠান্তে তাহা পাঠ করিলে তদুক্ত বিচার বোধগম্য হইবার পক্ষে সুবিধা হইবে।*

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে দর্শনাধিকার নিরূপণনামক প্রথম পাদ।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

---

* বস্তুতঃ তৃতীয় অধ্যায়ের এই প্রথম পাদ লিপিবদ্ধ হইবার পর, বৈশেষিক দর্শনকে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ, ন্যায়দর্শনকে তৃতীয় পাদ, এবং পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনকে চতুর্থ পাদস্বরূপ কল্পনায়, এবং অতঃপর সাংখ্যদর্শনকে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদ, পাতঞ্জলদর্শনকে দ্বিতীয় পাদ এবং বেদান্ত দর্শনকে তৃতীয় পাদ কল্পনায়, প্রথমে এই গ্রন্থ লিখা হইয়াছিল, এবং সর্ব্বশেষ চতুর্থ পাদে "উপসংহার" নামক পরবর্ত্তী পাদ সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। কিন্তু পাঠকদিগের সুবিধার নিমিত্ত দর্শনশাস্ত্র স্বতন্ত্ররূপে মুদ্রাঙ্কিত করা বিষয়ে কোন বন্ধুর প্রস্তাব সঙ্গত বোধ হওয়াতে "উপসংহার" নামক প্রকরণ এই খণ্ডের সহিতই সংযোজিত করিয়া দর্শনশাস্ত্র পৃথক্ নামে পৃথক্ তিন খণ্ডে প্রকাশিত করা হইল।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ।

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা।

উপসংহার।

১। দর্শন সমন্বয়।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশপ্রণালী সংক্ষেপতঃ প্রদর্শিত হইল। ইহার সার মীমাংসা এই যে, পরব্রহ্ম জগদতীত; কিন্তু জীব ও জগৎ উভয়ই তাঁহার অংশ মাত্র—তাঁহার শক্তিবিশেষ। জীব ও জগতের ব্রহ্মাত্মকতা-বিষয়ক বুদ্ধির অভাব এবং দেহেতে আত্মবুদ্ধিই, সংসার-দুঃখের মূল। দেহাতীত অবিনাশী অনাদি অনন্ত ব্রহ্মহইতে জীব অভিন্ন। জড়জগৎও ব্রহ্মাত্মক। কিন্তু জড়শক্তি হইতে জীবশক্তি পৃথক্। সাংখ্যকার জীবশক্তি ও জড়শক্তির পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া, উপদেশ করিয়াছেন যে, সাধক আপনাকে সর্ব্ববিধ-দেহাতীত এবং চিদাত্মক জানিয়া, আপনার চিদাত্মক স্বরূপকে অহর্নিশ ধ্যান করিয়া, তৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, সংসারবন্ধ হইতে বিমুক্ত হয়েন। প্রত্যেক দেহনিষ্ঠ জীবই চিৎস্বরূপ; সুতরাং জীব অনন্ত। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস শ্রুতিসকলের সারমর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিয়া, স্বরচিত বেদান্তদর্শনে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জীব অনাদি চিৎস্বরূপ; ইহা সত্য, এবং দেহাদি জড়বর্গ যে জীবহইতে পৃথক্, তাহাও সম্পূর্ণ সত্য; পরন্তু এই অনন্ত জীব এক ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূত, তাঁহার নিত্য অংশস্বরূপ; সুতরাং জীব স্বভাবতঃ পরব্রহ্মের নিয়তির অধীন, তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই; মুক্তাবস্থায় তদীয় ব্রহ্মরূপতার সম্পূর্ণরূপে স্ফুরণ হয়; সুতরাং তিনি

জাগতিক ব্যাপারে "স্বরাট্" হয়েন। পরন্তু তদবস্থায়ও স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্ট্যাদি-বিষয়ে সামর্থ্যাভাবদ্বারা তৎকালেও তাঁহার পরব্রহ্মাধীনতা প্রমাণিত হয়। এই পরব্রহ্মই জীবের গম্য। সুতরাং সাংখ্যোক্ত বহুপুরুষবাদ বৈদান্তিক একব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত। ইহাই ব্রহ্ম-রুদ্রসংবাদে শান্তিপর্ব্বে উপদিষ্ট হইয়াছে; তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণরূপ জড়জগৎ অনাত্ম (জীবাত্মা হইতে ভিন্ন) বলিয়া যে সাংখ্যকার উপদেশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের কোন উপদেশ-বিরোধ নাই। পরন্তু তিনি সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিসকল পর পর স্মরণ করাইয়া, প্রমাণিত করিয়াছেন যে, এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ, দৃক্শক্তি (জীব)-হইতে পৃথক্ হইলেও, ইহা ব্রহ্মেরই (বহিরঙ্গা) শক্তি (অথবা গুণ)-বিশেষ; ইহা স্বতন্ত্ররূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ নহে। এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা ও লয়কর্ত্তা এক ব্রহ্ম; তিনিই ইহার অনাদি অচ্যুত আশ্রয় ও অবলম্বন; তিনিই ইহার "নিমিত্ত" এবং "উপাদান" এই উভয়বিধ কারণ। কিন্তু তাঁহার স্বরূপের এই এক বিচিত্রতা আছে যে, তিনি জাগতিক সমুদয় ব্যাপারের বিধাতা হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয়েন না; কারণ তিনি গুণরূপ জগতের আশ্রয়মাত্র; তিনি গুণী; সুতরাং তিনি স্বরূপতঃ জগদতীত। বেদান্তদর্শন-ব্যাখ্যানে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে বিচার করা হইয়াছে; সুতরাং এইস্থলে তাহার পুনরুক্তি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সাংখ্যকার জগৎকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন এবং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে নিয়ত প্রভু-ভৃত্যভাব থাকা প্রমাণিত করিয়াছেন। পরন্তু ব্রহ্মের নিত্য নির্লিপ্তত্ব, যাহা বেদান্তেরও সম্পূর্ণ সম্মত, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া, তিনি ব্রহ্মকে নিত্য অকর্ত্তা ও গুণসঙ্গবর্জ্জিত, এবং প্রকৃতিকে গুণাত্মিকা ও ব্রহ্মহইতে পৃথক্ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ব্রহ্মহইতে ভেদযুক্ত; অথচ স্বভাবতঃ "গর্ব্বদাসবৎ"

ব্রহ্মের অধীন ও নিয়ত সেবাকার্য্যে রত। ব্রহ্মের সহিত জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধ শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বেদান্তদর্শনব্যাখ্যানে পরে প্রদর্শিত হইবে; তাঁহার সিদ্ধান্তের সহিত এই সাংখ্য মতের ফলতঃ বিশেষ কিছু অনৈক্য নাই। জগতের গুণাত্মকতা ও জড়ত্ব উভয়ের স্বীকার্য্য, এবং জগৎ যে ব্রহ্মেরই অর্থসাধক ও অধীন, তাহাও উভয়ের স্বীকৃত; পরন্তু সাংখ্যকার ব্রহ্মের নিত্য গুণাতীতত্বের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়াছেন যে, অধীনত্ব ও পুরুষপ্রয়োজন-সাধকত্ব-ধর্ম্ম স্বভাবতঃ অনাদিকালহইতে প্রকৃতিরই স্বরূপগত; প্রকৃতির কর্ম্মে ব্রহ্মের প্রেরণা বা কর্ত্তৃত্ব নাই; নিজ স্বভাবের দ্বারাই চালিত হইয়া, অনাদিকাল হইতে প্রকৃতি ব্রহ্মের প্রয়োজন সাধন করিতেছেন। পরন্তু নানাবিধ কৌশল অবলম্বনে অপরের প্রয়োজন সাধন করা, সচেতন জীবের পক্ষেই সম্ভব; প্রকৃতির অচেতনত্ব স্বীকৃত হওয়াতে, প্রকৃতির পক্ষে কৌশলপূর্ব্বক পুরুষার্থ সাধন করা, সম্ভবপর নহে; এই অনুমানবিরোধের সমাধান করিবার নিমিত্ত সাংখ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি স্বভাবতঃ অচেতন হইলেও চেতন ব্রহ্মের সহিত তাঁহার নিত্যসান্নিধ্যহেতু, ব্রহ্মের চৈতন্য ধর্ম্ম তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। লৌহ যেমন চুম্বক-সন্নিধানে থাকিয়া চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, পরন্তু চুম্বক পূর্ব্বে যেমন লৌহ হইতে পৃথক্ ছিল, পরেও তদ্রূপ পৃথক্ই থাকে, প্রকৃতিও তদ্রূপ চেতন ব্রহ্মসন্নিধানে তদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া, চেতনবৎ হইয়া, পুরুষার্থ সাধন করেন। প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট চেতন-ধর্ম্মই প্রকৃতির জগদ্রচনা-বিষয়ে পরিচালক। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে যে চিতিশক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রাকৃতিক গুণসকলকে চালিত করে; তাহা সাংখ্যকারের সম্যক্ অসম্মত নহে। পরন্তু ব্রহ্মের স্বরূপগত নির্লিপ্ততার প্রতি সাংখ্যকার বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, প্রকৃতিতে চেতনশক্তির

অনুপ্রবেশ ব্রহ্মের কর্তৃত্ববিনা আপনাহইতেই হয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদান্তকার ভক্তিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রুতিপ্রণোদিত জগত্তত্ব বিচারক্রমে প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে, প্রকৃতির পুরুষার্থ-সাধকতা ব্রহ্মেরই প্রেরণা-মূলক। প্রকৃতিতে যে চেতনাধিগম, তাহা ব্রহ্মেরই প্রেরণা, ইহা আপনা-হইতে হয় না। সুতরাং ব্রহ্মই জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর; গুণাত্মিকা প্রকৃতি ব্রহ্মেরই বহিরঙ্গা শক্তিবিশেষ। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও, ব্রহ্ম কিরূপে নিত্য, গুণাতীত, স্বচ্ছ, চিৎস্বরূপে বিরাজিত থাকেন, তাহা বেদান্তদর্শন-ব্যাখ্যানে বিশদরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এই স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, স্থিরচিত্তে উভয়বিধ উপদেশের পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে যে, মূলতঃ ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; যাহা উভয়মতেই স্বীকৃত, তাহা স্বীয় স্বীয় উপদিষ্ট সাধন-প্রণালীর অনুরোধে বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে মাত্র। তবে বেদান্তদর্শনের উপদিষ্ট সাধনাধিকার অতিশয় ব্যাপক; সুতরাং বেদান্ত-দর্শনে শ্রুত্যুক্ত তত্ত্বসকল সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ইহাতে সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ সন্নিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু সাংখ্য-দর্শনের উপদিষ্ট সাধনাধিকার একদেশাবলম্বী; সুতরাং তদনুরোধে তদুক্ত উপদেশসকলও কিঞ্চিৎ একদেশদর্শী। পরন্তু উভয়বিধ সাধনেরই ফল যে মোক্ষ, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নাই; তাহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

২। অবতারতত্ত্ব ও সাকার উপাসনা।

পরন্তু ভক্তিমার্গের অতি উচ্চ অধিকারী যে সাধক, বেদান্তদর্শনোপদিষ্ট সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণের যোগ্যতা, তাঁহার পক্ষেই আছে; সর্ব্বত্র পার্থক্যবিশিষ্ট জগতে একত্ব দর্শন করা,—শত্রু মিত্র, পণ্ডিত, মূর্খ, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি সর্ব্ববস্তুতে সমদর্শী হওয়া যে সম্ভব, ইহাই অধিকাংশ লোকের

বুদ্ধির গম্য হয় না ; অতএব জগৎপাতা ভগবান্ ঈশ্বর সর্ব্বসাধারণ জীবের কল্যাণের নিমিত্ত, সময়ে সময়ে নির্ব্বিকার মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু অথবা মহেশ্বরাংশে জীবজগতে আবির্ভূত ও প্রকাশিত হইয়াছেন ; এইরূপ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, জীবোপযোগী কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া, জীবদিগকে স্বীয় সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, এবং তাহাদিগের কষ্টের উপশম করিয়াছেন। সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রই এই বিষয়ে ন্যূনাধিক-পরিমাণে সাক্ষ্য প্রদান করে। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিমত্তা, যাহা বেদান্তে বিবৃত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। একদিকে কোন বিশেষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের বিশেষ বিশেষ লোককে শিক্ষা দেওয়া ও তাহাদের আর্ত্তি হরণ করা, এবং অপরদিকে অমূর্ত্ত থাকিয়া সমুদায় বিশ্ব ধারণ, প্রকাশন ও সংহরণ করা, এতং সমস্তই অচিন্ত্যশক্তি সেই পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভব। শ্রীভগবানের অবতার-গ্রহণের তত্ত্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥"
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" ॥

অস্যার্থঃ—হে ভারত ! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় উপস্থিত হয়, তখন আমি জীবরূপে আপনাকে সৃষ্টি করিয়া প্রকাশিত হই। আমি যুগে যুগে সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত পাপাত্মাদিগের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনোদ্দেশে অবতার গ্রহণ করিয়া থাকি।

জগতে যখন কোন বিষয়ের অতিশয় অভাব উপস্থিত হয়, তখন সাধারণতঃ তাহার পূরণ হইয়া থাকে, ইহাই জগতের নিয়ম। গ্রীষ্ম-কালে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে পৃথিবীতে যখন জলের অভাব অতিশয়

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখনই বর্ষাকাল সমাগত হয়, এবং বারিধারাতে পৃথিবীতল অভিষিক্ত হইতে থাকে। আবার বর্ষার অতিশয় জলপ্লাবনে যখন পৃথিবীপৃষ্ঠ ভাসিতে থাকে, তখনই শরৎকাল সমাগত হয়, এবং সূর্য্যের শোষক কিরণে সমুদ্রবৎ জলরাশি দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া যায়। প্রাকৃতিক বাহ্য জগতের ন্যায় জীবজগতেও, যখন অধর্ম্মের বৃদ্ধি ও জনসমাজের অতিশয় হীনদশাপ্রাপ্তি হয়, যখন অত্যাচারহেতু নর-নারীর কষ্টসূচক হাহাকার ধ্বনি গগনমণ্ডলকে পরিপ্লুত করিয়া, উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের দুঃখভার অপসারণ করিবার নিমিত্ত, এবং বিনষ্ট ধর্ম্ম সাধন পুনরায় সংস্থাপনের নিমিত্ত, জগন্নিয়ন্তা ভগবানের বিভূতিসকল উদ্বুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ উচ্চলোকবাসী জীবগণের হৃদয় প্রাণিবর্গের কষ্টদর্শনে দ্রবীভূত হয়; তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া, সেই কষ্ট দূর করিতে প্রযত্ন করিতে থাকেন। যখন তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা অশুভরাশি বিদূরিত না হয়, তখন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষরূপে শ্রীভগবান্, ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের অংশে, আপনাকে প্রকটিত করেন।* আমাদের পুরাণাদিতে উল্লিখিত আছে যে, কখন কখন অসুরগণ তপঃপ্রভাবে দেবতাদিগের অবধ্যতা-বর প্রাপ্ত হইয়া, সংসারে নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত করিয়াছিলেন; তত্তৎকালেও ভগবান্ স্বয়ং দেহধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া, তাহাদের বিনাশসাধন ও জনসমাজের সন্তাপহরণ করিয়া পুনরায় তিরোহিত হইয়াছিলেন। এবঞ্চ যখন আসুরিক বল সাধুপুরুষদিগকে উদ্বেজিত করিতে থাকে, তখন ভগবৎ-প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী; কারণ সাধুভক্তগণের কষ্ট ভগবান্ কখনই সহ্য করেন না বলিয়া, শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকন্তু ভগবান্

---

* পরন্তু বিষ্ণুই জগতের মঙ্গলবিধায়িনী পালনীশক্তির মূর্ত্তি; সুতরাং অধিকাংশ স্থলে বিষ্ণুর অংশেই শ্রীভগবানের অবতার-পরিগ্রহ হয়।

স্বয়ংই মোক্ষধর্ম্মের উপদেষ্টা হইয়া থাকেন; কারণ তাঁহার তত্ত্ব অজ্ঞজীবের পক্ষে উপদেশ করা কঠিন। অতএব যখন জীবের মোক্ষপিপাসা বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহার যথার্থ মার্গ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তও শ্রীভগবানের অবতার-পরিগ্রহ হইয়া থাকে। এইরূপে যখন যখন ভগবদবতার জীব-মণ্ডলে আবির্ভূত হয়েন, তখন যেরূপ শক্তি প্রকট করিবার জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েন, সেইরূপ শক্তির অনুগামী তাঁহার দেহাবয়ব গঠিত হইয়া থাকে। অতএব তাঁহার কখন স্ত্রীবিগ্রহ, কখন পুংবিগ্রহ হয়; কখন বা দেবলোকে দেবতনু ধারণ করিয়া, তিনি জন্ম গ্রহণ করেন; কখন মনুষ্য-লোকে মনুষ্যতনু ধারণ করিয়া, আপনাকে প্রকটিত করেন; কখন বা তির্য্যগাদি দেহধারণ করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না; এবং কখনও তিনি অপূর্ব্ব মিশ্রিত (যেমন নরসিংহ) তনুও প্রয়োজনানুরোধে ধারণ করিয়া থাকেন।

ভগবদবতারের মূর্ত্তিসকল অপর সাধারণ জনগণের উপাস্য হইয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত বেদান্তমার্গ সম্যক্ অবলম্বন করিতে অসমর্থ, সমগ্র বিশ্বব্যাপী ও তদতীত ব্রহ্মধ্যান যাঁহাদের বুদ্ধিতে ধারণা হয় না, যাঁহারা ভেদবুদ্ধিবশতঃ সর্ব্বত্র সমদর্শন স্থাপন করিতে অসমর্থ (সংসারের অধিকাংশ মনুষ্যই এইরূপ অবস্থাপন্ন), তাঁহাদের পক্ষে ভগবন্মূর্ত্তির পূজনই উৎকৃষ্ট ভক্তিমার্গের সাধন। পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন ব্যাখ্যানের উপসংহারে শব্দ (মন্ত্র), রূপ ও মানসিক শক্তির মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।* তাহা পাঠ

* পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত এই স্থানে উক্ত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা হইল—"মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসা এই যে, সংস্কৃত শব্দ এবং তাহাদিগের অর্থ, এই উভয়ের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ স্থাপিত আছে; মন্ত্রসকল উপযুক্তরূপে উচ্চারিত হইলে, তাহারা নিশ্চিতরূপে তদর্থভূত ফলসকল উৎপাদন করিতে সমর্থ। বৈদিক শব্দসকল অর্থবোধের নিমিত্ত সঙ্কেতস্বরূপ সত্য; কিন্তু সেই সঙ্কেত অনাদি কালহইতে প্রচলিত

করিলে, ইহা বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে যে, শ্রীভগবান্ যখন অবতার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রকটিত হয়, সেই মূর্ত্তি তাঁহার তত্তদ্দেহে প্রকাশিত সম্যক্ শক্তির অভিব্যঞ্জক হয়; তিনি যে প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া, যেরূপ শক্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন, তদনুরূপ দেহ ও মূর্ত্তি যে তিনি গ্রহণ করেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। সুতরাং

এবং স্বাভাবিক, তাহা কাল্পনিক নহে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টির মর্ম্ম আরও কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করা যাইতেছে:—কোন কোন মূর্ত্তি এমন ভীষণ ও বিকট যে, তাহা দর্শন করিবামাত্র সকল প্রাণীর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। যাহারা মূক, কথা কহিতে পারে না, এবং বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন অথবা অঙ্গভঙ্গিদ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশ করে, তাহারা যদি "ভীষণ" ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, একটি ভীষণ মূর্ত্তি অপর কাহাকেও প্রদর্শন করে, তবে ইহা সঙ্কেত ব্যবহার করা হইল বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেই সঙ্কেতটি স্বয়ংও নিজশক্তিপ্রভাবে দ্রষ্টার মনে ভয় উদ্রেক করিতে সমর্থ; অতএব সঙ্কেত হইলেও, ইহা স্বাভাবিক সঙ্কেত বলিয়া গণ্য হয়। সংস্কৃত শব্দসকলও এইরূপ; ইহারা যে অর্থপ্রকাশের নিমিত্ত সঙ্কেত; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহারা পূর্ব্বোক্তরূপ স্বাভাবিক সঙ্কেত, ইহাদের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক সম্বন্ধ, কাল্পনিক সম্বন্ধ নহে। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও যোগসূত্রের সমাধিপাদের ২৭সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে ইহাই অবধারণ করিয়াছেন। যোগসূত্রে বর্ণনায় পরে তাহা ব্যাখ্যাত হইবে।

পরন্তু সকলপ্রকার শব্দের সহিত অর্থের এইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই; কেবল কাল্পনিক শব্দও অবশ্য আছে, এবং পৃথিবীমণ্ডলে বর্ত্তমানকালে প্রচলিত অধিকাংশ ভাষাতেই এইরূপ কেবল কাল্পনিক সাঙ্কেতিক শব্দের সংখ্যাই অধিক; কিন্তু সকল ভাষাতেই কতকগুলি স্বাভাবিক সঙ্কেতও মিশ্রিত আছে। পরন্তু উচ্চারণের দোষে তাহাও বিকৃত অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দেবভাষা সংস্কৃত এইরূপ নহে, ইহা সিদ্ধ ভাষা; ইহাতে শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য; ইহাকে যে এতদ্দেশে দেবভাষা বলে, তাহারও ইহাই কারণ। কিন্তু এই বিষয় সম্যক্ বোধগম্য করা অতিশয় কঠিন। অতএব ইহা নিম্নে আরও কিছু পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

বিশেষ বিশেষ শব্দের সহিত বিশেষ বিশেষ রূপের (মূর্ত্তির) যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা এক্ষণকার বিজ্ঞানবলেও প্রমাণিত হইতেছে। বস্তুতঃ প্রত্যেক শব্দেরই স্বীয় অনুরূপ মূর্ত্তি আছে। যাঁহারা আধুনিক শব্দবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, শব্দ বায়ুকে তরঙ্গায়িত করিয়া, কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়; সেই

প্রীতি-পূর্ব্বক সেই সকল মূর্ত্তির ধ্যান, এবং সেই মূর্ত্তির অনুগামী শব্দ, যাহাকে মন্ত্র বলিয়া পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার কীর্ত্তন, রটন ও স্মরণের দ্বারা যে, জীব তাঁহার সারূপ্য লাভ করিতে পারে বলিয়া, শাস্ত্রকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই সঙ্গত, তাহা কুসংস্কার নহে। একান্তচিত্তে অবতাররূপী ভগবানের নাম স্মরণ, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার গুণ

সকল তরঙ্গের রূপ, শব্দের পরিবর্ত্তন অনুসারে, পরিবর্ত্তিত হয়, এই সকল রূপকে অবলম্বন করিয়া, পুনরায় তদনুরূপ শব্দ উৎপাদন করা যায়। রূপ ও শব্দের সম্বন্ধজ্ঞান হইতেই আধুনিক ফনোগ্রাফ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। শব্দবিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা পাশ্চাত্য প্রদেশেও সম্প্রতি ইহা প্রকাশিত হইয়াছে যে, সঙ্গীত সকলের নানাবিধ মূর্ত্তিভেদ আছে; ইডোফোন নামক যন্ত্রসাহায্যে মার্গেরেট হিউজেস ইয়োরোপীয় সঙ্গীত স্বরলিপির মূর্ত্তিসকল সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন। অতএব শব্দ যে রূপবান্, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

আবার প্রত্যেক রূপই (মূর্ত্তিই) কোন না কোন মানসিক শক্তিব্যঞ্জক। মানসিক প্রত্যেক ভাব, কোন না কোন একটি বিশেষ রূপকে অবলম্বন করিয়া, প্রকাশিত হয়। ক্রোধের সময় মুখশ্রী এক বিশেষ আকার ধারণ করে, শরীরের অপরাপর অবয়বেরও ভঙ্গি এক বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়। প্রেমভাবের উদ্রেক হইলে, তৎসমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং অন্য এক বিশেষপ্রকার রূপ ও ভঙ্গি আবির্ভূত হয়। এইরূপ, মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তনের সহিত বাহ্যমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হওয়া, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল ব্যক্তিরই ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞানগম্য হয়। বিশেষ বিশেষ রূপ যে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতিব্যঞ্জক, তাহা এক্ষণকারকালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনুষ্যের আকৃতিদর্শনে তাহার প্রকৃতি-নিরূপণ-বিষয়ক বিদ্যাও এক্ষণে বহুস্থলে উপদিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কোনপ্রকার বিশেষ শিক্ষা-ব্যতীতও স্বভাবতঃই মনুষ্যসকল, পরস্পরের আকৃতির উপর নির্ভর করিয়া, অনেক স্থলে, পরস্পরের প্রকৃতির দোষগুণ বিচার করিয়া থাকে; এবং অনেক স্থলে সেই বিচার সত্য হইতেও দেখা যায়। বাস্তবিক, মনুষ্যের মানসিক ভাবের মধ্যে কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল, আবার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। স্থায়িভাব, যাহাকে মানসিক শক্তি বলে, এবং যদ্দ্বারা তাহার সাধারণ প্রকৃতি নির্ণীত হয়, তদনুসারেই প্রত্যেক মনুষ্যের মূর্ত্তি গঠিত হয়, এবং ক্ষণস্থায়ী ভাবসকলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সেই মূর্ত্তির ভঙ্গিসকল পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। বয়োবৃদ্ধি ও শিক্ষা এবং সাধনপ্রভাবে মনুষ্যের সাধারণ প্রকৃতি যেমন পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, তদ্রূপ বাহ্যমূর্ত্তিও অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মনুষ্যের মধ্যে রূপের যে প্রভেদ, তাহা আকস্মিক নহে; জগতে

ও কীর্ত্তিসকল চিন্তনের দ্বারা জীব তন্ময়তা লাভ করে; সুতরাং সেই তন্ময়তা-নিবন্ধন তাঁহার যে সর্ব্বময় ভাব, তাহা আপনাহইতে তাঁহাদের আয়ত্তাধীন হয়, এবং ক্রমশঃ তাঁহারা সর্ব্বোত্তম অধিকারীর মধ্যে ভুক্ত হইয়া পড়েন। ইহাই ভারতীয় সাকার উপাসনা, ইহা ভগবদুপাসনা; ইহা

আকস্মিক কিছুই নাই; আভ্যন্তরিক প্রকৃতির প্রভেদই রূপের প্রভেদের হেতু। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, জীব মাতৃগর্ভস্থ হইয়া, স্বীয় পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মার্জ্জিত প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া, আপনাহইতে সেই প্রকৃতির অনুগামী রূপ স্বভাবতঃ গঠন করিয়া থাকে; মাতার ভক্ষিতান্নের অংশসকল যে বিশেষ বিশেষ রূপে সংযোজিত হইয়া, সন্তানসকলের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ আকৃতিযুক্ত দেহ প্রস্তুত হয়, তাহা আকস্মিক নহে; গর্ভস্থ সন্তানের আভ্যন্তরিক শক্তিনিচয়ই তাহার নিমিত্তকারণ। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক রূপই কোন বিশেষ মানসিক ভাব ও শক্তিব্যঞ্জক; এক একটি রূপ মানসিক এক একটি শক্তির বাহ্যমূর্ত্তি। বিশেষ বিশেষ রূপ ও বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থা পরস্পরের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত; যেখানে কোন জীবে ইহাদের একটি আছে, সেইখানে অপরটিও অবশ্য থাকিবে।

এবঞ্চ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বিশেষ বিশেষ রূপ বিশেষ বিশেষ শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। পরন্তু প্রত্যেক রূপ আবার যখন কোন বিশেষ মানসিক শক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তখন তদনুগামী শব্দেরও প্রোক্ত মানসিক শক্তির সহিত নিত্যসম্বন্ধ থাকা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ শব্দ যে বিশেষ বিশেষ ভাবব্যঞ্জক, তদ্বিষয়ে মনুষ্যের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতাও যে নাই, তাহা নহে। ক্রোধের সময় কণ্ঠস্বর একপ্রকার হয়, দয়ার সময় কণ্ঠস্বর অন্যপ্রকার হয়; এইরূপ, ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কণ্ঠস্বরও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। কোনপ্রকার কণ্ঠস্বর দূর হইতে শ্রবণ করিলে, তাহা ক্রোধ, অথবা ভয়, অথবা অন্যভাবব্যঞ্জক, তাহা আমরা অনেক সময়েই অনুভব করিতে পারি। এমন কি, পশুপক্ষীর ধ্বনি শুনিয়াও অনেক সময়ে আমরা তাহার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। মনুষ্যের কণ্ঠস্বরের যে বিভিন্নতা আছে, তাহারও মূল তাহাদের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা; গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি বীরগম্ভীর প্রকৃতির পরিচায়ক; লঘু কণ্ঠধ্বনি তরল প্রকৃতির পরিচায়ক। স্ত্রীকণ্ঠধ্বনি এবং পুংকণ্ঠধ্বনি একপ্রকার হয় না। বস্তুতঃ ইহজগতে কোন একটি ঘটনা আকস্মিক নহে; সমস্ত জগৎই কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বন্ধ; জ্ঞানের বিকাশ যে পরিমাণে হয়, সেই পরিমাণেই এই সকল সম্বন্ধ বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইতে থাকে। অতএব রূপের সহিত যেমন মানসিক ভাবের নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তদ্রূপ শব্দের সহিতও যে মানসিকভাবের নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তদ্বিষয়ক সিদ্ধান্তে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাও সম্পূর্ণ অনুকূল।

'পৌত্তলিকতা নহে; পরন্তু ইহা ভক্তিমার্গের অতি সহজ ও প্রকৃষ্ট সাধন।' প্রথমতঃ উপাস্যের যেরূপ মূর্ত্তি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তদনুরূপ যতদূর সম্ভব, আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া, প্রতিমা-সকলকে গঠন করিতে চেষ্টা করা হয়। তৎপরে মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ দ্বারা প্রতিমাতে উপাস্যের অনুরূপশক্তি সঞ্চারিত করিতে প্রযত্ন করা হয়; এবং অন্তর্য্যামী ভগবান্ সর্ব্বশেষে

অতএব মানসিক প্রকৃতিও শক্তিনিচয়ের সহিত শব্দ এবং রূপ নিত্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। প্রত্যেক শব্দের অনুগামী রূপ আছে, এবং তাহা কোন বিশেষ মানসিক প্রকৃতির ব্যঞ্জক। যদি কোন ভাষার শব্দ-সকল এইরূপে গৃহীত হয় যে, তাহার অনুরূপ মূর্ত্তি এবং প্রকৃতিবিশিষ্ট পদার্থই তদ্দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তবে সেই ভাষা প্রকৃতপ্রস্তাবে সিদ্ধ ভাষা হয়; সেই ভাষার সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, তাহার শব্দ সকল তদীয় অর্থের স্বাভাবিক সঙ্কেত এবং তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধও নিত্য। মহামুনি জৈমিনি বলিতেছেন যে, বৈদিক ভাষা তদ্রূপ ভাষা; সুতরাং ইহা সিদ্ধভাষা।

শব্দসকল স্বীয় অর্থের সহিত নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে, তাহাদের যোজনাক্রমে যে সিদ্ধ বাক্যও গঠিত হইতে পারে, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়। মহর্ষি জৈমিনি বলেন যে, কেবল পৃথক্ পৃথক্ শব্দের নহে, বৈদিকবাক্য সকলেরও তাহাদের অর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য; তাঁহার মতে বৈদিকবাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদই প্রধান, অপরাপর পদ ক্রিয়া পদেরই অর্থ বিস্তার করে মাত্র। বাস্তবিক শব্দগুলি সিদ্ধার্থব্যঞ্জক হইলে, বাক্যও সিদ্ধার্থব্যঞ্জক যাহাতে হয়, তদ্রূপে গঠিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কার্য্যতঃ তদ্রূপ হইয়াছে কি না, তাহা ফলের দ্বারা পরিচিত হয়। কিন্তু বৈদিক কর্ম্মসকল যে বিহিত ফলোৎপাদনে সমর্থ, তাহা সকল দার্শনিকেরই সম্মত। মহর্ষি জৈমিনি বলেন যে, বেদবাক্যসকল সিদ্ধার্থবাক্য হওয়াতে, যে সকল কর্ম্ম অবশ্য করণীয় বলিয়া বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃই অবশ্যকর্ত্তব্য; নিয়মিত বিধান অনুসারে সেই সকল কর্ম্ম কৃত হইলে, বৈদিক বাক্যের সত্যতা নিবন্ধন, তাহারা অবশ্য উপদিষ্ট ফল উৎপাদন করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইস্থলে আর একটি বিষয় বক্তব্য আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শব্দের সহিত আকৃতির ও তদুভয়ের সহিত প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধ আছে। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যের রূপ যদি তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতিব্যঞ্জক হয়, তবে সেই রূপ ও প্রকৃতির অনুগামী শব্দটি কি, তাহা জ্ঞাত হওয়া গেলে, সেই শব্দটি সেই পুরুষের স্বাভাবিক নাম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আমাদের শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ এই যে, বেদোক্ত দেবতাদিগের স্বাভাবিক নাম আছে, তাহা ঋষিদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল নাম-সমন্বিত মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ, রটনা ও স্মরণ, এবং মন্ত্রার্থের ধ্যানদ্বারা দেবতা-

সাধকের ভক্তির বশীভূত হইয়া, ঐ মূর্ত্তি হইতেই সাধকের অভীষ্টসকল পূরণ করেন। তিনি সর্ব্বগত, অতএব প্রতিমা তাঁহার পর নহে। যে ব্যক্তি তাঁহার ভজন করিতে ইচ্ছা করে, অথচ তাঁহার সর্ব্বগত ভাবের ধারণা করিতে সমর্থ নহে, তাহার মঙ্গলের জন্য তিনি সীমাবদ্ধ প্রতিমা হইতেই আপনার শক্তি প্রকাশিত করেন। সমস্ত জগৎকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবুদ্ধিতে

সকল আকৃষ্ট হইয়া, সাধকের নিকট উপস্থিত হয়েন, এবং তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ করেন, ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের উপদেশ।

কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে, ইহা অযৌক্তিক বলিয়াও বোধ হয় না। আমি যদি কোন বিশেষ গুণ, (যেমন সাহসিকতা) প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া, তাহার বিষয় অহর্নিশ ধ্যান করি, তবে আমাতে সাহসিকতা গুণ অনুপ্রাণিত হয়। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, সাহসিকতার অনুরূপ মূর্ত্তি ও শব্দ আছে; সুতরাং সেই মূর্ত্তির ধ্যান, এবং সেই শব্দের পুনঃ পুনঃ রটন ও স্মরণ করিলে, তাহা সাহসিকতারই ধ্যান হয়। সুতরাং সাহসিকতাই যে দেবতার (উচ্চ জীবের) বিশেষ প্রকৃতি, সেই দেবতার মন্ত্র ও রূপ ধ্যান করিতে করিতে, সেই দেবতার যে প্রকৃতি, তাহা অবশ্য সাধকের আয়ত্তাধীন হইবে। দেবতার তুল্যরূপতা-প্রাপ্তি হইলে, সাধকের নিকট সেই দেবতা স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়েন, এবং তাহার আনুকূল্য করিয়া থাকেন। ইহাও জগতের নিয়ম। ইহজগতে সচরাচরই দেখা যায় যে, সমপ্রকৃতির লোক স্বভাবতঃ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, পরস্পরের সহায় হইয়া থাকে। দেবতাদিগের সম্বন্ধেও এইরূপ। সুতরাং এই কারণেও বৈদিক কর্ম্মের সফলতা অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না; পক্ষান্তরে তাহাই সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া অনুমিত হয়।

এতৎসম্বন্ধে আর একটি বিষয় বক্তব্য আছে; আমি উপযুক্ত শারীরিকশক্তি প্রয়োগ করিয়া যেমন অপরকে বশীভূত করিতে পারি, তদ্রূপ মানসিক শক্তিপ্রয়োগ দ্বারাও তাহাকে বশীভূত করিতে পারি। এতদ্দেশে বশীকরণবিদ্যা পূর্ব্বে বহুলপরিমাণে উপদিষ্ট হইয়াছিল। মন্ত্রশক্তি, বস্তুশক্তি, এবং ইচ্ছাশক্তি, এবং ইহাদের বিমিশ্রণ, এই সমস্ত উপায়ই বশীকরণের নিমিত্ত এতদ্দেশে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। ইহা যে অসম্ভব নহে, তাহা এক্ষণে পাশ্চাত্যপ্রদেশে হিপ্‌নটিজ্‌ম্ (hypnotism) প্রভৃতি বিদ্যার আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ এই বিদ্যার গূঢ়তত্ত্ব সম্যক্ অবগত ছিলেন। বিশেষ বিশেষ উপায়ে অগ্নি উৎপাদন ও স্থাপন করিয়া, বিশেষ বিশেষ বস্তু দ্বারা বিশেষ বিশেষ মন্ত্র এবং বিশেষ বিশেষ মুদ্রার (শারীরিক অঙ্গভঙ্গির) সাহায্যে, বিশেষ বিশেষ সময়ে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ দেবতাকে

ধারণা করিতে অসমর্থ, সে যদি একটি পদার্থকেও ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহাতে দোষের বিষয় কি আছে? প্রতিমারূপ সেই একটি বস্তুকে ত অন্ততঃ সে ব্যক্তি ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করিতে শিক্ষা করিয়াছে, তাহার এই ধারণাশক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে, তাহার মন আপনা-হইতে প্রশস্ত হয় এবং সে ব্যক্তি পরে সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে ধারণা করিতে সামর্থ্য লাভ করে; এবং সেই বিচক্ষণ সাধক অবশেষে সমগ্র

আকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিলেন; দেবগণ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আবির্ভূত হইতেন, এবং তাঁহাদের অভীপ্সিত পূরণ করিতেন। পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতিতে ঋষিদিগের এতৎসম্বন্ধীয় অদ্ভুত কীর্ত্তিসকল নানা স্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রশক্তি যে অদ্যাপি ভারত-ভূমি হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা নহে। সাধকগণ মন্ত্রশক্তির পরিচয় অদ্যাপি প্রাপ্ত হইতেছেন। সামান্য সর্পবৈদ্যগণও অদ্যাপি সময় সময় দ্রব্যশক্তি এবং মন্ত্রশক্তির পরিচয় প্রদশন করিয়া থাকেন। তবে পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রভাবে এতদ্দেশীয় এইপ্রকারের সমস্ত বিষয়ই এক্ষণে প্রতারণা বলিয়া গণ্য হয়; এই প্রণালীতে শিক্ষিত পুরুষগণ প্রায়শঃ ইহার যথার্থতা পরীক্ষা করিতেও এক্ষণে ইচ্ছা করেন না। বাস্তবিক প্রতারণাও অনেক স্থলেই সত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকাতে, স্বভাবতঃই ইহাতে সত্য কিছু আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে লোকের প্রবৃত্তি হয় না। যাহা হউক মন্ত্রশক্তির যথার্থতা যে, বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারাও খণ্ডিত হয় না, এইস্থলে সংক্ষেপতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইল।

ভারতীয় সাকার উপাসনার তত্ত্ব সাধারণভাবে মাত্র উপরে বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু এতাবন্মাত্রেই সাকার উপাসনা পর্য্যাপ্ত নহে; তদ্ব্যতীত ইহার আরও গভীর রহস্য আছে। ব্রহ্মবিদ্যা প্রকরণে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে, তৎসমস্ত আপনা হইতেই বোধগম্য হইবে। যেমন শালগ্রামে বিষ্ণুশক্তির এবং বাণলিঙ্গে শিবশক্তির বিশেষ অধিষ্ঠান ও প্রকাশ থাকাতে, স্বীয় অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবেই ইহারা ভারতবর্ষে পূজ্য হইয়াছেন। যেমন সূর্য্যাদি প্রতীকে ভগবৎ-শক্তি-প্রকাশের প্রাচুর্য্য হেতু তদবলম্বনে ব্রহ্ম উপাসিত হয়েন, শালগ্রামাদিতেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

সর্ব্বসাধারণ পাঠকের বোধোপযোগিরূপে এই সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল। পরন্তু শ্রুতিস্মৃতি-প্রভৃতি আর্য্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, প্রজাপতি বেদমন্ত্রের সাহায্যেই এই বিচিত্র সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছিলেন; যথা, শাস্ত্র বলিয়াছেন—

নানারূপং চ ভূতানাং কর্ম্মণাং চ প্রবর্ত্তনম্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মিমীতে স ঈশ্বরঃ।" এবঞ্চ "স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজত" ইত্যাদি বাক্যে এবং "এত ইতি বৈ

বিশ্বকেও অতিক্রম করিয়া তদতীত পরব্রহ্মের ধ্যানদ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। এইরূপে প্রতিমাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, প্রতিমারই ব্রহ্মত্ব সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়; পরন্তু তন্নিমিত্ত ব্রহ্মের প্রতিমাত্ব-প্রাপ্তি হয় না। সূর্য্যাদি প্রতীকেও ব্রহ্মবুদ্ধিতেই উপাসনার বিধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; ব্রহ্মসূত্রে বেদব্যাস তাহা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ যে কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তির পক্ষেই প্রতিমাতে ব্রহ্মের অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেম্ববস্থিতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯ অঃ, ২০শ শ্লোক।

অস্যার্থঃ—সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বররূপী আমাকে যাবৎকাল পর্য্যন্ত

প্রজাপতির্দ্দেবানসৃজত" ইত্যাদি বাক্যে, কোন্ কোন্ মন্ত্র পূর্ব্বক ভূরাদি লোক এবং দেবতা প্রভৃতি জীব, প্রজাপতিকর্তৃক সৃষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতি স্বয়ং উপদেশ করিয়াছেন। এক্ষণকার লোকের অল্পজ্ঞানবশতঃ এই সকল বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম পরিগ্রহ হওয়া অতিশয় কঠিন। শব্দময় স্বরলিপির গানদ্বারা যে বৃক্ষ পত্র পুষ্প প্রবাল প্রভৃতির মূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহা সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত মার্গেরেট্ হিউজেস তৎপ্রকাশিত "ইডোফোন ভয়েস্ ফিগার্স" ("Eidophone voice figures") নামক পুস্তকে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিষয় চিন্তা করিলে বুদ্ধিমান্ পুরুষ অবশ্য পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইবেন। অতএব শব্দময় মন্ত্র যদি দেবতাসৃষ্টির মূল হইল, তবে বিশেষ বিশেষ দেবতার মূর্ত্তির মূলীভূত, সর্ব্বজ্ঞশাস্ত্রোপদিষ্ট মন্ত্র, উপযুক্তরূপে উচ্চারিত হইলে সেই মন্ত্রময় দেবতার আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অতএব মন্ত্রশক্তি যথার্থই মহাশক্তি, ইহা কদাচ অবহেলনীয় নহে। উপাসনাদ্বারা ক্রমশঃ অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে, মন্ত্রোচ্চারণে দেবতার আবির্ভাব সাধকের নিকট প্রত্যক্ষীভূত হয়, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ।

আপনার হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুভব করিতে না পারিবে * তাবৎ-কাল পর্য্যন্ত মানব আপনার আশ্রম-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়া প্রতীকাদিতে আমার উপাসনা করিবে।

অতএব ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন না; বিশেষ বিশেষ প্রতিমা পূজাকেই তাঁহারা চরমধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। যিনি যেমন অধিকারী, তাঁহার জন্য তদ্রূপ উপাসনারই ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম ও অপর ধর্ম্মের মধ্যে এই একটি প্রভেদ সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অপরাপর ধর্ম্মে সকলের প্রতিই এক প্রকার উপদেশ। হিন্দুধর্ম্মে তদ্রূপ নহে। যিনি যেরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিতে যোগ্য, তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মের আচার্য্যগণ তদ্রূপই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; এবং সেই উপদেশে নিষ্ঠা স্থাপনের নিমিত্ত অনেক স্থলে তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাকে উপদেশ করিয়া, তাহা গোপন করিয়া রাখিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। ইহা মিথ্যা ব্যবহার নহে; বস্তুতঃই যিনি যেরূপ অধিকারী, তাঁহার পক্ষে তদুপযুক্ত ধর্ম্মাচরণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাঁহার সম্বন্ধে অপর কোন উপদেশ তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ নহে।

শাক্ত-শৈবাদি যে ভেদ ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারাও যে ঋষিদিগের মধ্যে মতবিরোধ সূচিত হয় না, তাহা এক্ষণে সহজেই বোধগম্য হইবে। শক্তি-উপাসনা, শিবোপাসনা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা; সুতরাং বিরোধের কোন বিষয়ই নাই। তবে মনুষ্যের প্রকৃতির অসংখ্য প্রকার-ভেদ আছে। এক ব্যক্তির নিকট যে বর্ণটি, যে ধ্বনিটি, যে আকৃতিটি প্রীতিকর, অপর ব্যক্তির পক্ষে হয় ত সেইটি অপ্রীতিকর। যে

---

* আপনার হৃদয় মধ্যে ব্রহ্মধ্যান, যাহা "দহর বিদ্যা" নামক ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গীভূত, তাহা এইস্থলে উপলক্ষণ মাত্র; বস্তুতঃ উচ্চ অঙ্গের ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়ই এই স্থলে উক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মানসিক প্রকৃতি এক ব্যক্তির আনন্দবর্দ্ধন করে, সেই প্রকৃতি হয় ত অপরের নিকট ঘৃণনীয় হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট উপাস্যমূর্ত্তির অর্চ্চনাপ্রিয় হয়। কেহ কেহ ব্রহ্মের স্ত্রীমূর্ত্তির উপাসনা করিতে অনুরাগযুক্ত হয়; কেহ বা পুংমূর্ত্তির উপাসনাতেই প্রীতিলাভ করে। ব্রহ্ম নানাবিধ পুংমূর্ত্তি এবং নানাবিধ স্ত্রী মূর্ত্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক জগতে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে যে সাধকের প্রকৃতি যেটির অনুকূল, তিনি সেই মূর্ত্তিকে স্বীয় উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে এইরূপে সাধক-সম্প্রদায়ভেদ উপদিষ্ট ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট দেবতাদিগের আরাধনাও এইরূপেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঋষিগণই এতৎসমস্তের উপদেষ্টা। ইহাতে তাঁহাদিগের কোন প্রকার কুসংস্কার বা মতবিরোধ প্রকাশিত হয় না; পরন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা, উদারতা ও সর্ব্ববিধ জীবের প্রতি সহানুভূতিই প্রমাণিত হয়।

৩। দীক্ষা ও নামসাধন।

ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিদ্যা যেরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার বাহ্যমূর্ত্তি কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল। এক্ষণে ইহার আভ্যন্তরিক সাধনাঙ্গের প্রবর্ত্তনা-সূচক দুই একটি বিষয় বর্ণনা করিয়া, এই গ্রন্থাংশ সমাপ্ত করা যাইতেছে।

অপর সকলপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিতেই গুরুকরণের প্রয়োজন হয়; অপরের কোন সাহায্য বিনা আপনা আপনি কেহ কোন বিদ্যা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্যা অপর সকল বিদ্যা অপেক্ষা কঠিন, এবং ইহাকে অপর সকল বিদ্যার সার বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সুতরাং এই বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত গুরুকরণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। অধ্যাত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া, মনঃসংযম করিতে অভ্যাস করিতে

করিতে, বুদ্ধিমান্ পুরুষ নানাবিধ অলৌকিক শক্তিও লাভ করিতে পারেন সত্য; কিন্তু তাহাতে কোন কোন স্থলে বিপদও ঘটিয়া থাকে। পরন্তু সাধারণ শক্তিলাভ-বিষয়ে যেরূপই হউক, মোক্ষমার্গলাভ সদ্‌গুরুকৃপা ভিন্ন কখনই হইতে পারে না বলিয়া মহর্ষিগণ উপদেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সকল শ্রেণীর সাধক, সর্ব্বকালে, একবাক্যে এই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহসংসারে দ্বিবিধ শক্তিস্রোত প্রবর্ত্তিত আছে; এক স্রোত প্রবৃত্তি-মার্গ, অপর স্রোত নিবৃত্তিমার্গ, অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয়। প্রবৃত্তিমার্গের স্রোত সংসারকে বর্দ্ধিত করে, নিবৃত্তিমার্গের স্রোত বহির্ম্মুখ জীবকে পুনরায় পরব্রহ্মের দিকে লইয়া যায়। স্ত্রীপুরুষ-সহযোগেই সংসারের বৃদ্ধি; পুংস্ত্রী-মিথুনভাব বৃক্ষ লতাদিতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাই জগৎসৃষ্টির সনাতন সাধারণ নিয়ম। যে সকল খাদ্য বস্তু পুরুষ আহার করেন, তাহাই স্ত্রীও আহার করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই সকল খাদ্যবস্তু পুরুষদেহেই শুক্র উৎপাদন করে, স্ত্রীদেহে করে না। পুরুষদেহ হইতে স্ত্রী সেই বীজ গ্রহণ না করিয়া, নিজে আহার্য্য বস্তুমাত্র অবলম্বনে সেই বীজ প্রস্তুত করিয়া সন্তান উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়েন না, ইহাই সনাতন নিয়ম। এই নিয়ম ধারাবাহিকক্রমে সৃষ্টি প্রকাশিত হইবার সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে; এই নিয়মাধীন না হইলে, সংসার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। সর্ব্বদর্শী ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, নিবৃত্তিমার্গ সম্বন্ধেও ইহার অনুরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে। ভগবান্ যেমন জীবকে সৃষ্টি করিয়া, বৃদ্ধির জন্য তাহাকে মিথুনভাবে বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তিমার্গে প্রেরণা করিয়াছেন, তদ্রূপ সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধ্যাত্মতত্ত্ববেত্তা গুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া, শিষ্যপরম্পরায় মোক্ষধর্ম্মের বীজশক্তিকেও ধারাবাহিকরূপে চালনা করতঃ, সাংসারিক জীবকে অন্তর্মুখ করিতে এবং অবশেষে মুক্তি প্রদান করিতেও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনাদি কালহইতে ধারাবাহিকরূপে প্রবর্ত্তিত এই মোক্ষবীজ সদ্‌গুরু হইতে প্রাপ্ত হইয়া, তাহার

যথাবিহিত সেবা করিলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ যখন অবতার-রূপে জীবসমাজে প্রকাশিত হইয়াছেন, তখন তিনিও এই সনাতন নিয়মের মর্য্যাদা সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

এক্ষণকারকালে কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়াই অনেকে ব্রহ্মদর্শনলাভের নিমিত্ত প্রযত্ন করিতেছেন। এইরূপ প্রযত্নও অশেষবিধ শুভ উৎপাদন করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারলাভের ইহা উপায় নহে। সুতরাং এই উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এক্ষণে এইরূপই মত স্থাপিত হইতেছে যে, ভগবানের বাস্তবিক দর্শনলাভ করা সম্ভবপরই নহে, তিনি সর্ব্বত্র আছেন বলিয়া চিন্তা করাই তাঁহার দর্শন। বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে; ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, যথার্থই ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে, এবং সেই দর্শন লাভ হইলে, জীবের যে সকল অবস্থার স্ফুরণ হয়, তাহাও তাঁহারা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এবং অদ্যাপি ভারতবর্ষে ভগবদ্দর্শনপ্রাপ্ত পুরুষের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অতএব মোক্ষার্থী পুরুষগণ এই বিষয়টি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

আর সর্ব্বসাধারণ সাধকের পক্ষে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই কলিকালে নামসাধনরূপ যজ্ঞই দ্রব্য ও মন্ত্রময় অগ্নিষ্টোমাদি যাগ হইতে প্রশস্ত বলিয়া সর্ব্বদর্শী ঋষিগণ উপদেশ করিয়াছেন। কলিকালে স্বভাবতঃ দ্রব্যশক্তির হ্রাস ঘটিয়াছে; দিন দিনই ইহা সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে; এবং পুরুষের দেহ ও মনের পবিত্রতা-সম্পাদনের নিমিত্ত গর্ভাধানাদি যে সকল সংস্কারের ব্যবস্থা ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও এক্ষণে কালস্রোতে একপ্রকার লুপ্তপ্রায় হওয়াতে, অধিকাংশ স্থলে যজন-কারী ব্রাহ্মণদিগেরও দ্রব্য এবং মন্ত্রময় যজ্ঞসকল সম্পাদন করা বিষয়ে অযোগ্যতা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ঋষিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট নামসাধনই

এক্ষণকার কলির জীবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কি প্রকার প্রকৃতিযুক্ত পুরুষের পক্ষে কি প্রকার নাম-সাধন অধিক ফলদায়ক হইবে, তাহাও দিব্যদর্শী পরমকারুণিক ঋষিগণ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। এবং সর্ব্ব-সাধারণ জীবের সম্বন্ধেই যে সকল নাম উত্তম ফলদান করিতে সমর্থ, আচার্য্যগণ, জীবের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ, তাহারও উপদেশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। অতএব কল্যাণপ্রার্থী পুরুষের পক্ষে তত্তদ্‌বিষয়জ্ঞ সাধকহইতে উপযুক্ত মন্ত্র গ্রহণ করিয়া, সাধনা-বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। তাহাতে সাধন-বিষয়ে আস্থা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং দৃঢ়তা জন্মে। যিনি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনি এই উপদেশের সারবত্তা বোধগম্য করিতে সমর্থ হইবেন।

মূল কথা এই যে, আচরণদ্বারাই ধর্ম্মোপদেশের সফলতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়; কেবল বাহ্যতর্কবিচার ও বাগ্‌বিতণ্ডার দ্বারা ধর্ম্মের সত্যসকল সম্যক্ আয়ত্ত করা যায় না। যাঁহারা স্বয়ং আচরণ না করিয়াও, প্রথমেই ধর্ম্মের যথার্থতা-বিষয়ে কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ধর্ম্মানুষ্ঠানশীল পুরুষের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য; এইসকল সাধক কৃপা-পরবশ হইয়া, কথন কথন সরল অনুসন্ধানেচ্ছু পুরুষকে ধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। বৈদ্যনাথ তারকেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থানে অনেক লোক "হত্যা" দিয়া অচিরকালমধ্যে অভীপ্সিত বিষয় লাভ করিয়া থাকে; তথায় গমনপূর্ব্বক তাহাদের অবস্থা পরিদর্শন করিলেও বিশ্বাস সঞ্চারিত হইতে পারে।

শেষ কথা এই যে, সরলপ্রাণে অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ কোন না কোন উপায়ে জীবের তৃষ্ণা অবশ্যই নিবারণ করিয়া থাকেন। ভারতভূমিতে অদ্যাপি সনাতন ধর্ম্মের প্রত্যক্ষযোগ্য প্রমাণের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে নাই; এবং ঋষিগণ অদৃশ্য হইলেও, জীবের প্রতি তাঁহাদিগের দয়া

বিলুপ্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, কলিকালে জীবের স্বভাবজাত শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতাহেতু অল্প চেষ্টাতেই জগন্নিয়ন্তা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েন, এবং দেবতা ও ঋষিদিগের কৃপা তাঁহাদিগের প্রতি অল্পায়াসেই ধাবিত হয়। নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে, যেমন তেজঃপুঞ্জ নক্ষত্রসকল অদৃশ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু অমানিশার রজনীতে ক্ষুদ্র খদ্যোতও দূরস্থ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের পক্ষে অমানিশা স্বরূপ এই কলিকালে অল্প চেষ্টাতেই দেবতা এবং ঋষিগণের দৃষ্টি সাধকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তাঁহারা স্বয়ং গোপনে থাকিয়াও নানাবিধ উপায়ে সাধকের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অতএব সাধারণতঃ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিঘ্নজনক হইলেও, সরল অনুসন্ধায়ী সাধকের পক্ষে, এই কলিকাল অতি মঙ্গলপ্রদ। যুগান্তরে অতি কঠোর তপস্যাদ্বারা যে সকল ফল লাভ করা যাইত, এই কলিকালে অতি অল্প পরিশ্রমেই তৎসমস্ত সাধকের আয়ত্তাধীন হয়। অতএব কলির জীবের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। নিষ্কপট অনুসন্ধানেচ্ছারই এক্ষণে অভাব। এই অভাব দূর হইলেই আর ভাবনার বিষয় কিছু থাকিবে না।

৪। নিবেদন।

অবশেষে, এই গ্রন্থের ভূমিকার লিখিত বিষয়সকল পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত, ভারতবাসিজনগণের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে, ভারতবর্ষ ধর্ম্মচ্যুত হইয়াই এই দুর্দ্দশাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। যাহার যাহা স্বাভাবিক প্রকৃতি তাহার উৎকর্ষসাধন না হইলে, সেই ব্যক্তির কখন অভ্যুদয় হয় না। ভারতবাসী স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রাণ। অপকৃষ্ট বস্তুর সংসর্গে

যেমন সুবর্ণও পূতিগন্ধযুক্ত ও অস্পৃশ্য হয়, তদ্রূপ কালস্রোতে পতিত হইয়া, এবং বিপরীত প্রকৃতির সংসর্গে ভারতবাসীও এক্ষণে অস্পৃশ্যবৎ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কেবল বর্ত্তমান অবস্থা-দর্শনে ভারতবাসী হতাশ হইয়া পড়িবেন না। পশুরাজ সিংহও, তমোগুণপ্রভাবে, নিদ্রাদ্বারা কোন না কোন কালে নিশ্চয়ই অভিভূত হয়েন, তখন ক্ষুদ্র মণ্ডুকও তাঁহাকে জড়বৎ দর্শন করিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে। ভারতবাসীও এক্ষণে গাঢ় তামসিক নিদ্রায় অভিভূত; সুতরাং পৃথিবীতলস্থ সকলজাতীয় লোকের নিকটই তিনি পদদলিত ও উপেক্ষিত হইতেছেন। কিন্তু পশুরাজকে শয়ান দৃষ্টে যেমন তাঁহাকে মৃত বলিয়া কল্পনা করা সঙ্গত নহে, এবং তিনি চিরকাল জড়বৎই আছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যেমন ভ্রান্ত, তদ্রূপ ভারতবাসীর বর্ত্তমান শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিড়ম্বনা দর্শন করিয়া, তাঁহাকে চিরকালই এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, এবং তাঁহার পুনরায় অভ্যুদয় অসম্ভব বিবেচনা করাও অসঙ্গত এবং ভ্রান্ত। পরন্তু সুবর্ণ যেমন অগ্নিদাহ দ্বারাই স্বীয় সমুজ্জ্বল রূপ সম্যক্ লাভ করিতে সমর্থ হয়, অপর উপায় যেমন তৎসম্বন্ধে তদ্রূপ ফলপ্রদ হয় না, তদ্রূপ ভারতবাসীরও স্বভাবগত প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহাকে উদ্বোধিত করিতে, বিজাতীয় প্রণালী অবলম্বন করিলে, সিদ্ধমনোরথ হওয়া সম্ভবপর নহে। সকল কথায় সকল লোকের উপর সমান কার্য্য হয় না। একটি বিশেষ কথা আমাকে উদ্বোধিত করে; কিন্তু তাহা অপরের উপর কোন প্রকার কার্য্যই করিতে পারে না; আবার অপর একটি কথা অপরকে অতিশয় উৎসাহপূর্ণ করে; কিন্তু আমার উপর তাহা কোন প্রকার ফলোৎপাদন করিতে পারে না। নিদ্রিত পুরুষকে জাগরিত করিতে হইলে, তাহার বিশেষ নাম করিয়া আহ্বান করিলে, সে সহজে জাগরিত হয়, অপর নামে তদ্রূপ হয় না। ইহা সংসারে

সচরাচরই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবাসীরও প্রকৃতিগত বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই দুঃখ, দারিদ্র্য ও যাতনার সময়েও ধর্ম্মপ্রাণতাই তাঁহার প্রকৃতিগত গুণ বলিয়া অনুমিত হয়। অদ্যাপি কোন স্থানে কোন সাধুবেশধারী যোগিপুরুষ উপস্থিত হইলে, হিন্দুসমাজের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সর্ব্বপ্রকার সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার সেবার নিমিত্ত ধাবিত হয়। যাঁহারা ইংরাজি প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারাও যে এইদিকে মনের গতি সম্যক্ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা নহে; যাহাদিগকে তাঁহারা অশিক্ষিত লোক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাদের ন্যায় তাঁহারাও অনেক সময়ে স্বীয় আভ্যন্তরিক প্রকৃতির প্রেরণায় এইরূপই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান দুরবস্থার সময়েও ভারতবাসী এই স্বীয় অধিকারগত বিষয়ে অপর কোন দেশীয় লোক অপেক্ষা সাহসিকতা, ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতা সম্বন্ধে হীন নহেন। একবার ভারতবাসী বোধগম্য করুন যে, কোন একটি কার্য্য তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গত, দেখিবেন তখনই সেই কার্য্য অপর সকলের সম্যক্ অসাধ্য হইলেও, তিনি অকুতোভয়ে হাসিতে হাসিতে অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিবেন; তখন কোন প্রকার কষ্ট যাতনা সহ্য করা, তাঁহার পক্ষে অত্যধিক বলিয়া বোধ হইবে না। পরন্তু কেবল সাংসারিক সুখসমৃদ্ধির নিমিত্ত ভারতবাসী কখনই তদ্রূপ উৎসাহযুক্ত হয়েন না। ভারতবাসীর ধারণা এই যে, দুঃখেকষ্টেই হউক, আর সুখসমৃদ্ধিতেই হউক, আহার নিদ্রা প্রভৃতি ব্যাপারসকল জীবেরই হইয়া থাকে; এবং অনন্তকালের সহিত তুলনায় ইহজগতে শতবর্ষবাসও অতি অকিঞ্চিৎকর। অদ্য যিনি আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, কল্য তিনি মৃত হইয়া, আমার আধিপত্যাধীনে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। ভারতবাসী পুনর্জ্জন্মবাদী, এবং কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন; সুতরাং কেবল বাহ্য সাংসারিক সুখের আশামাত্র

দেখাইয়া, ভারতবাসীকে সম্যক্ প্রবোধিত করা অসম্ভব। ইহা ভারতবাসীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এবং স্বীয় প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করা ভারতবাসীর পক্ষে কখনই মঙ্গলজনকও হইতে পারে না। অধিক কষ্ট না করিয়া যদি সুখলাভ হয়, তবে তন্নিমিত্ত অবশ্য ভারতবাসীও যত্ন করিতে পারেন। কিন্তু কেবল সাংসারিক সুখসমৃদ্ধির আশায় প্রাণপণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ভারতবাসী সাধারণতঃ কখন উৎসাহিত হয়েন না। বিশেষতঃ তাহাতে বাঞ্ছিত সাংসারিক ফল লাভ হইলেও, ভারতবাসী স্বীয় প্রকৃতি গুণে ইহাকে তত অধিক মূল্যবান্ বস্তু বলিয়াও স্বীকার করেন না, এবং তাহা স্বীকার করা তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপও নহে।

অতএব যদি তাঁহার আভ্যন্তরিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধনের নিমিত্ত নিষ্কপট ও সরলভাবে চেষ্টা আরম্ভ হয়, তবেই তদ্দ্বারা ভারতবাসীর ও সমগ্র জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। সমগ্র জগতের মঙ্গলের কথা এই জন্য বলিতেছি যে, ভারতবাসীই মূলতঃ জগতের ধর্ম্মোপদেষ্টা ও গুরু। যীশুখৃষ্টও ভারতবর্ষে আসিয়াই ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ কেহ সপ্রমাণিত করিতেছেন। ইহা সত্য অথবা মিথ্যা তাহার আলোচনা, এই স্থলে নিষ্প্রয়োজন; কারণ উচ্চ জ্ঞানালোক যে প্রথমে, ভারতবর্ষ হইতে নিঃসৃত হইয়া অবশিষ্ট আশিয়াখণ্ড এবং ইজিপ্ট ও ইউরোপকে উদ্দীপিত করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে পণ্ডিত-সমাজে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; দিব্যদর্শী ঋষিগণও স্পষ্টাক্ষরে ভারতবর্ষকেই মোক্ষপ্রদ ভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ভারতবাসী স্বীয় অধিকার জ্ঞাত হইয়া অভ্যুত্থান করিলে, তদ্দ্বারা পৃথিবীমণ্ডলস্থ সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই কল্যাণ সাধিত হইবে। কিন্তু বিজাতীয় ভাবের অনুকরণ দ্বারা ভারতবাসীকে অভ্যুত্থিত করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাতে বিজাতীয়

ভাবেরই জয়জয়কার হইবে, তাহা ভারতবাসীর জয় বলিয়া গণ্য হইবে না ; বরং ভারতবাসীই বিজাতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া স্বীয় পরাজয় স্বীকার করিবেন। অতএব ভারতবাসিগণ আপনাদের যথার্থ অধিকার বোধগম্য করিয়া, পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞানবত্তার প্রতি লক্ষ্য করুন, এবং তাঁহাদের আদর্শ ও কর্ম্মানুষ্ঠানবিধি নিয়ত চক্ষুর সমক্ষে স্থাপিত করিয়া, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন। তাঁহারা ধর্ম্মসাধনসম্পন্ন এবং স্বীয় চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইলে, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অপর সর্ব্ববিধ উন্নতি তাঁহাদিগের পক্ষে অনায়াসলব্ধ হইবে ; এবং তদবস্থায় তাঁহাদের উন্নতি জগতেরও কল্যাণের নিমিত্ত হইবে।

মূলকথা এই যে, দৈববলই ভারতবাসীর বল ; তপস্যাই তাঁহাদিগের ব্রহ্মাস্ত্র এবং ঋষিদিগের প্রদর্শিত পন্থাই তাঁহাদিগের পন্থা। এই ভারতভূমি দেবপ্রকৃতিক জীবের স্বাভাবিক বাসস্থান ; স্বীয় প্রকৃতিগত দেবস্বভাব বিস্মৃত হইয়াই, ভারতবাসী দুঃখ ও দারিদ্র্যপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বপুরুষদিগের তপঃশক্তি ও বিদ্যাগৌরব স্মরণ করিয়া, এখনও ভারতের প্রাচীন দেবতা ত্রিভুবনাধিপতির শরণাপন্ন হউন। বিপত্তিতে পতিত ব্যক্তির পক্ষে একমাত্র শ্রীমধুসূদনই আশ্রয়দাতা ; ভারতবাসী বর্ত্তমান কালে যতই পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া থাকুন, সর্ব্বসন্তাপহারী শ্রীভগবানকে আপনার গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা জানিয়া, সরলপ্রাণে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি কখনই তাঁহার চিরানুগত জাতিকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবেন না। পঙ্কে নিমগ্ন গজরাজকে গ্রাহগ্রাস হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য যেমন ভগবান্ গরুড়কেও পরিত্যাগ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া আগত হইয়াছিলেন, শরণাগত ভারতবাসীকেও :পাপতাপ দুঃখদারিদ্র্যহইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, তিনি তদ্রূপেই আগত হইবেন, সন্দেহ নাই। এইস্থলে শ্রীভগ-

বানের শ্রীমুখনিঃসৃত একটি আশ্বাসবাণী উদ্ধৃত করিয়া, এই গ্রন্থ সমাপ্ত করা যাইতেছে—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১ ॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৩২ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈ্বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪ ॥"

(শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা নবম অধ্যায়।)

—:০:—

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ হরিঃ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥